সুমথনাথ ঘোষের শ্রেষ্ঠ গল্প

মিত্র ও ঘোষ
১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

—পাঁচ টাকা—

মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীভানু রায় কর্তৃক প্রকাশিত
ও কালিকা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, ২৮ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে
বজয়কুমার মিত্র কর্তৃক মুদ্রিত

উৎসর্গ

শ্রীদেবেশ দাশ

সাহিত্য-সুহৃৎসু

এই লেখকের :—

বাঁকাস্রোত
জটিলতা
সুদূরের পিয়াসী
প্রহরী
ছায়াসঙ্গিনী
সর্বংসহা
বাঁশীওলা
জায়া ও জননী
মহানদী
দিগন্তের ডাক
অহল্যার স্বর্গ
উত্তরবাহিনী
ক্ষণ-বিম্ব
পরপূর্বা
গল্প-সঞ্চয়ন
মধুকরী
মনবিনিময়

ভূমিকা

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ যশস্বী সাহিত্যিক। অনেকগুলি উপন্যাস তিনি লিখিয়াছেন আর তাঁহার ছোটগল্পের সংখ্যাও অল্প নহে। ছোটগল্পের সংকলনও তাঁহার কয়েকটি আছে। তবে এতকাল তাঁহার ছোটগল্পের কোন প্রামাণ্য সঞ্চয়ন গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই, এবারে হঠাৎ একখানি সঞ্চয়ন গ্রন্থ প্রকাশে প্রকাশকের আগ্রহ হওয়ায় বর্তমান "শ্রেষ্ঠ গল্প" মুদ্রিত হইল। মন্মথবাবুর "শ্রেষ্ঠ গল্পের" একটি সংকলন হাতের কাছে পাইয়া পাঠকগণ নিঃসন্দেহ আনন্দিত হইবেন। গ্রন্থরাজ্যে অতি-প্রজননের দিনে সংকলন গ্রন্থ অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। ছোটগল্প, প্রবন্ধ, কবিতা—সমস্তর সংকলন অত্যাবশ্যক, পাঠকের সুবিধা কতকগুলি "শ্রেষ্ঠ-রচনা" হাতের কাছে পান; লেখকের সুবিধা নিজের পছন্দমতো বাছাই রচনাগুলি ধরিয়া দিতে পারেন; প্রকাশকের সুবিধা অতিরিক্ত একখানি পুস্তক ছাপিতে পারেন। পুস্তক রাজ্যে সংকলন গ্রন্থের যুগ আসন্ন। জীবন সংগ্রামে fittest বা "শ্রেষ্ঠ রচনা"র টিকিয়া থাকিবার সম্ভাবনা স্বভাবতই অধিক।

২

বাংলা সাহিত্যে নানা শাখা-প্রশাখা আছে সত্য, কিন্তু ছোট গল্পের ঐশ্বর্য আর সকলকে ছাপাইয়া গিযাছে। কি গুণে, কি সংখ্যায়, কি বৈচিত্র্যে বাংলা ছোটগল্পের তুলনা নাই। আর এই কাণ্ডটিও ঘটিযাছে অত্যল্প সময়ে। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পকে বাংলা ছোটগল্পের আদি বলিয়া ধরিলে আর তাদের সূত্রপাত ১৮৯০ সালে ধরিলে আজ ১৯৫৭ সালে অর্থাৎ সত্তর বছরের কম সময়ে ছোটগল্প বীজরূপ হইতে যাত্রা করিয়া বনস্পতিরূপে পৌছিয়াছে। ইহা সত্যই বিস্ময়কর। অনেকেই এই অতি প্রত্যক্ষ সত্যটার উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু আসল প্রশ্ন অমীমাংসিত থাকিয়া যায়, বাঙালী লেখকের হাতে সাহিত্যের অন্য শাখার তুলনায় ছোটগল্পে এমন অসাধারণত্ব দেখা দেয় কেন? উত্তরের জন্য কিছু উজানে যাওয়া আবশ্যক।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে দুটি প্রধান শাখা ছিল, মঙ্গল-কাব্য ও বৈষ্ণবপদ। দুটিতেই বাঙালী কবির শক্তির অসামান্যতা ফুটিযাছে কিন্তু দেখা যাইবে যে, মুকুন্দ রায় ও ভারতচন্দ্রের দৃষ্টান্ত সত্ত্বেও বৈষ্ণবপদের অসামান্যতা যেমন তুঙ্গস্পর্শী, মঙ্গল-কাব্যের নিশ্চয় তেমন নয়। সেকালের মঙ্গল-কাব্য ও পদাবলীর উত্তরপুরুষরূপে যথাক্রমে যদি উপন্যাস ও ছোটগল্পকে গ্রহণ করা যায়, তবে দেখা যাইবে যে বঙ্কিম-চন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের উপন্যাস সত্ত্বেও ছোটগল্পের মহিমা ও বৈচিত্র্য প্রতিভার তুঙ্গস্পর্শী। মোটের উপরে স্বল্লায়ত রচনায় বাঙালীর হাত খোলে ভাল, সেকালে পদাবলীতে খুলিযাছিল, একালে খুলিয়াছে রবীন্দ্রনাথের গানে গল্পে—পরবর্তী লেখকগণের ছোট গল্পে। কেন এমন হয় মীমাংসার চেষ্টা পণ্ডিতগণ করুন, আমরা আপাততঃ সেজন্য

ব্যস্ত নই—সুমথবাবুর ছোটগল্প সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিবার ইচ্ছা রাখি। বিশদ আলোচনার পূর্বে বলিতে বাধা নাই যে, বাঙালী ছোটগল্প-স্রষ্টাদের অগ্রণীগণমধ্যে সুমথবাবুর স্থান—হাতে পাঁজি থাকিতে মঙ্গলবার সম্বন্ধে সন্দিহান হইবার প্রয়োজন নাই—এই "শ্রেষ্ঠ গল্পই" শ্রেষ্ঠ প্রমাণ।

৩

বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন দুঃখের কথায় বাঙালীর অধিকার। বঙ্কিমচন্দ্রের অনুমান মিথ্যা নয় বলিয়াই মনে হয়। অন্ততঃ দুঃখের কথা বলিতে বাঙালী সাহিত্যিক যেমন আনন্দ পায় এমন সুখের কথায় নয়। প্রাচীন সাহিত্যের শতদলে ফুল্লরা, লহনা প্রভৃতি নায়িকা অশ্রুমুক্তার মতো টলমল করিতেছে—সকলের মধ্যমণি স্বয়ং বাণীর অশ্রুবিন্দু শ্রীমতী রাধিকা। নব্য বাংলা-সাহিত্যও এ নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। মধুসূদনের "বীররসে ভাসি" গান গাহিবার সঙ্কল্প সীতা ও প্রমীলার অশ্রুবন্যায় ভাসিয়া গেল। এমন উদাহরণ প্রত্যেক লেখক যোগাইবেন।

বাংলা ছোটগল্প দুঃখের কথায় পূর্ণ। শরৎ-প্রাতের হরিৎ তৃণবন যেমন চূর্ণ শিশিরকণায় ঝলমল করে, বাংলা ছোটগল্প-সাহিত্য অনেকটা তেমনি। তাহাতে ইন্দ্রধনুর লীলা আছে, রত্নাভরণের বিলাস আছে, সুন্দরীর অপাঙ্গ বিভ্রম আছে, কঠিন হাস্যের জ্যোতি-বিচ্ছুরণ আছে, আছে বিবিধ বৈচিত্র্য সন্দেহ নাই, কিন্তু একটু চাপিয়া ধরিলেই দেখা যাইবে সমস্তই শিশিরাশ্রু, চোখের জল মাত্র।

গল্পগুচ্ছ হইতে আরম্ভ করিয়া যে কোন সাহিত্যিকের ছোটগল্প হাতে লইয়া বসিয়া কথাটা প্রমাণ করিয়া দেওয়া যায়। যাঁহারা ব্যতিক্রম, বাঙালী পাঠক তাঁহাদের আদর করে, আপন মনে করে না, তাহাদের স্থান বাঙালীর আলমারিতে, অন্তরে নয়।

সৌভাগ্যবশতঃ সুমথনাথ ব্যতিক্রমের অন্তর্গত নন, তাঁহার ছোট গল্প সাধারণ নিয়মের অন্তর্গত।

এই সংকলনের সব গল্পগুলি অথবা প্রায় সব গল্পগুলি জীবনের দুঃখের উপাদানে গঠিত। 'ছায়াসঙ্গিনী' ব্যর্থ-প্রণয়ের কাহিনী। 'এই যুদ্ধ' দারিদ্র্যের কাহিনী। 'বাড়ীর কর্তা' বৃদ্ধ কর্তার অসহায় বার্ধক্যের বর্ণনা। 'রঙ খেলা' মুমূর্ষুর রোমান্স। 'প্রতিবেশী' হৃদয়হীনতার গল্প। আর 'চুড়ি' গল্পটা সদ্য বিধবার মোহভঙ্গের বিবরণ। 'কলহ' গল্পটিতে সাধ্বী পত্নী কিভাবে স্বামীকে জানিয়া শুনিয়া অধঃপাতের পথে ঠেলিয়া দিতেছে তাহার বর্ণনা। 'চেঞ্জার' গল্পটিতেও পাই দারিদ্র্যের একটি রূপ—কিন্তু মাঝখানে Irony আসিয়া পড়িয়া দুঃখকে আরও উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। 'কুহু' ও 'বৃষ্টি এলো' গল্প দুটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জীর্ণ গলির মধ্যে কুহুধ্বনি প্রবেশ করিয়া, দীর্ঘ অনাবৃষ্টির পরে সহরে বৃষ্টি নামিয়া দারিদ্র্যজীর্ণ নরনারীর জীবনে অভাবিত রসের

সঞ্চার করিয়াছে, মুহূর্তপূর্বে তাহারাও রাখিত না মনের এ সংবাদ—লেখক চোখে কলম দিয়া দেখাইয়া না দিলে পাঠকেও কল্পনা করিতে পারিত না। কিন্তু এ ভাবে বীজ খুঁটিয়া খুঁটিয়া সাহিত্যের পরিচয় দেওয়া চলে না, কতটুকু মাত্র তাহাতে প্রকাশ পায়। সাহিত্যের যথার্থ পরিচয় বীজে নয়, বনস্পতিতে, তাহার পূর্ণ প্রকাশে। সেই প্রকাশের দ্বারা বিচার করিলে গল্পগুলিকে সার্থক সৃষ্টি বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে—আরও স্বীকার করিতে হইবে যে এগুলি কেবল বাংলা ছোটগল্পের প্রধান ধারার অন্তর্গত নয়, সুমথনাথ ঘোষও বাংলা প্রধান ছোটগল্প-লেখকগণের অন্যতম।

৪

এই প্রসঙ্গে বাংলা ছোটগল্প সম্বন্ধে দু'একটা সাধারণ কথা বলিয়া রাখি। বাংলা ছোটগল্পের অসামান্যতা স্বীকার করিয়াও বলা চলে যে ইহা ক্রমে স্বকীয়ত্ব বর্জন করিয়া উপন্যাসের প্রত্যঙ্গে পরিণত হইবার প্রবণতা দেখাইতেছে। এটি শুভলক্ষণ নয়। উপন্যাস ও ছোটগল্প বিপরীতধর্মী শিল্পরীতি; উপন্যাস তথ্যপুঞ্জের স্বাঙ্গীকরণের দ্বারা সার্থক হইয়া ওঠে, ছোটগল্প সার্থক হইয়া ওঠে তথ্যপুঞ্জ-বর্জনের দ্বারা। কিন্তু আধুনিক ছোটগল্প লেখকগণ ছোটগল্পে তথ্যপুঞ্জ ঠাসিয়া ভর্তি করিতে চেষ্টা করেন, ফলে ছোট গল্পের ডিঙ্গি নৌকা মালের গুরুভারে তলাইয়া যায়; যেগুলি সে দুর্গতি হইতে রক্ষা পায় তাহাদের গতি মন্থর হইয়া পড়ে। ছোটগল্পের প্রাণ গতির ক্ষিপ্রতা—বাংলা ছোটগল্প সেই প্রাণধর্মচ্যুত হইবার লক্ষণ দেখাইতেছে। ছোটগল্পের প্রধান সহায় ভাষার নিপুণ ব্যবহার। সেদিকেও অনেক লেখকের মনোযোগ শিথিল। এমন যে হয় তাহার কারণ সহজেই অনুমেয়। তথ্য আহরণে নিযুক্ত মন ভাষার দিকে যথোচিত দৃষ্টি দিতে পারে না। তথ্যের স্বল্পতা ভাষার ঐশ্বর্যে পূর্ণ করিয়া তোলা যে যায় তাহার উত্তম দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প। আবার ভারে যেটুকু নাজাই পড়িল গতির ক্ষিপ্রতায় যে পূর্ণ করিয়া লওয়া যায় তাহারও উত্তম দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথের ছোট-গল্প। চোখের সম্মুখে এমন দৃষ্টান্ত থাকা সত্ত্বেও বাঙালী লেখকগণ যদি অবাঞ্ছিত পথে চলেন তবে কালক্রমে বাংলা ছোটগল্প বৈশিষ্ট্য হারাইয়া ভগ্ন উপন্যাসের উল্কাপুঞ্জে পরিণত হইবে। আশা করি শেষ পর্যন্ত তেমন শোচনীয় ব্যাপার ঘটিবে না।

সুখের বিষয় সুমথবাবুর "শ্রেষ্ঠ গল্প"গুলিতে সেই প্রবণতা নাই। তথ্যের যথোচিত নির্বাচন, ভাষার সুনিপুণ ব্যবহার ও গতির ক্ষিপ্রতা, সমস্ত মিলিয়া প্রত্যেকটি গল্পকে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছাইয়া দিতে সাহায্য করিয়াছে। ছোট গল্পের পথ অসিমুখের ন্যায় নিশিত সঙ্কীর্ণ ও দুর্গম।

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

সূচী

মৃগতৃষা

মলিনার বর দেখিয়া সবাই ছি ছি করিল। আপনার লোকেরা মুখে কিছু না বলিয়া মনে মনে হজম করিল বটে কিন্তু পাড়া-প্রতিবেশীরা চুপ করিয়া রহিল না, বিশেষ করিয়া গ্রাম-সম্পর্কীয় পিসি-মাসীর দল। তাঁহারা মলিনার মাকে একটু আড়ালে পাইয়া বলিলেন, হ্যাঁরে খেঁদী, তুই মা হয়ে শেষকালে এই কাজ করলি! মেয়েটাকে এর চেয়ে হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দিলি না কেন? এমন সোনার চাঁদ মেয়ে শেষকালে কিনা একটা বুড়োর গলায় বেঁধে দিলি—ছিঃ ছিঃ ছিঃ!

মলিনার মা চোখের জল চাপিতে চাপিতে বলিলেন, সবই আমার বরাত মা, তা না হ'লে ছেলেবেলায় এমন করে কপাল পুড়বে কেন, আর ভায়ের গলগ্রহ হয়েই বা থাকতে হবে কেন? আজ যদি ওর বাপ বেঁচে থাকতো তাহ'লে কি এমন করে মেয়ের বিয়ে দিতে পারতো! এই কথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি একেবারে কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়িলেন।

বিধবাদের মধ্যে যিনি সব চেয়ে বয়সে ছোট অথচ বাকপটুতায় সকলের চেয়ে সেরা, তিনি খপ্ করিয়া বলিয়া ফেলিলেন, ওমা এমন করবি জানলে আমি আমার ভাইপোর সঙ্গে সম্বন্ধ করতুম! আমি বলি এমন টুকটুকে মেয়ে হয়ত কোন রাজপুত্রের হাতে পড়বে—তা এমন আপদবালাই করে বিদেয় করবি, কেমন করে জানবো বল্?

ইহার উত্তরে মলিনার মা কি বলিবেন খুঁজিয়া পাইলেন না। শুধু চোখের জল মুছিতে মুছিতে উপরের অন্ধকার ঘরে যাইয়া—যেখানে ছোট ছোট ছেলেমেয়ের দল অঘোরে ঘুমাইতেছিল তাহাদের মধ্যে উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িলেন।

আঠারো বছর বয়সে বিধবা হইয়া তিনি বড় ভাইয়ের সংসারে ঢুকিয়াছিলেন। তারপর বিনা বেতনে ঝি ও রাঁধুনীর কাজ একসঙ্গে করিয়া ভাই, ভাজ, ভাইপো ও ভাইঝিদের মনোরঞ্জন করিতে করিতে আরো আঠারো বছর কাটাইয়া দিয়াছেন, শুধু এই একমাত্র মেয়েটিকে মানুষ করিয়া দাদা একদিন ভাল ঘরে বিবাহ দিবেন এই আশায়। তাই আজ যখন তাঁহার সেই একমাত্র আশা অতি নিষ্ঠুরভাবে ছিন্নভিন্ন

হইয়া গেল তখন তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া নিজের মন্দ ভাগ্যকেই বারবার দোষারোপ করিতে লাগিলেন।

ওদিকে বিবাহ শেষ হইয়া গেল। কর্মবাড়ীও প্রায় নিস্তব্ধ হয়-হয় এমন সময় মলিনার মায়ের খোঁজ পড়িল। এদিক ওদিক উপরে নীচে সব অনুসন্ধান করিয়া শেষে মেয়েরা আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল এবং সবাই তাঁহাকে খাইবার জন্য বারবার অনুরোধ করিতে লাগিল কিন্তু তিনি নিজের প্রতিজ্ঞায় অটল অচল হইয়া রহিলেন। শুধু সকলকে এককথা বলিলেন, আমার শরীর খারাপ, কিছু খাবো না।

বাড়ীর গিন্নী অর্থাৎ তাঁহার বড় ভাজও যখন তাঁহাকে খাইবার জন্য রাজী করাইতে পারিলেন না, তখন তিনি ঘরে যাইয়া স্বামীকে বলিলেন, তুমি একবার যাও, ঠাকুরঝির বোধ হয় রাগ হয়েছে।

অগত্যা মহেশবাবুকে ভগ্নীর মানভঞ্জন করিবার উদ্দেশ্যে যাইতে হইল। কিন্তু যেমন তিনি বিছানার কাছে গিয়া ভগ্নীর নাম ধরিয়া ডাকিলেন অমনি মলিনার মা ছেলেমানুষের মত ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন এবং ভাইয়ের একখানি হাত ধরিয়া বলিলেন, দাদা তুমি আমার এ কি করলে ?

মহেশবাবু বিচক্ষণ ব্যক্তি। এক পয়সা মূলধন না লইয়া ব্যবসায়ের পিচ্ছিল পথে চলিতে চলিতে বহু টাল সামলাইয়াও শেষে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়াছেন। কাজেই তিনি দার্শনিকের মত ভাবাবেগবর্জিত কণ্ঠে বলিলেন, কি জানিস বোন, বয়সই বল্, আর রূপই বল্—এ জগতে সবই দুদিনের—কিন্তু টাকার দরকার চিরদিনের। অনেক খোঁজ করে তবে এই পাত্রটি যোগাড় করতে পেরেছি। মলিনার বরাত ত ভালো রে—তুই দেখিস্ ও রাজরাণী হবে।

বলাবাহুল্য মহেশবাবুর মুখ হইতে এইসব ভালো ভালো কথা শুনিয়াও তাঁহার ভগ্নী আদৌ সান্ত্বনা পাইলেন না, বরং আরও কাঁদিতে লাগিলেন।

এদিকে বিবাহের অনুষ্ঠানগুলি কলের চাকার মত আপনি ঘুরিয়া চলিতে লাগিল। তাই বাসরঘর যখন চিরাচরিত প্রথায় আত্মীয়া ও অনাত্মীয়া রমণীদের আমোদ-উচ্ছ্বাসে মুখরিত হইয়া উঠিল, তখন যাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া এই আনন্দ-আয়োজন তাহার মনের মধ্যে যে নিদারুণ ব্যথা কালো মেঘের মত জমাট বাঁধিয়া উঠিতে লাগিল তাহার খবর বোধকরি একমাত্র অন্তর্যামী ছাড়া আর কেহই জানিতে পারিলেন না!

মলিনা ঘাড় গুঁজিয়া সারারাত্রি বাসরঘরে বসিয়া রহিল। কোন আনন্দ-উল্লাসে যোগ দিল না। সঙ্গিনীরা কেহ কেহ তাহাকে লইয়া যে টানাটানি করে নাই তাহা

নহে কিন্তু মলিনার গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া সবাই ক্ষান্ত হইয়াছে। তাহার এরূপ চেহারা ইতিপূর্বে আর কেহ কখন দেখে নাই।

ভোর হইবার সঙ্গে সঙ্গে মলিনা বাসরঘর হইতে বাহির হইয়া গিয়া দোতলায় ছাদের এক কোণে বসিয়া খুব খানিকক্ষণ কাঁদিল। একবার ইহাও তাহার মনে হইল ছাদ হইতে নীচে লাফাইয়া পড়িলে কেমন হয়, কিন্তু নীচের দিকে তাকাইতে তাহার আর সাহসে কুলাইল না। হাত-পা ঠক ঠক করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তাই শুধু চুপ করিয়া বাঁশবনের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বিবাহ-বাড়ী তখন নিদ্রামগ্ন। কেহ কোথাও জাগে নাই। যাহারা বাসর জাগিতে আসিয়াছিল তাহারাও সবাই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

মহেশবাবুর 'ডায়াবেটিস্' রোগ ছিল তাহার উপর অধিক খাটাখাটুনির ফলে এমন গায়ের জ্বালা ধরিয়াছিল যে ভোর হইবার বহু পূর্বেই সেদিন তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। তাই বহুক্ষণ বিছানায় ছটফট করিয়া তিনি যখন ছাদে শুইবার জন্য একটা মাদুর বগলে করিয়া উপরে উঠিলেন তখন মলিনাকে সেখানে একাকী ঐভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া তাঁহার মনে প্রথম একটা খটকা লাগিল। তবে কি তিনি সত্যই অন্যায় করিলেন তাহার এইভাবে বিবাহ দিয়া!

মলিনা তাঁহাকে দেখিতে পায় নাই। তিনি নিঃশব্দে তাহার পিছনে গিয়া দাঁড়াইলেন এবং ধীরে ধীরে তাহার মাথার উপরে একটি হাত রাখিয়া বলিলেন, তুই একলা এখানে কি করছিস্ মা?

মলিনা প্রথমটা চমকাইয়া উঠিল। তারপর কাঁদিতে কাঁদিতে ছিন্নলতার মত একেবারে তাঁহার পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িল। এমনভাবে কাঁদিতে তিনি আর কখনো তাহাকে দেখেন নাই। মহেশবাবু তাহাকে সান্ত্বনা দিতে দিতে বলিলেন, মা তুই রাজরাণী হয়েছিস—আমি কি তোকে যার-তার হাতে দিয়েছি!

মলিনা বলিল, মামা, আমি ত রাজরাণী হতে চাইনি, আমি যে গরীব কাঙ্গালের মেয়ে।

মহেশবাবু বলিলেন, তুমি যে মা-লক্ষ্মী—গরীবের ঘরে তোমার স্থান হবে কেন মা? তাই ভগবান মিলিয়ে দিয়েছেন এমন সুপাত্র। তা না হ'লে আমার কি সাধ্য আছে যে এত বড়লোকের ঘরে বিয়ে দেবো। পূর্বজন্মের বহু পুণ্য থাকলে তবে সতীশের মত পাত্র মেলে মা একথা যেন ভুলে যাস্নি!

বাস্তবিক, পাত্র হিসাবে সতীশ যে অত্যন্ত লোভনীয় সে বিষয়ে কাহারো কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। কলিকাতায় তাহার চারিখানা বাড়ী। তাহা ছাড়া গাড়ী-ঘোড়া লোকজন দাসদাসী যে কত তাহার ইয়ত্তা নাই। বড় ব্যবসায়ী সে। গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে জঙ্গল জমা লইয়া কাঠ বিক্রী করিয়া প্রতি বছরে মোটা টাকা লাভ করে। তবে বয়স যে একটু বেশী হইয়াছে তাহার জন্য দায়ী সে নিজেই। কেন না ছেলেবেলা হইতে সে কঠিন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যতদিন না রীতিমত বড়লোক হইতে পারে ততদিন বিবাহ করিবে না। তাই যখন তাহার সে ইচ্ছা পূর্ণ হইল তখন নিজে মেয়ে দেখিতে শুরু করিয়া দিল। গরীবের সুন্দরী মেয়ে বিবাহ করিবে ইহাও তাহার কল্পনা ছিল। তাই বহু মেয়ে অপছন্দ করিয়া শেষে মলিনাকে সে বিবাহ করিতে রাজী হইয়াছিল। বিবাহের ব্যাপারে যে বেশী বয়সটা একটা বাধা সৃষ্টি করিতে পারে ইহা সে মানিত না। পয়সা থাকিলে জীবনের পথে কোন বাধাই মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে না ইহাই বিশ্বাস করিত। উপযুক্ত ঘুষ দিতে পারিলে জগতে যে অসম্ভব সম্ভব হয়, ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে বহুবার সে তাহার প্রমাণ হাতে হাতে পাইয়াছে!

যদিচ ব্যবসা ও বিবাহ এক জিনিস নয় এবং টাকা দিয়া কাঠ কেনা যেমন সহজ মানুষের মন কেনা তত সহজ নয়, তবুও সতীশের অনুমানই ঠিক হইল। প্রথম দুই-চার দিন শ্বশুরবাড়ী যাইয়া মলিনা খুব কান্নাকাটি করিলেও ফুলশয্যার পরদিন হইতে সে একেবারে যেন বদলাইয়া গেল। কান্না দূরে থাক হাসিতে সর্বদা তাহার মুখ উদ্ভাসিত হইয়া থাকিত। ইহার কারণ আর কিছুই নয়। বিবাহের দিন হইতে মলিনাকে কান্নাকাটি করিতে দেখিয়া ফুলশয্যার দিন রাত্রে কোন কথা বলিবার আগেই সতীশ হীরামুক্তাখচিত একসেট অলঙ্কার তাহাকে উপহার দিয়া বসিল। গরীবের মেয়ে মলিনা সেই অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য লাভ করিয়া সতীশের প্রতি এমন কৃতজ্ঞ হইয়া উঠিল যে স্বামী যখন রাত্রে তাহাকে প্রশ্ন করিল তাহাকে মলিনার পছন্দ হইয়াছে কিনা, মলিনা তখন সে কথার কোন উত্তর দিতে না পারিয়া শুধু স্বামীর বুকের মধ্যে মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

সতীশ তাহার চোখের জল মুছাইয়া দিতে দিতে আবার জিজ্ঞাসা করিল, মলিনা তুমি কি আমায় ভালবাসতে পারবে না?

অশ্রু-জড়িত কণ্ঠে মলিনা বলিল, ওকথা ব'লো না, আমি যে তোমার পায়ের ধুলোর যোগ্য নই।

সতীশ তাহাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিল, ছিঃ মলিনা, ওকথা বলতে

নেই, ওকথা শুনলে আমার বড় কষ্ট হয়। তুমি যে আমার নয়নের মণি, হৃদয়ের সর্বস্ব—আমার দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষার ধন! তারপর আরো একটু আদর করিয়া বলিল, পারবে মলিনা আমাকে সম্পূর্ণরূপে তোমার ক'রে নিতে?

মলিনা একথার কি উত্তর দিবে ভাবিয়া পাইল না, শুধু স্বামীর বাহুবন্ধনের মধ্যে নিজেকে নিঃশেষে সমর্পণ করিয়া দিল।

কিন্তু তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া সতীশের বক্ষের মাঝে যেন কাল-বৈশাখীর ঝড় উঠিল। তাহার মনে হইল বুঝি এখনি তাহার বহু প্রতীক্ষিত আশা-তরণী ডুবিয়া যাইবে। তাই ব্যাকুলকণ্ঠে আবার বলিয়া উঠিল, বলো মলিনা, তুমি একবার মুখ ফুটে বলো—হবে আমার হৃদয়ের রাণী?

অতি অস্ফুটস্বরে মলিনা স্বামীর কানে কানে বলিল, বড় ভয় হয়--আমি যে বড় হতভাগিনী!

ক্ষিপ্তের মত সতীশ তাহার মুখে হাত চাপা দিয়া বলিল, না-না-না, ওকথা ব'লো না—তুমি যে এখন রাজরাণী!

মলিনা কাঁদিয়া ফেলিল—এত সোহাগ এত আদরের কথা শুনিয়া কি না, কে জানে!

পরদিন সকালে উঠিয়া সতীশ তাহার লোহার সিন্ধুকের চাবি মলিনার আঁচলে বাঁধিয়া দিয়া বলিল, আজ থেকে আমার সকল দায়িত্ব তোমার হাতে তুলে দিলুম।

মলিনা কি যেন বলিতে গেল কিন্তু তাহার মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইবার আগেই সতীশ সেখান হইতে চলিয়া গেল। মলিনা সেই আঁচলে বাঁধা চাবির গোছাটি হাতে করিয়া ধরিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ভিখারিণী সত্যই রাজরাণী হইল! মলিনা ভাবিয়া অবাক হইয়া গেল! সেইদিন হইতে কেন জানি না মলিনার কেবলই মনে হইতে লাগিল যে সে-বাড়ীর ছোট হইতে বড় সবাই তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে—যেন আদেশের প্রত্যাশায়।

চাকরবাকরেরা সর্বদাই মা মা বলিয়া তাহাকে ডাকিয়া অস্থির করিয়া তুলিত; তাহার উপর বাড়ীর ছেলে বুড়া সবাই যাহার যাহা সম্পর্ক—কেহ মামীমা, কেহ কাকীমা, কেহ জ্যাঠাইমা, কেহ বৌদিদি প্রভৃতি বলিয়া তাহাকে চারিদিক হইতে ডাকাডাকি শুরু করিয়া দিত।

প্রথম প্রথম মলিনার ভারি লজ্জা লাগিত এবং সত্যকথা বলিতে কি, বিরক্তিও

বোধ হইত। তাই তিন-চার বার ডাকিবার পর কোন রকমে একবার ঘাড় নাড়িয়া কিংবা ইশারা করিয়া কাহারো কথার উত্তর দিত। কিন্তু ক্রমশ তাহার চোখের দৃষ্টি যেন বদ্‌লাইয়া গেল। সেই ঘর-বাড়ী, দাস-দাসী, গাড়ী-ঘোড়া, লোক-জন সবাইকে তাহার একান্ত আপনার বলিয়া মনে হইতে লাগিল এবং তাহাদের ডাক তাহার কানে আসিবার সঙ্গে সঙ্গে যেন মধুবর্ষণ করিত। তখন আরো—আরো শুনিবার জন্য তাহার হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিত। তাহার উপর সতীশ আদরে, যত্নে, সেবায় তাহাকে এমন অভিভূত করিয়া ফেলিল যে বিবাহের আটদিন পরে যখন মলিনাকে বাপের বাড়ী লইয়া যাইবার জন্য লোক আসিল সে যাইতে রাজী হইল না। 'তোমাদের জামাইয়ের অসুবিধা হবে' এই অজুহাত দিয়া বিস্মিত মামাকে অনায়াসে ফিরাইয়া দিল।

আরো কিছুদিন থাকিয়া প্রায় দেড়মাস পরে মলিনা বাপের বাড়ী ফিরিল। রাজেন্দ্রাণীর মত তাহার বেশভূষা। অলঙ্কারে ঐশ্বর্যে ঝলমল করিতে করিতে সে তাহার মাকে গিয়া নমস্কার করিল।

মা তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া কাঁদিবেন কিনা ভাবিতেছেন এমন সময় মলিনার অত্যুজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিয়া তিনি বিস্ময়াভিভূত হইয়া গেলেন। তখন তিনি মেয়ের পা হইতে মাথা পর্যন্ত একবার চোখ বুলাইয়া লইয়া ব্যাপারটা বুঝিতে পারিলেন।

মলিনা ইচ্ছা করিয়া সমস্ত অলঙ্কার পরিয়া আসিয়াছিল। সোনা-রূপা, হীরামুক্তা ও জড়োয়ার গহনা কোনটাই রাখিয়া আসে নাই। যেখানে যাহা পরিলে ভাল দেখায় তাহা ত লইয়াছিলই উপরন্তু যে সব প্রতিবেশী বৃদ্ধ বর বলিয়া বিবাহের দিনে নাক তুলিয়াছিল বিশেষ করিয়া তাহাদের দেখাইবার জন্য বাকী গহনাগুলিও বাক্স ভরিয়া লইতে সে ভোলে নাই।

মলিনার মা মেয়েকে আশীর্বাদ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হ্যাঁরে মলি, এ সমস্ত গয়নাই কি তোর ?

মলিনা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হ্যাঁ—আরো আছে মা বাক্সয়।

খবর পাইয়া হৈ হৈ করিতে করিতে পাড়া-প্রতিবেশীরা আসিয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে বাড়ী ভরিয়া গেল। বালক, বালিকা, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, যুবতী, প্রৌঢ়া যে যেখানে যে অবস্থায় ছিল সবাই সেই বধূরূপিণী মলিনাকে দেখিতে আসিল।

পল্লীগ্রামে মেয়েরা প্রথম শ্বশুরবাড়ী হইতে বাপের বাড়ী ফিরিলে এই রকম ভীড় হইয়াই থাকে, তবে এক্ষেত্রে একটু বেশী জনতা হইবার কারণ এই যে বুড়োর হাতে পড়িয়া মলিনার ঠিক কতখানি সুখ বা দুঃখ হইয়াছে তাহাই সকলে পরীক্ষা করিতে আসিয়াছিল। সেইজন্য বাড়ীতে পা দিয়াই গ্রামসম্পর্কে পিসীমাসীর দল বলিয়া

উঠিলেন, তবু ভালো এতদিনে আমাদের মনে পড়লো—আমরা ত ভাবলাম বুঝি শ্বশুরবাড়ী পেয়ে মা-মাসীদের ভুলে গেলি লো।

সঙ্গে সঙ্গে মুখে গুল ঠুসিতে ঠুসিতে পাশের বাড়ীর ক্ষ্যান্তপিসী আসিয়া বলিলেন, খুব যাহোক দেখালি মা—ধন্যি কলিকালের মেয়ে—তোদের ক্ষুরে ক্ষুরে নমস্কার! বলি শ্বশুরবাড়ী আমাদেরও একদিন হয়েছিল, সোমত্ত বয়েসও ছিল—তবু যদি বুড়ো বড় না হতো ত কি করতিস! ওমা কি ঘেন্নার কথা মা, এখান থেকে লোক নিতে গেল, তাকে কিনা ফিরিয়ে দিলি! হ্যাঁলা মলিনা, লজ্জা-সরমের মাথাও কি একেবারে খেয়েছিস?

মলিনা ইহার কোন উত্তর না দিয়া শুধু খিল খিল করিয়া হাসিতে হাসিতে ঘরের ভিতর চলিয়া গেল। তাহাকে লক্ষ্য করিয়া যে চারিদিকে ঠাট্টা-বিদ্রূপের ঝড় বহিয়া গেল তাহা সে গ্রাহ্যও করিল না।

নববধূকে উদ্দেশ্য করিয়া এই রকম রসিকতা রোজই চলে। কিন্তু মলিনা কোন দিনই কান দেয় না। সে যে সুখী হইয়াছে—আশাতীত, কল্পনাতীত, সেটাই ইহাদের কাছে দেখাইবার জন্য সর্বদা চেষ্টা করে। যেমন কোনদিন যদি মামাতো ভাই-বোনেরা একটা পয়সা চাহে, সে একটা টাকা দিয়া বসে। কখনো বা একটা পুতুল কিনিয়া কাহাকেও হঠাৎ উপহার দেয়। কখনো বা তুচ্ছতম কাজ করাইয়া লইবার ছলে পাড়া-প্রতিবেশী বালক-বালিকাদের সিকি, আধুলি এমন কি টাকা পর্যন্ত বকশিশ করে।

মলিনার ইচ্ছা—সে যে বড়লোকের স্ত্রী একথাটা বাড়ী হইতে শুরু করিয়া দেশের সকলে জানুক।

তাই হয়ত ছেলেদের বারোয়ারী সরস্বতী পূজায় সে হঠাৎ পাঁচ টাকা চাঁদা দিয়া বসে; নয়ত মামাতো ভাইবোনেদের বনভোজনের সমস্ত খরচা নিজে বহন করিতে রাজী হয়। আবার কোন কোন দিন পাড়া-প্রতিবেশী পিসী-মাসীদের সঙ্গে তাস খেলিতে বসিয়া অকস্মাৎ মলিনা বাজী রাখে। তারপর ইচ্ছা করিয়া হারিয়া গিয়া বাক্স হইতে টাকা বাহির করিয়া আনিয়া সকলের সামনে ফেলিয়া দেয়।

তাহার ভুল খেলা দেখিয়া অপরপক্ষ চটিয়া ওঠেন। কিন্তু মলিনা তাহা গায়ে মাখে না। তাহার অংশীদারও যত রাগ করে, মলিনাও যেন তত হাসিতে খুশীতে ফাটিয়া পড়ে। অবশেষে তিনি বিরক্ত হইয়া বলেন, হ্যাঁলা মলি, বলি পয়সার দেমাকে যে একেবারে ফেটে পড়ছিস, তবু যদি বুড়ো ভাতার না হতো ত কি করতিস?

এই কথা শুনিয়া আরো জোরে সে হাসিয়া ওঠে। হাসিতে হাসিতে মলিনার দম

বন্ধ হইয়া যায়। কোন রকমে তাসটা মুখে চাপিয়া ধরিয়া তখন হাসির বেগ দমন করিতে করিতে সে বলে, হ্যাঁগা মাসী, তোমাদের ত জোয়ান বরের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল—তোমরা তখন কি করতে বলো না ?

তিনি ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন, কেন লা, মিলিয়ে দেখবি নাকি বুড়ো বরে আর জোয়ান বরে কত তফাৎ ?

মলিনা এই কথা শুনিয়া আরো হাসিতে উচ্ছ্বসিত হইয়া ওঠে। তারপর ছোট মেয়ের মত সোহাগভরা কণ্ঠে বলে, আমার ত মনে হয় তোমাদের বুড়ো জামাইয়ের মত এমন ক'রে আর কেউ ভালবাসতে জানে না।

ওলো এই বলে এখন নিজের মনকে প্রবোধ দে—দুধের স্বাদ কি ঘোলে মেটে ? এই বলিতে বলিতে আঁচলের খুঁট হইতে দোক্তা বাহির করিয়া ক্ষ্যান্ত পিসী মুখে একটু ফেলিয়া আবার তাস ভাঁজাইতে থাকেন।

ক্ষ্যান্ত পিসী পাড়ার সরকারী পিসী। মলিনার মা তাহাকে পিসী বলে, মলিনা, তাহাকে পিসী বলে, তাহার দিদিমাও নাকি ওই বলিয়া ডাকিতেন। আবার পাড়ার ছোট ছোট ছেলেরাও পিসী বলিয়া ডাকে। তাঁহার প্রায় সত্তর বছর বয়স হইয়াছে কিন্তু দশ বছর বয়সে বিধবা হইয়া সেই যে বাপের বাড়ী আসিয়া উঠিয়াছিলেন সেই হইতে এই দীর্ঘ ষাট বৎসর কাল ধরিয়া ওই একই নামে তিনি সর্বত্র সুপরিচিত। গ্রামের সব বাড়ীতেই তাঁর যেমন অবাধ গতিবিধি তেমনি অসীম প্রতিপত্তি। তবে দুপুরের আড্ডাটা বেশীর ভাগ দিন মলিনাদের বাড়ীতেই বসে। গ্রামের আরো পাঁচ-জন সেখানে আসিয়া জোটে এবং সবাই ক্ষ্যান্ত পিসীর কথায় সায় দিয়া তাঁহাকে খুশী রাখিতে চায়। তাই মলিনা সেই কথার উত্তরে একরকম সবাইকেই প্রতিবাদ জানাইয়া বলিল, আমিও বলি পিসীমা, দুধ ও ঘোলে তফাৎ আছে কিন্তু মেয়েদের কাছে বরেরা সবাই সমান—কোন তফাৎ নেই। বরং বুড়োদের কাছ থেকে যত্ন ভালবাসা বেশী পাওয়া যায়।

ক্ষ্যান্ত পিসী বলিলেন, ওমা, অবাক করলি মলিনা—বুড়ো ও ছোঁড়াকে তুই যে একদলে ফেললি !

মলিনা হাসিতে হাসিতে বলিল, মেয়েদের কাছে ত তারা এক পিসীমা—শুধু পুরুষ। তাছাড়া ছোঁড়াদের মন পাবার জন্যে মেয়েদের সর্বদা ভয়ে ভয়ে থাকতে হয় কিন্তু বুড়োদের বেলায় ঠিক উল্টো—মেয়েদের মন পাবার জন্যে তারা সর্বদাই 'দেহি পদপল্লবমুদারম্' বলে।

মাথার উপর চুলটা টিপি করিয়া জড়াইতে জড়াইতে একজন খপ করিয়া বলিয়া

উঠিল, ওলো মলি শোন তবে বলি—ইচ্ছে ক'রে আমি রাগ করতুম আর না খেয়ে শুয়ে পড়ে থাকতুম, তখন তোর মেশোমশাই পায়ে ধরে কত খোশামোদ করতো, তবে আমি ভাত মুখে দিতুম—তোর মেশোমশায়কে দেখতে ছিল ঠিক রাজপুত্তুরের মত, আর বয়সে আমার চেয়ে দুবছরের বড় ছিল মোটে। ভালবাসতে ছোঁড়ারাও জানে লো জানে।

মলিনা বলিল, তোমাকে ত তবু রাগ করতে হতো আর আমাকে যে তাও করতে হয় না—তোমাদের জামাই পায়ে ধরা দূরে থাক একেবারে পায়ের তলাতেই পড়ে আছে। এই বলিতে বলিতে খিল খিল করিয়া সে হাসিয়া উঠিল।

ক্ষান্ত পিসী বলিলেন, তাহোক্, তবু বুড়ো বরের সঙ্গে ছোকরা বরের আকাশ-পাতাল তফাৎ।

মলিনা ইহার কি একটা উত্তর দিতে যাইতেছিল কিন্তু পারিল না। সবাই তাস খেলা ভঙ্গ করিয়া ঠিক সেই সময় উঠিয়া পড়িল।

তখনো পল্লীগ্রামের মেয়েদের পুকুরের ঘাটে গিয়া গা ধুইবার সময় হয় নাই, তবুও কিন্তু মলিনা সাবানদানী হাতে করিয়া তোয়ালে কাঁধে ফেলিয়া তাহাদের বাড়ীর সংলগ্ন দীঘিটার সানবাঁধানো ঘাটে গিয়া নামিল। জলের মধ্যে প্রথম যে সিঁড়িটা ডুবিয়াছিল তাহার উপর বসিয়া মলিনা ভাবিতে লাগিল ক্ষান্তপিসীর সেই কথাটি।

কিন্তু যতই সে ভাবে ততই তাহার মনে হয় মেয়েদের জীবনে যুবক ও বৃদ্ধে কোন প্রভেদ নাই, সব এক—তাহারা শুধুই পুরুষ! তাই যদি হয় তবে এত বিচার করিবার কি আছে? বরং বৃদ্ধ স্বামীর হাতে পড়া নারীর সৌভাগ্য। যশ, অর্থ, খ্যাতি, প্রতিপত্তি সমস্তই প্রথম দিন হইতে স্বামীর নিকট পাওয়া যায়। বরং তাহার সমবয়সী অন্যান্য মেয়ে, যাহাদের তরুণ যুবকের সঙ্গে বিবাহ হইয়াছে, তাহাদের কথা চিন্তা করিয়া মলিনার মনে রীতিমত কষ্ট হইতে লাগিল। একমুঠা ভাতের সংস্থান করিতে যে সব যুবকের দিনরাত কঠিন সংগ্রাম করিতে হয় তাহাদের জীবনে সুখ বা আনন্দ ত একেবারেই দুর্লভ। মলিনার বহু সঙ্গিনী ত তাহারই কাছে স্বামীর দারিদ্র্যের কথা উল্লেখ করিয়া কত কাঁদিয়াছে, কত দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়াছে! তবে বিবাহের অর্থ কি—যদি সুখ-শান্তি না রহিল মানুষের মনে? অথচ নারী—সে-ত দেবতার পায়ে নিবেদিত ফুলের মত। বিরাট পাথরের দেবতাও তাহার কাছে যা, হাতে গড়া মাটির মহাদেবও তাই। ফুল, সর্বদা ফুলই!

এই সব চিন্তা করিতে করিতে মলিনার কেবলই মনে হইতে লাগিল, বিবাহে

তাহারই জিত হইয়াছে সবচেয়ে বেশী—ক্ষান্ত পিসীর ধারণা একেবারে ভুল ! সাঁতার দিয়া তখন সে পুকুর তোলপাড় করিতে লাগিল।

বাস্তবিকই মলিনা জিতিয়াছে, তাহার মনে সুখ আর ধরে না। জুড়ি-গাড়ী, লোক-লস্কর, খ্যাতি-প্রতিপত্তি, স্বামীর ভালবাসা, সবই সে পাইয়াছে পূর্ণমাত্রায়। তাহাকে খুশী করিবার জন্য তাহার স্বামী সর্বদাই ব্যস্ত থাকে। আরো বহু মেয়ের বিবাহ হইয়াছে সত্য কিন্তু এমন ধারা স্বামী কয়জন পাইয়াছে ?

প্রকৃতই সতীশের মনে অহরহ শুধু জাগিয়া থাকিত মলিনাকে খুশী করিবার চিন্তা। মলিনা রূপসী, যুবতী এবং অল্পবয়সী ! তাই প্রাণপণ যত্নে সে মলিনার মন রাখিতে চেষ্টা করিত। এবং একটা জিনিস চাহিলে দশটা আনিয়া দিয়া তাহাকে সুখী করিত।

এইভাবে খুশী করিতে করিতে মাত্র দুই বৎসর পরে সতীশ দেখিল নিজস্ব সত্তা বলিয়া তাহার আর কিছু নাই। মলিনার খুশীতে তাহার খুশী, মলিনার সুখে-দুঃখে তাহার সুখ-দুঃখ ! তাহার স্ত্রী যে তাহাকে এত অল্পদিনের মধ্যে জয় করিয়া লইয়াছে ইহা ভাবিয়াও সতীশ মনে মনে অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিত। মলিনার মত সুন্দরী ও যুবতী স্ত্রীর হাতে নিজেকে নিঃশেষে দান করিতে পারিয়া সে যেন ধন্য হইয়াছে ! ইহার জন্য তাহার মনে গর্ব ও আনন্দের সীমা ছিল না ! স্ত্রীর ভালবাসার কথা বলিতে যাইয়া সতীশ বন্ধুবান্ধবদের কাছে পঞ্চমুখ হইয়া উঠিত।

মলিনাও স্বামীর প্রেমে গদগদ। সঙ্গিনীদের বুঝাইতে ছাড়িত না যে এমন স্বামী পৃথিবীতে আর কখনো কাহারো হয় নাই।

সত্যই মলিনা স্বামীর নিকট হইতে প্রতিনিয়ত এই রকম অযাচিত ও অপ্রত্যাশিত স্নেহ-ভালবাসার শত সহস্র নিদর্শন পাইয়া সতীশকে দেবতার মত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত। একদিনের জন্যও তাহাদের মধ্যে কোন অশান্তি, কোন মালিন্যের সৃষ্টি হয় নাই। অতি আনন্দে তাহাদের দিন কাটিতেছিল।

ইহার উপর আবার সতীশ আর এক চমক লাগাইয়া দিল। তাহাদের বিবাহের দিনটির স্মৃতি উজ্জ্বলতর করিবার জন্য চিত্তরঞ্জন এভিনিউ-এর উপর বিরাট এক সৌধ গোপনে নির্মাণ করাইয়া তাহাদের বিবাহের পঞ্চম বাৎসরিক দিনে উহা মলিনাকে উপহার দিয়া বসিল। বাড়ীটির নাম সুখস্মৃতি ! মলিনা তাহার স্বামীর নিকট হইতে এই অপ্রত্যাশিত উপহার লাভ করিয়া দিশাহারা হইয়া গেল। কি করিয়া স্বামীকে

খুশী করিবে ভাবিয়া না পাইয়া সে তখন স্বামীর একটা বিরাট তৈলচিত্র আনিয়া তাহার শয্যার পাশে রাখিয়া দিয়া বলিল, তুমি দিনরাত আমার চোখের সামনে এমনি ক'রে দাঁড়িয়ে থাকবে।

সতীশ তাহাতে বাধা দিয়া বলিল, তা' হবে না—তোমাকেও সকল সময় আমার চোখের সামনে থাকতে হবে। অর্থাৎ আমার ছবির বাঁ পাশে তোমারও একখানি ছবি থাকবে। এই বলিয়া মলিনারও একখানা বিরাট তৈলচিত্র করাইয়া সতীশ তাহার ছবির পাশে টাঙাইয়া দিল। তারপর দুজনে মিলিয়া সেই ছবির দিকে চাহিয়া খুব একচোট হাসিল।

তখন সতীশ বলিল, না, এও ভালো দেখাচ্ছে না—তোমার এবং আমার ছবির মাঝে যেন ফাঁক রয়েছে। তার চেয়ে এসো দু'জনের একখানা যুগল ছবি এনে এখানে রাখা যাক্।

তাহাই হইল। মলিনা চেয়ারে বসিয়া আছে আর তাহার কাঁধে হাত দিয়া সতীশ দাঁড়াইয়া আছে—এইরূপ একখানি বিরাট তৈলচিত্র আঁকাইয়া তাহাদের শোবার ঘরে রাখা হইল। সোনালী ফ্রেমে বাঁধানো প্রকাণ্ড ছবি দক্ষিণের দেওয়ালটা জুড়িয়া জলজল করিতে লাগিল।

সতীশ তখন ধীরে ধীরে মলিনার একটি হাত নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিল, মলিনা, আজ আমার চেয়ে সুখী জগতে কে?

স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া মলিনা বলিল, আমি।

সতীশ তাহাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, সত্যি বলছো?

মলিনা বলিল এর, চেয়ে সত্যি কথা আমি জীবনে বোধহয় আর কোনদিন বলি নি। তুমি নিজেই ভেবে দেখো বাঙ্গালীর ঘরে আমার মত ভাগ্যবতী মেয়ে ক'টা আছে? কোন্ মেয়ে আমার মতো এমন স্বামী পেয়েছে?

সতীশ বহুবার স্ত্রীর মুখে নিজের প্রশংসা শুনিয়াছে। তবু আনন্দে তখন তাহার সর্বাঙ্গ থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। সে আর সেখানে দাঁড়াইতে পারিল না, ঘর হইতে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল।

মলিনার মনও তখন আনন্দে উৎসাহে উচ্ছ্বসিত। সে ঘরের চারিদিকে গুন্ গুন্ করিয়া গান গাহিয়া চোখ বুলাইতে লাগিল; শ্বেতপাথরের মেঝে, মসৃণ ও চিক্কণ, পাথরের দেওয়ালগুলি অপূর্ব কারুকার্যখচিত, ছাদ হইতে বড় বড় কাঁচের বৈদ্যুতিক ঝাড়-আলো ঝুলিতেছে, জানলায়-দরজায় নানা বর্ণের রঙিন কাঁচ দেওয়া। এরকম ঘর ইতিপূর্বে আর মলিনা দেখে নাই। তাই এই বিরাট অট্টালিকাটি যে তাহারই,

জন্য নির্মিত একথা চিন্তা করিতে গিয়া তাহার সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল! বার-বার তাহার মনে হইতে লাগিল ইহা ত ইট, কাঠ, চুন, সুরকী, পাথরের বাড়ী নহে, ইহা যেন তাহার স্বামীর অন্তরের সমস্ত প্রেম দিয়া গড়া তাজমহল!

স্বামীর প্রেমে বিভোর হইয়া মলিনা তখন পশ্চিমের জানলার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। হাওয়ায় তাহার উপরের খড়খড়ি দুইটি বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। তাড়াতাড়ি সে তাহা খুলিয়া ছিটকিনি লাগাইয়া দিল।

শীতের মধ্যাহ্ন। কলিকাতার বাড়ীগুলির উপর তখন সূর্যের নিস্তেজ আলো পড়িয়া অপূর্ব শ্রী ধারণ করিয়াছিল। মলিনা চারতলার ঘরের জানালায় দাঁড়াইয়া তাহা দেখিতে লাগিল।

হঠাৎ দুই খানা বাড়ী পার হইয়া একটি দোতলার ঘরে তাহার দৃষ্টি যাইতেই সে চমকাইয়া উঠিল! একটি যুবক ঘরের মেঝের উপর মাদুরে ঘুমাইতেছে আর একটি যুবতী তাহার ঘুম ভাঙ্গাইবার জন্য নানারকম কৌশল করিতেছে। কখনো সে তাহার চুল ধরিয়া টানিতেছে, কখনো বা পিঠে কিল চড় মারিতেছে, কখনো বা পা ধরিয়া টানাটানি করিতেছে, কিন্তু যুবকটি মড়ার মত পড়িয়া আছে। শেষে সেই যুবতীটি গ্লাসে করিয়া একটু জল আনিয়া তাহার গালের উপর দুই চার ফোঁটা ফেলিয়া দিল। যেমন দেওয়া সঙ্গে সঙ্গে যুবকটি লাফাইয়া উঠিল। মেয়েটি তখন হাসিতে হাসিতে পলাইয়া যাইতেছিল কিন্তু খপ করিয়া তাহার কাপড়ের আঁচলটি ধরিয়া ফেলিয়া যুবকটি একেবারে তাহাকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিল। তারপর যাহা করিতে লাগিল তাহা আর মলিনা দাঁড়াইয়া দেখিতে পারিল না। তাহার মাথা ঝিমঝিম করিতে লাগিল, সে পলাইয়া আসিল সেখান হইতে। তবে তাহারা যে স্বামী-স্ত্রী, এ কথা বুঝিতে তাহার বাকী রহিল না।

মলিনা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া ঘরের মাঝখানে দাঁড়াইয়া কি ভাবিল তারপর আবার ছুটিয়া জানলায় গেল তাহাদের দেখিতে। এবার আর এক নতুন দৃশ্য তাহার চোখে পড়িল। মেয়েটি ঘরের মধ্যে এখানে ওখানে ছুটাছুটি করিতেছে আর তাহার স্বামী ধরিবার জন্য তাহার পশ্চাতে ছোট ছেলের মত দৌড়াইয়া মরিতেছে।

মলিনা আর দাঁড়াইতে পারিল না—তাড়াতাড়ি চোখে হাত চাপা দিয়া বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল। তাহার সারা দেহ তখন থরথর করিয়া কাঁপিতেছে।

শুইয়া শুইয়া সে প্রতিজ্ঞা করিল আর কখনও সে ও-বাড়ীর দিকে চাহিবে না। কিন্তু ঘণ্টাখানেক যাইতে না যাইতে মলিনার মন কেমন অস্থির হইয়া উঠিল, চুপি চুপি আবার সে গিয়া দাঁড়াইল জানলার ধারে। এবার দেখিল তাহারা দু'জনে

কাড়াকাড়ি করিয়া মুড়ি খাইতেছে! কখনো স্বামী স্ত্রীর মুখে দিতেছে, কখনো বা স্ত্রী স্বামীর মুখে খাওয়াইয়া দিতেছে। সেদিকে চাহিয়া তাহার শরীরের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিল, সে দুই হাতে বক্ষ চাপিয়া ধরিয়া সেইখানেই বসিয়া পড়িল।

এইভাবে কয়েক মিনিট কাটিয়া যাইবার পর যেমন সে উঠিয়া দাঁড়াইল অমনি তাহার চোখ পুনরায় গিয়া পড়িল সেই মেয়েটির দিকে। মেয়েটি তখন বারান্দায় দাঁড়াইয়া হাত নাড়িতেছিল আর যুবকটি রাস্তা দিয়া চলিতে চলিতে বারবার পিছন ফিরিয়া তাহাকে দেখিতেছিল।

মলিনার মুখ-চোখ দিয়া আগুন বাহির হইতে লাগিল। তাহার অন্তরে একটা কিসের ঝড় উঠিল। সে আর সে-দৃশ্য সহ্য করিতে পারিল না। মাতালের মত টলিতে টলিতে একেবারে বিছানায় গিয়া আছ্‌ড়াইয়া পড়িল। শুধু তাহার দুই চক্ষু দিয়া নিঃশব্দে কয়েক ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল, কেন তাহা সে নিজেও বুঝিতে পারিল না।

চারটা বাজিবার সঙ্গে সঙ্গে সতীশ কতকগুলি ফুলের মালা হাতে করিয়া ঘরে আসিয়া ঢুকিল। মলিনা ঘুমাইতেছে মনে করিয়া একটি মালা সে চুপি চুপি তাহার গলায় পরাইয়া দিল। গলা হইতে মালাটি খুলিয়া ফেলিয়া দিয়া মলিনা বলিল, যাও, কী করো ভাল লাগে না, আমায় বিরক্ত করো না।

মলিনার মুখের দিকে চাহিয়া সতীশের বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি তাহার কপালে হাত দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, মলিনা, তোমার কি অসুখ করেছে?

মলিনা প্রথমটা তাহার কথার কোন উত্তর দিল না, চুপ করিয়া রহিল। তখন সতীশ তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে আবার প্রশ্ন করিল, মলিনা, তোমার কি হয়েছে বলো, লক্ষ্মীটি!

মলিনা তাহার মাথার উপর হইতে স্বামীর হাতটি সরাইয়া দিয়া বলিল, কিছু হয় নি—

ব্যগ্রকণ্ঠে সতীশ আবার বলিল, তবে তুমি এমন করছো কেন?

মলিনা বিরক্তিপূর্ণকণ্ঠে বলিল, জানি না! তোমার দু'টি পায়ে পড়ি আমায় একটু একলা থাকতে দাও।

মলিনার এই ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া সতীশের মনটা ভারী খারাপ হইয়া গেল। কোন দিন ত সে মলিনাকে এইভাবে তাহার মুখের উপর কথা বলিতে শোনে নাই,

তবে আজ তাহার কি হইল? কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া সতীশ ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সেদিন রাত্রে মলিনা স্বামীর সহিত একটা কথাও কহিল না। সতীশও আর তাহাকে বিরক্ত করিল না! সে মনে করিল গৃহ-প্রবেশ উপলক্ষে খাটাখাটি করিয়া শরীরটা হয়ত তাহার খারাপ হইয়াছে, ভাল করিয়া একটু ঘুমাইলে কাল আবার ঠিক হইয়া যাইবে।

কিন্তু পরের দিন হইতে সতীশ লক্ষ্য করিল, মলিনা তেমনি গম্ভীর হইয়াই থাকে। আগের মত আর হাসিখুশী ভাব তাহার মুখে দেখা যায় না—সংক্ষেপে স্বামীর কথার উত্তর দিয়া চলিয়া যায়। সর্বদাই যেন সে একলা থাকিতে চায়।

এইভাবে আরো কয়েক দিন কাটিয়া গেল, তবুও সতীশ তাহাকে মুখ ফুটিয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিল না। শুধু একদিন চুপি চুপি সে ঝিকে প্রশ্ন প্রশ্ন করিল, তোর মার কি হয়েছে বলতে পারিস?

ঝি বলিল, কি করে জানবো বাবু, আমাদের সঙ্গে ত মা ভাল ক'রে কথাই বলেন না, সংসারের কোন খবর জিজ্ঞেস করতে গেলেও যেন খিঁচিয়ে ওঠেন সকলের ওপর। শুধু যখন তখন দেখি, হয় পশ্চিমের জানলাটার কাছে গিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন, নয় বিছানায় মুখ গুঁজে শুয়ে আছেন।

বাস্তবিক কথাটা ঝি মিথ্যা বলে নাই। মলিনার কেমন যেন নেশা হইয়া গিয়াছিল সেই স্বামী-স্ত্রীর প্রণয়-লীলা দেখা। রোজই সে মনে করিত আর দেখিবে না, অথচ সে কিছুতেই নিজেকে উহা হইতে বিরত করিতে পারিত না—কে যেন এক অমোঘ বলে তাহাকে প্রতিদিন সেইদিকে টানিয়া লইয়া যাইত।

এইরূপে আরো কিছুদিন কাটিয়া গেল। অবশেষে সতীশ একদিন রাত্রে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, মলিনা, আমাকে আজ বলতেই হবে তোমার কি হয়েছে? স্বামী স্ত্রীলোকের দেবতা, তার কাছে কোন কথা লুকানো পাপ! সত্যি করে বলো, তুমি কেন সব সময় এমন মনমরা হয়ে থাক?

মলিনা কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, আমাকে এ বাড়ী থেকে তুমি নিয়ে চলো—এখানে আমার মন টিকছে না।

সতীশ বলিল, এতদিন একথা আমায় ত বললেই পারতে, এর জন্যে এত মন খারাপ করার কি আছে?

মলিনা তেমনি কাঁদিতে কাঁদিতে জবাব দিল, আমি অনেক চেষ্টা করলুম এখানে মন টেকাতে কিন্তু আর যেন পারছি না।

তাহাই হইল। পরের দিন সকালে উঠিয়া সতীশ মলিনাকে লইয়া তাহাদের পুরানো বাড়ীতে চলিয়া গেল। কিন্তু মুশকিল হইল আবার দুই-তিন দিন যাইতে না যাইতে মলিনা সতীশকে বলিল, আমাকে নতুন বাড়ীতে নিয়ে চলো—এখানে আরো খারাপ লাগছে।

এবারও সতীশ তাহার অনুরোধ রক্ষা না করিয়া পারিল না। মলিনার ইচ্ছানুরূপ ব্যবস্থাই করিল। কিন্তু পুনরায় দুই দিন কাটিতে না কাটিতে মলিনা সতীশকে ধরিয়া বসিল, আমাকে নতুন বাড়ী থেকে নিয়ে চলো—এখানে আর একমুহূর্তও ভালো লাগছে না।

সতীশ বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল, সে কি! এই বললে পুরনো বাড়ীতে মন টেকে না, ব্যাপার কি বলো ত?

মলিনা বলিল, তা আমি জানি না—আমাকে এখনি এখান থেকে নিয়ে চলো—নইলে আমি পাগল হয়ে যাবো।

সতীশ কোন দিন মলিনার কথার উপর কথা বলে নাই—তাহার ইচ্ছা পূর্ণ করাই ছিল সতীশের জীবনের একমাত্র ব্রত, সুতরাং এক্ষেত্রেও উহার ব্যতিক্রম হইল না।···কিন্তু এবারেও দুইতিন দিন বাদেই মলিনা আবার নূতন বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল।

এতবার বাড়ীবদলের পরও মলিনাকে সেই রকম গম্ভীর হইয়া থাকিতে দেখিয়া সতীশ একদিন প্রশ্ন করিল, মলিনা, তোমার কি হয়েছে আমাকে বলো দিকি—এই নতুন বাড়ীতে আসার দিন থেকে তোমার মুখে হাসি নেই, যেন দিনরাত কি চিন্তা করো—না, না, আমি কোন কথা শুনতে চাই না—আজ আমায় বলতেই হবে তোমার কি হয়েছে?

ইহার উত্তরে প্রথমে মলিনা বলিল, জানি না। তারপর বারবার অনুরোধ করিতে যেন একটু বিরক্ত হইয়া সে স্বামীর মুখের উপর উত্তর করিল, মানুষ কি দিনরাত শুধু হি হি ক'রে হাসবে নাকি?

না তা নয়। তা ব'লে তুমি সব সময় এমনি গম্ভীর হয়ে থাকবে? আমি তো তোমার কোন অভাব অপূর্ণ রাখি নি। যখন যা চেয়েছো সমস্তই এনে দিয়েছি, কাপড়, গয়না, বাড়ী, ঘর-দোর, চাকর-দাসী, লোকজন—আর কি স্ত্রীলোক স্বামীর কাছ থেকে প্রত্যাশা করতে পারে?

মলিনা অভিমানভরা কণ্ঠে কহিল, আমি তো তোমার কাছ থেকে আর কিছু

চাই নি, তবে মিছিমিছি কেন তুমি আমার ওপর রাগ করছো!

সতীশ বলিল, না রাগের কথা নয়—তবে এ বাড়ীতে আসার পরদিন থেকেই তুমি যেন মনে মনে আমার ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছো বলে মনে হয়। আমাকে দেখলেই যেন তোমার মুখের হাসি কোথায় চলে যায়।

মলিনা অপেক্ষাকৃত সহজ ভাবে উত্তর দিল, তোমার বোধহয় জানা নেই যে হাসিখুশীরও একটা বয়েস আছে।

সতীশ বলিল, তা তোমার কি সে বয়েস কেটে গেছে?

মলিনা উত্তর দিল, আমার হয়ত কাটে নি কিন্তু তোমার তো কেটে গেছে!

সতীশ মিনিটখানেক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, হঠাৎ এ বাড়ীতে আসার পব থেকে তুমি আমার বয়েস সম্বন্ধে যেন বেশী সচেতন হয়ে উঠছো—এর আগে কি আমার বয়েস অল্প ছিল, না সেদিকে তোমার দৃষ্টি ছিল না, কোন্‌টা সত্যি?

দেখ, তোমার এসব বাজে কথা শুনতে আমার ভাল লাগে না। বলিয়া যেমন মলিনা চলিয়া যাইবার জন্য পা বাড়াইল অমনি সতীশ খপ্‌ করিয়া তাহার একটি হাত ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, মলিনা আজ সত্যি ক'রে বলতেই হবে, তোমার কি হয়েছে?

কি আবার হবে!

নিশ্চয় কিছু হয়েছে, তোমায় বলতেই হবে, আমার দিব্যি!

মলিনা সে কথার উত্তর না দিয়া শুধু ছেলেমানুষের মত স্বামীর মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া বলিল, কিছু হয়নি! তারপর আবার একটু থামিয়া কহিল, তুমি ওই পশ্চিমের জানলাটা বন্ধ করে দিতে পারো, যাতে ওটা আর জীবনে খোলা না যায়?

তাহার প্রশ্নের এই রকম অবান্তর উত্তর শুনিয়া প্রথমটা সতীশ যেন একটু বিস্মিত হইল। তারপর ভাবিল হয়ত বাহিরের দিক হইতে কেহ তাহার প্রতি কুদৃষ্টি নিক্ষেপ করে, সেইজন্য মলিনা তাহাকে এইরূপ অনুরোধ করিতেছে। তাই আর এক মুহূর্ত দেরি না করিয়া সতীশ সেইদিনই মিস্ত্রী ডাকাইয়া সেই জানলাটা বাহির হইতে একেবারে আঁটিয়া দিল।

ইহার পরদিন হইতে মলিনার যেন গৃহের কাজ-কর্মে কিছু উৎসাহ দেখা গেল। বলা বাহুল্য ইহা লক্ষ্য করিয়া সতীশেরও মনটা একটু প্রফুল্ল হইল।

কিন্তু দুই দিন কাটিয়া গিয়া তৃতীয় দিনে এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটিল। দুপুর বেলা যখন সবাই দিবা-নিদ্রায় মগ্ন, তখন হঠাৎ মলিনা শয্যা ত্যাগ করিয়া সেই বন্ধ জানলার কাছে গিয়া দুম্ দুম্ করিয়া পদাঘাত করিতে লাগিল। তাহাতেও যখন

জানলাটা খুলিল না তখন সে হাত দিয়া টানাটানি শুরু করিয়া দিল। এবং ইহাতেও যখন ব্যর্থ হইল, তখন সে সজোরে জানলায় মাথা ঠুকিতে লাগিল। যেমন করিয়া হউক সেই বন্ধ কপাট যেন তাহাকে খুলিতেই হইবে—খুন চাপিয়াছে তাহার মাথায়!

সেই শব্দ শুনিয়া ঝিয়েদের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তাহারা ছুটিয়া আসিয়া দেখিল মলিনার মাথা ফুলিয়া উঠিয়াছে, তবুও সে আঘাতের পর আঘাত করিয়া চলিয়াছে সেই জানলাটা খুলিবার জন্য। ঝিয়েরা তাড়াতাড়ি গিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, মা জানলা যে বন্ধ তুমি কি তা জানো না?

মলিনা হাঁপাইতে হাঁপাইতে শুধু বলিল, আমি কিছু জানতে চাই না, শীগ্‌গির খুলে দে বলছি জানলাটা।

একদিন যে মানুষ নিজে হুকুম দিয়া সেই জানলাটি বন্ধ করিয়া দিয়াছে আজ সে-ই আবার তাহা খুলিবার জন্য কেন যে মাথা কুটিয়া মরিতেছে তাহা বুঝিতে না পারিয়া ঝিয়েরা তৎক্ষণাৎ ছুটাছুটি করিয়া ছুতার মিস্ত্রী ডাকিয়া আনিয়া তাহা খুলিয়া দিল।

কিন্তু এবার সেই বাড়ীটির দিকে চাহিয়া মলিনা অত্যন্ত মর্মাহত হইল। দেখিল সেই নবদম্পতীটি নাই, তাহার স্থলে কয়েকটি পুলিশ ও বহু লোকজন সেখানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। কি হইল? কোথায় গেল তাহারা? ভয়ে তাহার বুক টিপ টিপ করিতে লাগিল। সে তখন চুপি চুপি একজন ঝিকে সেখানে পাঠাইয়া দিল ব্যাপারটা কি জানিয়া আসিবার জন্য।

ঝি ফিরিয়া আসিয়া যাহা বলিল তাহার সারাংশ হইতেছে এইরূপ—সেই দম্পতীটি পনেরো টাকা ভাড়ায় উপরের একখানি ঘর লইয়া থাকিত কিন্তু চারি মাসের ভাড়া দিতে না পারায় বাড়ীওয়ালা তাহাদের নামে নালিশ করিয়াছিল। তাই আদালত হইতে লোক আসিয়া তাহাদের মালপত্র সব নিলাম করিবার জন্য টানিয়া লইয়া যাইতেছে।

মলিনা এই কথা শুনিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তারপর ঝিকে প্রশ্ন করিল, হ্যাঁরে, তাহ'লে ওরা কি এখান থেকে চলে যাবে?

ঝি বলিল, চলে যাবে না ত কি মা—বাড়ীওলা আর কতদিন বিনাভাড়ায় রাখবে বল? তারওপর ছোঁড়া নাকি চাকরি-বাকরি কিছুই করে না, শুধু বাড়ীতে বসে থাকে।

মলিনা আরো কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, ওদের কি এখানে এমন কোন আপনার লোক নেই যে এই বিপদের সময় রক্ষা করে?

ঝি ঠোঁট উল্‌টাইয়া বলিল, আ আমার পোড়াকপাল! তবেই তুমি আপনার লোকদের চিনেছ? পয়সা না থাকলে দুনিয়ার কেউই আপনার হয় না মা! বলিয়া

সে সশব্দে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল।

মলিনা তাড়াতাড়ি আলমারি খুলিয়া একশো টাকার একখানা নোট বাহির করিয়া বলিল, আহা বড় গরীব মানুষ ওরা, তুই এই টাকাটা ওদের দিয়ে আয় ঝি।

ঝি টাকাটা হাতে লইয়া নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল এবং যাইবার সময় বলিতে বলিতে গেল, সত্যি, দয়ার শরীর বটে তোমার মা! তুমি যেমন গরীবকে দিচ্ছো, ভগবান তোমায় তেমনি দশগুণ দেবেন।

পরদিন দুপুরবেলা হঠাৎ সেই বউটি মলিনার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। উহাকে দেখিয়াই তাহার বুকের ভিতরটা কেমন জ্বলিয়া উঠিল। ঈর্ষিত দৃষ্টিতে মলিনা উহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল এবং কিছুক্ষণ পর্যন্ত তাহার মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না। কিন্তু মলিনা কিছু বলিবার পূর্বেই বৌটি তাহার হাত দুইটি ধরিয়া পূর্বদিনের উপকারের জন্য ছলছল নেত্রে কৃতজ্ঞতা জানাইল। তারপর বিনয় ও সঙ্কোচের সঙ্গে তাহার কাছে স্বামীর একটি চাকরির জন্যও প্রার্থনা করিল। বউটির নাম নলিনী।

চাকরির কথা শুনিয়া কণ্ঠে ঈষৎ শ্লেষ আনিয়া মলিনা বলিল, চাকরি যদি তোমার স্বামী করে তাহ'লে তুমি কি করবে?

কথাটার অর্থ ভাল রকম বুঝিতে না পারিয়া নলিনী তাহার মুখের দিকে জিজ্ঞাসু-নেত্রে চাহিয়া রহিল।

মলিনা তখন ঈষৎ হাসিয়া বলিল, অর্থাৎ তোমার সোমত্ত বয়েস, তার ওপর অমন জোয়ান স্বামী—তাকে ছেড়ে কি থাকতে পারবে?

গরীবদের আবার সোমত্ত বয়েসই বা কি, আর জোয়ান স্বামীই বা কি,—একমুঠো ভাতের মূল্যই আমাদের কাছে সবচেয়ে বড় দিদি—এই বলিয়া নলিনী করুণ দৃষ্টিতে মলিনার মুখের দিকে তাকাইল।

মলিনা ভাবিল, যাক বাঁচা গেছে, তাহ'লে এরও মনে দুঃখ আছে! সে তখন মনে মনে যেন একটু উল্লসিত হইল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার তাহার মনে পড়িয়া গেল যদি এতই দুঃখ তবে তাহারা স্বামী-স্ত্রীতে কেমন করিয়া এমন আমোদে দিন কাটায়? এই কথাটা মাথায় যাইবামাত্র পুনরায় তাহার মন খারাপ হইয়া গেল। তাহার স্বামীর চাকরি করিয়া দিলে পাছে নলিনী আরো সুখী হয় তাই মলিনা মনে মনে স্থির করিল ইহাতে সে কিছুতেই রাজী হইবে না। কিন্তু আবার কি ভাবিয়া পরক্ষণেই নলিনীকে কহিল, তাছাড়া আমাদের কাছে চাকরি করতে হ'লে বনে-

জঙ্গলে তোমার স্বামীকে ঘুরে বেড়াতে হবে, কলকাতার শহরে বসে তোমার মুখের দিকে দিনরাত চেয়ে থাকলে ত চলবে না!

নলিনী তাড়াতাড়ি তাহার হাত দুইটি ধরিয়া বলিল, দিদি তাই যদি একটা ক'রে দাও ত চিরজীবন আমি তোমার কেনা দাসী হয়ে থাকবো। আমার কিছু নেই! গায়ের যা গয়না ছিল আজ দু'বছর হলো একখানা একখানা ক'রে বিক্রী ক'রে কলকাতার খরচ চালিয়েছি, যদি একটা চাকরি হয় এই ভরসায়, কিন্তু ভগবান তবু মুখ তুলে চাননি – পাঁচ ছ'মাস হলো লোকের কাছে ধার-দেনা ক'রে কোনদিন একবেলা খেয়ে কোনদিন বা না খেয়ে দিন কাটছে!

মলিনা যাহাই ভাবুক, সতীশকে বলিয়া পরদিন হইতেই সে নলিনীর স্বামীর একটা চাকরি করিয়া দিল।

তখন নলিনীর মুখে আর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার ভাষা জোগাইল না। সে মলিনার হাত দুইটি ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

নলিনীর আর কেহ ছিল না বলিয়া মলিনার কাছে তাহাকে রাখিয়া তাহার স্বামী চাকরি করিতে গেল বিহারের কোন্ জঙ্গলে।

বিদায়কালে নলিনীর মুখ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইলেও সে কিন্তু মুখে হাসি টানিয়া আনিয়া স্বামীকে বিদায় দিল। উপরন্তু তাহার পর হইতে কোনদিন সে মলিনার সামনে কাঁদিত না, এমন কি স্বামীর জন্য যে তাহার মন কেমন করিতেছে একথাও প্রকাশ করিত না। কারণ তাহার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল যে তাহা হইলে মলিনা ভীষণ রাগ করিবে। চাকরি দিবার পূর্বে বারবার মলিনা তাহাকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিল।

মলিনা নীচের একখানি ঘরে নলিনীকে থাকিতে দিল বিনাভাড়ায়। আপন বলিতে তাহার আর কেহ কোথাও ছিল না বলিয়া তাহার কাছে সেই স্থানটুকু নলিনী ভিক্ষা করিয়া লইয়াছিল। মলিনা শুধু স্থানই দেয় নাই, দিনের মধ্যে তিন-চার বার আসিয়া তাহার খোঁজ লইয়া যাইত।

এমনি করিয়া ছয়মাস কাটিয়া গেল। নলিনী সপ্তাহে একখানি করিয়া চিঠি স্বামীর নিকট হইতে পাইত। মাস-ছয়েক পরে মাত্র দুইদিনের জন্য বাড়ী আসিবার ছুটি পাইল নলিনীর স্বামী। স্বামীর সঙ্গে বিবাহের পর হইতে নলিনীর আর কখনো ছাড়াছাড়ি হয় নাই। তাই এই সুদীর্ঘ বিরহের পর সেই মিলনের দিনটির প্রতীক্ষায় তাহার সমস্ত মন উন্মুখ হইয়া থাকিত।

যতই তাহাদের মিলনের দিন আসন্ন হইয়া আসিতে লাগিল ততই যেন নলিনীর

উদ্বেগ ও আনন্দ বাড়িয়া চলিল। মলিনার কাছে নলিনী তাহার সেই মনোভাব চাপিতে শত চেষ্টা করিলেও সে কিন্তু ইহা লক্ষ্য করিয়া মনে মনে ঈর্ষিত হইয়া উঠিল।

ইহার অল্প কয়েক দিন পরে হঠাৎ নলিনী তাহার স্বামীর নিকট হইতে একখানি চিঠি পাইল। তাহাতে সে লিখিয়াছিল, তাহার আসা হইবে না, কোন জরুরী কার্যোপলক্ষে তিন মাসের জন্য আরো কোন স্নদূর জঙ্গলে নাকি তাহাকে যাইতে হইবে। মনিবের নিকট হইতে হুকুম আসিয়াছে।

ইহা শুনিয়া নলিনী আর স্থির থাকিতে পারিল না। একেবারে ছেলেমানুষের মত কাঁদিয়া ফেলিল। মলিনা তাহার ঘরে আসিলে কান্না চাপা দূরে থাক সে যেন আরো উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিল এবং সেই চিঠিখানি তাহার হাতে দিল।

চিঠিখানিতে একবার মাত্র চোখ বুলাইয়া মলিনা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল, তারপর হো হো করিয়া হাসিতে লাগিল। অদ্ভুত সে হাসি! নলিনী যত কাঁদে মলিনাও তত হাসিয়া লুটোপুটি খায়।

সে হাসি দেখিয়া নলিনীর মনে বড় ব্যথা লাগিল।

মলিনাই যে সতীশকে দিয়া চিঠি লিখাইয়া নলিনীর স্বামীর ছুটি বন্ধ করাইয়াছে, ইহা যে তাহারই চক্রান্ত তাহা সে জানিত না। তাই সে প্রশ্ন করিল, দিদি তুমি এত হাসছো কেন?

মলিনা সে কথার কোন উত্তর না দিয়া বলিল, তুই তা'হলে সত্যি-সত্যি কাঁদছিস?

নলিনী বলিল, কি করবো বল দিদি, মনটা বড্ডই কেমন করছে!

মলিনা হাসিতে হাসিতে তখন তাহার ঘরে চলিয়া গেল এবং সেখানে তাহার স্বামীকে দেখিতে পাইয়া আরো জোরে হাসিয়া তাহার কোলের উপর ছেলেমানুষের মত লুটাইয়া পড়িল।

মলিনার এই ভাবান্তর দেখিয়া সতীশ প্রশ্ন করিল, ব্যাপার কি, তুমি এত হাসছো কেন?

মলিনা হাসির বেগ দমন করিতে করিতে স্বামীর বুকের ওপর এলাইয়া পড়িয়া শুধু বলিল, নলিনী কাঁদছে!

একজনের দুঃখে আর একজনের এত উল্লাসের কি কারণ থাকিতে পারে তাহা বুঝিতে না পারিয়া বিস্ময়-বিহ্বল দৃষ্টিতে সতীশ মলিনার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, কিন্তু তাতে তোমার হাসি পাচ্ছে কেন?

মলিনা তাহার উত্তরে কিছু না বলিয়া শুধু হাসিয়া গড়াগড়ি খাইতে লাগিল!

জটিলতা

পটলার যখন সাত বছর বয়স তখন আর কোথাও চাকরির যোগাড় করিতে না পারিয়া অনেক ঘুরিয়া ঘুরিয়া হয়রান হইয়া শেষে এক স্যাকরার দোকানে ঢুকিল। খাওয়া-পরা আর এক পয়সা জলপানি, কাজ শিখিলে ভবিষ্যতে উন্নতির সুবর্ণময় সম্ভাবনা।

নীলমণি দত্তের লেন হইতে সরু যে গলিটি বাহির হইয়াছে, তাহা ধরিয়া বরাবর সোজা গিয়া, ডান হাতি বাঁকিয়া, বাম দিকের গলি ছাড়িয়া, উত্তরমুখে চলিতে চলিতে পথটি যেখানে সহসা দক্ষিণে মোড় ঘুরিয়া শেষ হইয়া গিয়াছে—সামনে একটি গ্যাসের আলো, তাহার পাশে ময়লা-ফেলার দুর্গন্ধময় টব, ভন্‌ভন্‌ করিয়া মাছি উড়িতেছে; সেখানে রক্তমাখা ন্যাকড়া, ঘায়ের তুলা, মাছের আঁশ-কাঁটা, আমের খোলা ও আঁটি ছড়ানো, আধখানা ছেঁড়া কাপড় টবের গা হইতে ঝুলিয়া কাদায় লুটাইতেছে; একটা পুরানো বাড়ীর ছাদের উপর হইতে দিনরাত ট্যাঙ্কের জল ফোঁটা ফোঁটা করিয়া পড়িয়া ওইখানে জমে। সবটা মিলিয়া ওখানটায় যেন সব সময় ছোটখাটো এক নরকের সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে। ঐ টবটারই সামনা-সামনি একটা খোলার ঘরে এই স্যাকরার দোকান।

পটলা ঘর ঝাঁট দেয়, হাপর টানে, উনুনে কাঠ-কয়লা দেয়, বড় রেড়ীর তেলের পিদিমে তেল ঢালে, তুলা দিয়া মোটা সল্‌তে পাকায়, বাবুর জন্য তামাক সাজে ও বাবুর মেয়েকে কোলে লইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। তিন কুলে তার কেহ নাই। তাই সেই দোকান ঘরেই রাত্রে শুইয়া থাকে।

এইভাবে তাহার দশ বৎসর কাটিয়া গেল।

পৃথিবীর নানা স্থানে ইতিমধ্যে কত পরিবর্তন ঘটিল। পটলার বাবুদের খোলার ঘর ছিল, ক্রমে তাহা একতলা হইয়া এখন দোতলায় দাঁড়াইয়াছে; কিন্তু পটলার উন্নতি বলিতে হইয়াছে মাত্র এক পয়সার জলপানি ও আর একখানা কাপড়—বৎসরে দুইখানা কাপড় ছিল তাহার স্থলে তিনখানা এবং রোজ এক পয়সা জলপানির পরিবর্তে দুই পয়সা। যদিও সে এখন সোনা গলাইতে পারে, অলঙ্কার তৈরী করিতে পারে তবু ইহাতেই সে খুশী; অন্য কোন দাবি বা অন্য কোন স্বাচ্ছন্দ্যের প্রয়োজন তাহার নিজের ত ছিলই না উপরন্তু তাহার নিকট চাহিবার মতও বুঝি এ সংসারে আর কোন আপনজন জীবিত ছিল না। মনিবের সংসারকে নিজের মনে করিয়া

পরম শান্তিতে তাই তাহার দিন কাটিতেছিল।

পল্লীগ্রামের ছেলে—কালো বলিষ্ঠ চেহারা, কোন কাজ বলিলে 'না' বলিতে জানে না। দিনরাত ভূতের মত খাটে, মনিবের মুখের কথা তাহার কাছে বেদবাক্য!

দোকানের মালিক শ্রীরাধাকান্ত কর্মকার, ঢাকার একজন নামকরা কারিগর, সূক্ষ্ম কারুকার্যের ওস্তাদ। বয়স তাহার পঞ্চাশ পার হইয়া ষাটের কোঠায় গিয়া প্রায় ঠেকিয়াছে কিন্তু এখনো চোখে চশমা না লাগাইয়া কাজ করিতে পারে। সত্যাশ্রয়ী ও অমায়িক প্রকৃতির লোক বলিয়া সে খরিদ্দারের ভারি প্রিয়। তাই এই প্রতিযোগিতার বাজারেও লোকে তাহাকে ডাকিয়া কাজ দেয়।

ছেলেকে পাঠাইয়া রাধাকান্ত কাজ লইয়া আসে, নিজে আজকাল আর বড় বাহিরে যায় না। এমন ছিল না, বরাবর সে নিজেই খরিদ্দার-বাড়ীতে যাইত, কিন্তু এখন তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রুদ্রকান্ত তাহাকে কোথাও যাইতে দেয় না। তাহার বিশ্বাস, তাহার বাবা লোকজনের সঙ্গে ভাল করিয়া কথা কহিতে পারে না, তাহার হাবভাব চালচলন সমস্ত সেকেলে ধরনের—আধুনিক শিক্ষিত সমাজে একেবারে অচল।

রুদ্রকান্ত একটু রাশভারী প্রকৃতির লোক, দোকানের সমস্ত কর্মচারী তাহাকে ভয় করিয়া চলে। কঠিন তাহার শাসন। কারো কাজে এতটুকু ত্রুটি বা অবহেলা সে সহ্য করিতে পারে না—গালাগালি দিয়া, মাহিনা কাটিয়া, কটু কথা কহিয়া তাহাদের শাস্তি দেয়। বয়স অল্প হইলেও দোকানের হিসাব-নিকাশ হইতে শুরু করিয়া প্রতিটি কাজ তাহার নখদর্পণে—সে বাজার হইতে সোনা কেনে, খরিদ্দারের বাড়ী ঘুরিয়া ঘুরিয়া কাজ লইয়া আসে, আবার কারিগরদের বুঝাইয়া দেয় প্রতিটি কাজ।

রাধাকান্ত পুত্রের কাজের উপর কোন কথা বলে না, সে যাহা করে তাহাই মানিয়া লয়। কোন বিশেষ কাজ, বেশী মজুরী পাইবার সম্ভাবনা থাকিলে তবে নিজে হাতে করে, নচেৎ বাড়ীর মধ্যেই বেশী সময় কাটায়।

পূজার সময় কাজ আসে খুব বেশী। রাত জাগিয়া, আলাদা কারিগর লাগাইয়া বাপ-বেটায় সারাদিন খাটিয়াও সব শেষ করিয়া উঠিতে পারে না।

তখন রুদ্রকান্ত বাহিরে অনবরত ছুটাছুটি করে, আর তাহার বাবা ভিতরের কাজ-কর্ম দেখাশুনা করে। আহার-নিদ্রা তাহারা ভুলিয়া যায়—শুধু কাজ, কাজ আর কাজ।

তিন দিন ধরিয়া দিনরাত নিজে হাতে কাজ করিয়া রাধাকান্ত একটি হার তৈয়ারী করিল। বড় লোকের বাড়ীর অর্ডার, জড়োয়া গহনা, বহু মণিমুক্তা ও মূল্যবান পাথরের সূক্ষ্ম কারুকার্য তাহাতে। এখানের মুক্তা ওখানে বসাইয়া, ওখানের চুণী

এখানে সরাইয়া, নিজের মনোমত করিয়া রাধাকান্ত সেই হারটি সাজাইল।

আজকালকার বাবুদের অল্প সোনার কাজে, নিজের সূক্ষ্ম কারুকার্য দেখাইবার সে সুযোগ পায় না। কেহ তিন আনার সোনায় ছ'গাছা চুড়ির অর্ডার দেয়, ভিতরে তামা, শুধু উপরে সোনার স্বল্প চাকচিক্য; কেহ বা দেড় ভরিতে গলার হার তৈরী করায়। শিক্ষিত সমাজের এই সূক্ষ্ম রুচিবোধ ঠিক তার রুচিতে মেলে না তাই এই ভারী অলঙ্কারটি হাতে পাইয়া সে পছন্দমত করিয়া গড়িল এবং বহুদিন পরে নিজের কারিগরির পূর্ণ সুযোগ লাভ করিয়া একটু আত্মপ্রসাদও বোধ করিল।

এই হারটি লইয়া রুদ্রকান্তই খরিদ্দারকে দিতে যাইবে, যেমন সব ক্ষেত্রে হয়, এবারও তেমনি স্থির ছিল। কিন্তু কাজের অত্যন্ত চাপ পড়ায় রুদ্রকান্ত সেদিন যাইতে পারিল না, তাহার বাবাকে সেখানে পাঠাইল।

অনেকটা পথ, তাই রাধাকান্তর একলা যাইতে কেমন মনে হইল, সঙ্গে পটলাকে লইল।

শরতকাল—প্রভাতের সোনালী আলোয় চারিদিক ঝলমল করিতেছে। কত গলি ছাড়িয়া, কত ট্রাম-লাইন পার হইয়া, তাহারা দু'জনে আসিয়া শেষে হাজির হইল একটা বিরাট বাড়ীর দরজায়। কড়া নাড়িতেই দরজা খুলিয়া গেল এবং তাহারা যাইয়া ভিতরে বসিল।

প্রকাণ্ড ঘর, দেওয়ালে বড় বড় 'অয়েল পেন্টিং' টাঙানো, মার্বেলের মেঝের উপর সবুজ কাপড়ে ঢাকা কত সোফা কাউচ্, দরজায় দরজায় নীল রংয়ের পর্দা ঝুলিতেছে, মাথার উপর প্রকাণ্ড কাঁচের ঝাড় মৃদু হাওয়ায় দুলিয়া দুলিয়া ঐশ্বর্যের সাক্ষ্য দিতেছে। পটলা অবাক হইয়া চারিদিকে চাহিতে লাগিল। সমস্ত জিনিসই তাহার কাছে অদ্ভুত ও বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হইল, ইতিপূর্বে সে কখনো এ রকম আধুনিক কায়দায় সাজানো বড় লোকের বাড়ীতে ঢোকে নাই।

গিন্নীমা আসিয়া রাধাকান্তর নিকট হইতে হারটা লইয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে লাগিলেন এবং এ পাথরটা এখানে না দিয়া ওখানে দিলে ভাল হইত, টিপকলটা এরকম না করিয়া ওরকম করিলে আলগাভাবে পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা কম থাকিত এবং এখানকার সোনাটা এত ম্লান দেখাইতেছে কেন ইত্যাদি নানা প্রকার বাজে প্রশ্ন তুলিয়া গৃহিণীপনার মর্যাদা রক্ষা করিতে লাগিলেন।

রাধাকান্ত ঈষৎ হাসিয়া এবং কোন প্রতিবাদ না করিয়া তাঁহারই কথায় সায় দিয়া যাইতে লাগিল। এমন সময় তিনি অতি মিহি সুরে ডাকিলেন, ওরে ডালু, তোর হার এসেছে, দেখবি আয়।

ডালু ওরফে ডালিয়া ঘরে আসিয়া ঢুকিল। নীল পর্দাকে পিছনে রাখিয়া সে দাঁড়াইয়াছিল। পটলার মনে হইল যেন নীলসরোবরে অকস্মাৎ একটি পদ্ম ফুটিয়া উঠিয়াছে। যৌবনের পরিপূর্ণ রূপ তাহার দেহের কানায় কানায় উচ্ছল হইয়া উঠিতেছে। তাহার সদ্য বিকশিত ডালিয়া ফুলের মত মাতাল-করা চাহনী, পিঠের উপর এলানো ভিজা চুলের রাশ, অপ্রশস্ত ললাটে ছোট একটি সিন্দূরের টিপ, ফুলের পাপড়ির মত দুইখানি রক্তিম ওষ্ঠ, রাজহংসীর মত উন্নত অথচ শুভ্র ও নিটোল গ্রীবা, —তাহার নীচে হালফ্যাসানের সেমিজ,—বুক ও পিঠের অর্ধেকেরও বেশী উন্মুক্ত।

তাহার বুঝি লজ্জা নাই কিংবা লজ্জা করিবার মত পাত্র তাহার কাছে ইহারা নহে! ইহারাও যে মানুষ, ইহাদের দেহেও যে রক্তমাংস আছে তাহা চিন্তা করিতে বোধকরি ডালিয়ার মত ধনী নারীর রুচিতে বাধে—তাই অসঙ্কোচে তাহাদের সামনে সে বুকের আঁচল সরাইয়া গলায় হার পরিতে লাগিল।

পটলা তরুণ যুবক হইলেও নারীর এত রূপ, এত যৌবন এর আগে সে কখনো দেখে নাই। তাহার দেহের প্রতি শিরায় উপশিরায় রক্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল, তাহার মুখ চোখ দিয়া একটা আগুনের শিখা ছুটিতে লাগিল। সে যেন সকল ইন্দ্রিয় দিয়া শুষিয়া লইতে লাগিল ডালিয়ার দেহের সমস্ত রূপরাশি।

রাধাকান্তের যদিও বয়স হইয়াছে ষাটের কাছাকাছি এবং কেশের প্রায় অর্ধেক সাদা হইয়া গিয়াছে তথাপি তাহার মনের মধ্যেও কেমন যেন সব গোলমাল হইয়া যাইতে লাগিল। সে ডালিয়ার মুখের দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল, তাহাদের পরিবারের যে-যেখানে আছে সকলেরই কথা—কেহ ত এমন সুন্দর নহে! সবাই কুৎসিত, সবাই কালো, অত্যন্ত কালো, মুখে চোখে তাহাদের কোন শ্রী, কোন সম্পদ নাই; তাছাড়া যৌবনের এমন সমারোহ, এমন সুমধুর প্রকাশও সে ত আর কখনো কাহারো দেহে দেখে নাই। সর্বপ্রথম মনে পড়িল তাহার স্ত্রীর কথা; তারপর বাড়ীর অন্যান্য বৌ-ঝিদের কথা! তাহাদের প্রতি ঘৃণায় বিরক্তিতে তাহার মন যেন মুহূর্তে কলুষিত হইয়া উঠিল। সে আবার চোখ তুলিয়া ডালিয়ার দিকে চাহিল।

নিটোল রক্তাভ বক্ষের সমস্ত নগ্ন অংশটুকু জুড়িয়া সেই হারটা ঝলমল করিতেছিল। কে বেশী সুন্দর? অসংখ্য হীরামুক্তা খচিত হারটা, না ডালিয়ার সুন্দর মুখখানা? রাধাকান্ত ঠিক করিতে পারিতেছিল না, তাই সেই দিকে চাহিয়া কেবলই তাহার মনে হইতেছিল এ হার তাহার গলায় ছাড়া যেন অন্য কোথাও মানায় না; হারের জীবন ধন্য, আর ধন্য তাহার মত শিল্পী! বাস্তবিক সেইক্ষণে রাধাকান্তের মনে হইল তাহার জীবনও এতদিনে সার্থক হইল।

এমন সময় হাত দু'টি উঁচু করিয়া পিছনের দিকে তুলিয়া ডালিয়া আসিয়া দাঁড়াইল রাধাকান্তর সামনে এবং ঈষৎ অভিযোগের সুরে বলিল, দেখুন ত কর্মকার মশায়, টিপকলটা কি রকম শক্ত, কিছুতেই দেওয়া যাচ্ছে না।

রাধাকান্তর যেন চমক ভাঙ্গিয়া গেল ; সে চেয়ারে বসিয়াছিল, মন্ত্রাবিষ্টের মত ধীরে ধীরে উঠিয়া ডালিয়ার পশ্চাতে গিয়া দাঁড়াইল এবং তাহার হাত হইতে হারের প্রান্তটুকু লইয়া আঁটিতে লাগিল। খোলা পিঠের সুগৌর মসৃণ ত্বকের উপর দিয়া যে সরু রোমশোভিত শ্যামল রেখাটি ঘাড় হইতে নামিয়া সোজা শেমিজের মধ্যে চলিয়া গিয়াছে তাহার দিকে চাহিয়া পটলা হাঁ করিয়া কি যেন গিলিতেছিল। মনিবের পাশে গিয়া সেও দাঁড়াইয়াছিল নিঃশব্দে।

ডালিয়া হাসিয়া বলিল, হয়েছে ? আপনি নিজে তৈরী করেছেন, তবুও ফিট্ করতে এত সময় লাগছে কেন ?

একটু অপ্রস্তুত হইয়া রাধাকান্ত বলিল, না হয়ে গেছে, নতুন কিনা, একটু 'টাইট হচ্ছে সেইজন্যে। এই বলিয়া সে আবার নিজের জায়গায় আসিয়া বসিল।

হাসিতে হাসিতে চঞ্চল চরণে ডালিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

পটলা একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল সেই অপস্রিয়মান মূর্তির দিকে। তাহার মনে হইতে লাগিল, তখনো সে হাসির মৃদু গুঞ্জরণ যেন ঘরের কোণে কোণে ভাসিয়া বেড়াইতেছে।

নিজের ঘরে গিয়া ডালিয়া বিরাট আয়নাটার সামনে দাঁড়াইল এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ-ভাবে দেখিতে লাগিল সেই হারটা গলায় কেমন মানাইয়াছে।

কয়েক মিনিট পরে আবার সে হঠাৎ ছুটিয়া আসিয়া বলিল, না কর্মকার মশায়, এ লাল পাথর দেওয়া ফুলটা এখানে ভাল মানাচ্ছে না, এটাকে এখান থেকে তুলে দেবেন, আর আরো ভাল পালিশ ক'রে কাল নিয়ে আসবেন—নিন, এখন খুলুন। এই বলিয়া আবার তাহার দিকে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইল।

রাধাকান্ত আবারও উঠিয়া হারটি তাহার গলা হইতে খুলিয়া লইল।

তারপর যথারীতি নমস্কার সারিয়া দু'জনে ঘর হইতে বাহির হইয়া রাস্তায় পড়িল।

দুইজনেই নিস্তব্ধ! কাহারো মুখে কোন কথা নাই। পটলা আগে আগে চলিয়াছে আর তাহার পশ্চাতে রাধাকান্ত। একজন তরুণ যুবক—প্রভুভক্ত ও বিশ্বাসী। আর একজন প্রায় বৃদ্ধ—সত্যাশ্রয়ী ও ধর্মপ্রাণ।

কিছুদূর যাইয়া সহসা রাধাকান্ত পটলাকে ডাকিল।

পটলা হঠাৎ যেন চমকাইয়া উঠিল। রাধাকান্ত বাক্সটা তাহার হাতে দিয়া বলিল, তুই ততক্ষণ এগিয়ে যা, আমি আর একটা খদ্দেরের বাড়ী হয়ে যাচ্ছি—খুব সাবধানে কিন্তু বাক্সটা রাখিস!

'যে আজ্ঞে' বলিয়া পট্‌লা মনিবের এই সুবুদ্ধির জন্য মনে মনে ধন্যবাদ দিতে দিতে সেই বাক্সটা বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিল এবং জামার বোতাম লাগাইয়া দিয়া চলিতে লাগিল। তাহার বুকের মধ্যে তখন যেন আনন্দের তুফান বহিতেছিল।

কিছুদূর যাইয়া পটলা একটা নির্জন পার্কের মধ্যে ঢুকিল। তাহার ইচ্ছা, একবার সেই হারটি হাতে করিয়া স্পর্শ করিবে। একটা গাছের ছায়ায় বসিয়া সযত্নে সে বাক্সটা বাহির করিল কিন্তু বাক্সটা খুলিতেই সে চমকিয়া উঠিল। একি! হার কোথায় গেল! আশে পাশে, ঘাসের মধ্যে, বেঞ্চের উপরে, জামার ভিতরে, কাপড়ের ভাঁজে ভাঁজে তন্ন তন্ন করিয়া সে খুঁজিতে লাগিল। কিন্তু হায়, সে আর তার কোন সন্ধানই পাইল না। তাহার চোখের সামনে সমস্ত পৃথিবী যেন অন্ধকার হইয়া গেল। কি করিবে? কোথায় যাইলে খুঁজিয়া পাইবে? কিছুই সে ভাবিয়া পাইল না। শুধু বজ্রাহতের মত চুপ করিয়া সে সেখানে বসিয়া রহিল।

এদিকে রাধাকান্ত বাড়ী ফিরিয়া গিয়া দেখিল তখনো পটলা আসে নাই। ক্রমশঃ বেলা বাড়িতে লাগিল, তবুও পটলার কোন খোঁজ নাই। সকলেই অধৈর্য হইয়া পড়িল। বিশেষ করিয়া রুদ্রকান্ত, সে রাগে গরগর করিতে করিতে বলিল, শালা পালিয়েছে। তারপর আর একমুহূর্তও দেরি না করিয়া পুলিশে খবর দিল।

বিকাল নাগাৎ পটলা পুলিশের হাতে ধরা পড়িল। তখনো তাহার কাছে সেই বাক্সটা রহিয়াছে। তাহারা আর কোন কথা না বলিয়া তাহাকে হাজতে বন্ধ করিয়া রাখিল।

তিনদিন পরে কোর্টে তাহার বিচার হইল। রাধাকান্ত সাক্ষী দিল এবং পটলা এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইল।

পটলা কিন্তু কোন কথা বলিল না, চুপ করিয়া সেই শাস্তি মাথা পাতিয়া লইল। শুধু তাহার হাত দু'টি শৃঙ্খলাবদ্ধ করিবার সময় সে প্রার্থনা করিল সেই বাক্সটি। তাহারা বাক্সটি তাহাকে ফিরাইয়া দিল। পটলা বুকের মধ্যে সেটিকে রাখিয়া জামার বোতাম লাগাইতে লাগাইতে পুলিশের সঙ্গে যাইয়া কালো রঙের গাড়ীতে উঠিল।

শূন্য বাক্সটির মধ্যে কি আছে এবং তাহা লইয়া পটলার কি হইবে কেহই তাহা বুঝিতে পারিল না। তাই তাহার প্রার্থনা শুনিয়া সেদিন সবাই হাসিল। হাসিলেন না বোধ করি একজন, যিনি মানুষের দৃষ্টির অন্তরালে থাকিয়াও মানুষের অন্তরের কথা

বুঝিতে পারেন ! যাঁহার বাঁশির সুরে গাছে ফুল ফোটে, পুরুষের দেহে আসে যৌবন !

ইহার দুই বৎসর পরে, একদিন হঠাৎ হৃদ্‌যন্ত্র বিকল হইয়া রাধাকান্ত ইহলোক ত্যাগ করিল। রুদ্রকান্ত তাড়াতাড়ি বাবার সিন্দুকের চাবি লইয়া নিজের চাবির সঙ্গে দড়ি দিয়া বাঁধিল।

শ্রাদ্ধ-শান্তির পর আরো কিছুদিন কাটিয়া গেলে, একদিন মধ্যাহ্নে চুপি চুপি রুদ্রকান্ত বাবার সিন্দুকটি খুলিল। কতকগুলি অতি পুরাতন পঞ্জিকা ও সাবেকি আমলের খাতাপত্র এবং তাহার নীচে একটি পুঁটুলি করা খানকয়েক গিনি পাইল। অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া সে খাতাপত্রগুলি বাহিরে ফেলিয়া দিল এবং শেষ পর্যন্ত কেন যে তাহার বাবা তাহাকে বিশ্বাস করিয়া চাবিটি হাতে দিত না, তাহারও কোন কারণ খুঁজিয়া পাইল না।

সে সিন্দুকটা পরিষ্কার করিতে লাগিল এবং একে একে সমস্ত আবর্জনা বাহির করিয়া, যখন নীচে-পাতা লাল শালুর টুকরাটাকে টানিয়া তুলিল, তখন তাহার ভিতর হইতে একগাছি সোনার হার মাটিতে গড়াইয়া পড়িল।

রুদ্রকান্ত তাড়াতাড়ি সেই হারটি তুলিয়া লইয়া দেখিল, সেটি নতুন, তখনো পালিশ চক্ চক্ করিতেছে এবং জড়োয়ার দীপ্তি কোথাও এতটুকু ম্লান হয় নাই। তবে অন্তত একবারও যে উহা মনুষ্য দেহের সংস্পর্শে আসিয়াছে তাহার চিহ্নস্বরূপ শুধু দুই গাছি দীর্ঘ ও কুঞ্চিত কেশ তখনো আটকাইয়া ছিল একখানা পাথরের বুকে। রুদ্রকান্ত ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতে লাগিল এবং মনে করিতে চেষ্টা করিল, সেই হারটা কার এবং কোথা হইতে সেখানে আসিল !

অকস্মাৎ তাহার মনে পড়িয়া গেল এ সেই হার, যাহার জন্য পটলা জেলে গিয়াছে এবং তাহাকে আবার ক্ষতিপূরণ দিতে হইয়াছে। কিন্তু কোথা হইতে, কেমন করিয়া ইহা তাহার সত্যাশ্রয়ী পিতার সিন্দুকের মধ্যে আসিয়া ঢুকিল তাহা সে কিছুতেই ভাবিয়া পাইল না এবং প্রশ্নটা চিরকাল অজ্ঞাত রহস্যে ঢাকা রহিয়া গেল।

"কস্তুরীমৃগসম"

নীলিমা ঘুমোচ্ছিল অসাড়ে। সমস্ত দিনের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর এইটুকু সময় তার ছুটি! রাত্রের এই ক'ঘণ্টা! বাড়ীর অন্য সকলে ওঠবার আগে তাকে জাগতে হয়, আবার শুতে যেতে হয় সকলের শেষে! এ বাড়ীর এই নিয়ম! শ্বশুর, শাশুড়ী, স্বামী, দেওর, ননদ থেকে আরম্ভ করে সংসারের ছোটবড় সকলের সে যেন দাসী! যার যতটুকু সেবা প্রাপ্য, ঘড়ির কাঁটার মত মুখে মুখে যোগান দিয়ে তবে তার ছুটি! শাশুড়ীর সুতীক্ষ্ণ রসনা ও সজাগ দৃষ্টি সর্বদা প্রহরীর মত ঘোরে নীলিমার পেছনে পেছনে! কোথাও এতটুকু ত্রুটি বা ব্যতিক্রম হবার উপায় নেই! তাই বিছানায় গা ঠেকবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমে ভেঙ্গে আসে তার সর্বশরীর। একে অল্পবয়সী মেয়েদের ঘুম গাঢ়, তার ওপর এই হাড়ভাঙ্গা খাটুনি! নীলিমা যেন মুহূর্তে এলিয়ে পড়ে—ঘুমে শিথিল হয়ে আসে তার প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ! ফুলের কুঁড়ি যেমন রাত্রের নিস্তব্ধতায় একটি একটি ক'রে তার দল বিকশিত করে, তেমনি ভাবে শয্যার ওপর নিজের দেহকে ছড়িয়ে বিছিয়ে মেলিয়ে দিয়ে নীলিমা ঘুমোয়! ক্লান্তির সঙ্গে একটা মোহনীয় কোমলতা ফুটে ওঠে তার মুখে চোখে সর্বাঙ্গে!

খাটের অপর প্রান্তে তখন সতীশের নাক ডাকে! গালবালিশ, কানবালিশ, পাশবালিশ ও মাথার বালিশের পাহাড়ের মধ্যে সে ঘুমোয়। তার বিরাট দেহের খাঁজে খাঁজে যেন বালিশের বেড়া দেওয়া! নিদ্রার আরামে যাতে কোনরকমে এতটুকু ব্যাঘাত না ঘটে, তারই যেন ষোলআনা আয়োজন!

এ ছাড়া আর একটা জিনিস সতীশ ভালবাসে! সে খাওয়া। জগতের সমস্ত রকমের আহার্যের প্রতি তার সমান আকর্ষণ! সেখানে ভাল-মন্দ ছোট-বড়র কোন প্রশ্ন ওঠে না—সে যেন সর্বভুক। ফলে অতি-ভোজনটাও যেমন তার অভ্যাস, অতি-নিদ্রাটাও তেমনি সঙ্গে সঙ্গে অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে!

নীলিমা প্রথম প্রথম স্বামীকে একটু কম খাবার উপদেশ দেবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তাতে বিশেষ ফল হয়নি, বরং উল্টোই হয়েছে। সতীশ তার উত্তরে স্ত্রীকে বলেছে, আমার বাপ মা চিরকাল আমায় ভালমন্দ জিনিস খাইয়ে এসেছেন—ওটা আমার অভ্যাস। তারপর একটু থেমে ক্রুদ্ধস্বরে আবার বলেছে, যাদের সামর্থ্য নেই খাবার, তারাই কম খায়! নীলিমা স্বামীর মুখ থেকে এই রকম উত্তর শুনে ব্যথিত

হয়েছে বার বার। তাই অতিভোজন সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া ইদানীং বন্ধ করে দিয়েছে। সতীশ ইচ্ছামত যেমন ভোজন করে তেমনি ইচ্ছামত নিদ্রা যায়—তা নিয়ে নীলিমা একেবারেই মাথা ঘামায় না।

চার বছর নীলিমার বিয়ে হয়েছে—এই চার বছর তাদের এমনি ভাবেই কেটেছে। নব-বিবাহিত দম্পতিদের যেসব প্রেমের কাহিনী সে সখীদের মুখে শুনেছিল তার জীবনে কোনদিন তা সফল হয়নি! রাতের পর রাত স্বামী তার সে প্রতীক্ষা ব্যর্থ করে দিয়েছে। নীলিমা দেখে শুধু খাওয়া আর ঘুম ছাড়া তার স্বামী অর্থাৎ সতীশ অন্য কিছু জানে না। সে তাকে বিয়ে করে এনেছে শুধু বিনা মাইনের রাঁধুনী ও ঝিয়ের কাজের জন্যে! তাই তাদের প্রেমালাপ রান্নার দোষত্রুটিতে পর্যবসিত হয়। মোটা থলথলে চেহারাটাকে—কেবল খেয়ে সুস্থ রাখা ছাড়া আর কিছু সতীশ ভাবতে পারে না। ক্ষিদে যেন তার সর্বদা পেয়েই আছে! কারুর মুখে ক্ষিদে নেই শুনলে সে ভারি চটে যায়। নীলিমাকে বার বার শুধু এই কথাটাই সতীশ বলে,—'শুধু খেয়ে যাও, ক্ষিদের জন্যে ভেবো না!'

নীলিমা এক-একদিন রহস্য করবার চেষ্টা করে। বলে, দোহাই তোমার! তুমি একদিন অন্তত খাওয়া ছাড়া অন্য কথা বলো দেখি!

রহস্য বা রসিকতা সতীশের দেহের রক্তে কোথাও একবিন্দু ছিল না। তাই ও-কথা শুনে সে গম্ভীর হয়ে যেত এবং আরো গম্ভীর ভাবে উত্তর দিত, খাওয়ার জন্যেই তো সব—পেটটা আছে বলেই তো মানুষের এত কষ্ট, এত পরিশ্রম। তা না হলে কে কার 'পরোয়া' করতো! জগতের সমস্ত লোক যে সকাল থেকে উঠে সারাদিন ভূতের মত খেটে মরছে—সে ত এই পেটের জন্যে!

এর আর কোন জবাব না দিয়ে নীলিমা চুপ করে যেতো! প্রতি রাত্রেই তাই ঘরে ঢুকে সতীশের এই অতিভোজনজনিত নিদ্রার স-রব পরিচয় পেয়ে মনে মনে ক্ষুব্ধ হতো, কিন্তু কারো কাছে তার জন্যে কোন অনুযোগ করতো না।

এমনি ভাবেই কাটে দিনের পর দিন।

হঠাৎ সেদিন গভীর রাত্রে চোখের ওপর একটি তীব্র আলো অনুভব ক'রে নীলিমার ঘুম ভেঙে গেল। চোখ খুলতেই সে দেখে সতীশ তার মুখের দিকে পলকহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তার হাতে একটা জ্বলন্ত টর্চ লাইট!

সঙ্গে সঙ্গে নীলিমার মাথায় রাগ চড়ে গেল। সে তার হাত থেকে আলোটা কেড়ে নিতে নিতে বললে, কি হচ্ছে, ন্যাকামো!

সতীশের কণ্ঠ কেমন যেন একপ্রকার রসের আধিক্যে সিক্ত হয়ে ওঠে। একটু

ইতস্তত করতে করতে বললে, তোমায় দেখছি, নীলি।

নীলিমা বলে ওঠে, কেন, কোনদিন কি এর আগে দেখনি যে এমনি চুরি ক'রে দেখতে হবে রাতদুপুরে?

সতীশ বললে, সত্যি নীলি, এতদিন তোমায় দেখছি, কিন্তু এমন সুন্দর কোনদিন মনে হয়নি!

চুপ্ করো! মিথ্যে কথারও একটা সীমা আছে মনে রেখো।···নীলিমা যেই জোরে ধমক দিয়ে উঠলো সতীশ সঙ্গে সঙ্গে নীরব হয়ে গেল! কিন্তু আবার একটু পরে সে ভাবটা কাটিয়ে নিয়ে সে ধীরে ধীরে বললে, এই তোমার গা ছুঁয়ে বলছি, মাইরি—

নীলিমা বললে, দেখ গা ছুঁয়ে দিব্যি করে মিথ্যেকে আর সত্য প্রমাণ করার চেষ্টা করো না—অন্তত আমার কাছে। তারপর যেন এক অবরুদ্ধ জ্বালা তার কণ্ঠ দিয়ে সহসা বেরিয়ে পড়লো, এতদিন পরে আজ হঠাৎ কেন তোমার প্রেম উথলে উঠলো সত্যি ক'রে বলো বলছি, তা না হ'লে আমি অনর্থ করবো।

সত্য জিনিসটা এমন যে সেটা ঠিক সময় ঠিকভাবে উচ্চারিত হ'লে তাকে অস্বীকার করা শক্ত! তাই একটু চুপ করে থেকে সতীশ বললে, অমিয় বলছিল, তোমায় নাকি অদ্ভুত দেখতে! জগতের শিল্পীরা যে সব রমণীদের কামনা করে যুগ যুগ ধরে, তুমি নাকি তেমনি রূপবতী। তোমার মধ্যে নাকি সেই রকম সুদুর্লভ সৌন্দর্য রয়েছে! তোমার চোখ, মুখ, নাক, হাতের আঙ্গুল, তোমার দেহের গঠনভঙ্গী প্রত্যেকটি নাকি আশ্চর্য রকমের সুন্দর!

থামো! এবার নীলিমা এমন একটা ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো যে সতীশ আর কথা বলতে পারলে না—চুপ করে গেল। তারপর অনেকক্ষণ মৌন থেকে নীলিমা এক সময় প্রশ্ন করলে, তোমার বন্ধু যে আমার দৈহিক গঠনের এত প্রশংসা করলে তা সে আমায় দেখলে কি করে?

সতীশ ফিক ক'রে একটু হেসে ফেললে। তারপর বললে, না, তা আমি বলতে পারবো না কিছুতেই, সে বারণ করে দিয়েছে বার বার করে।

নীলিমা স্বামীকে ভাল করেই চেনে, তাই কথাটা বার করে নিতে তার একটুও দেরি হলো না। সতীশ বললে, তুমি যখন আজ বিকেলে পুকুর ঘাটে সাবান মাখছিলে, তখন সে তোমায় দেখেছিল পাশের বাগানটার মধ্যে থেকে। সে চাঁপা গাছের তলায় বসে তখন কবিতা লিখছিল।

কথাটা শুনেই নীলিমার মাথা যেন আগুন হয়ে উঠলো। দাঁতে দাঁত চেপে সে

বললে, ছিঃ—তোমার বন্ধু এত ছোটলোক জানলে সেদিন তার সঙ্গে আলাপ পর্যন্ত করতুম না। এইরকম লোককে তুমি নিয়ে আসো ভদ্দরলোকের অন্দরমহলে!

ছোটলোক! সতীশ বললে, চুপ চুপ—ওকথা আর মুখে উচ্চারণ করো না! জানো ও কত বড় গুণী মানী ব্যক্তি! ও কবি, ওর বই পড়ে লোক ধন্য ধন্য করে! আমি ওর পায়ের নখের যোগ্যও নই!

নীলিমা বলে উঠলো, তাতে আমার কি বয়ে গেল! যে ভদ্দরলোকের বৌঝির সম্মান রেখে চলতে জানে না—সে আবার কিসের মানী লোক! তোমার স্ত্রীকে যে এইভাবে অপমান করে, সে তোমার কাছে বড় হতে পারে, কিন্তু আমার কাছে ছোটলোকের অধম মনে রেখো।

সতীশ বললে, কিন্তু এক্ষেত্রে তার ত আমি বিশেষ কোন দোষ দেখতে পাচ্ছি না। সে বেচারী সন্ধ্যাবেলায় তার নিজের বাগানে বসেছিল। সেখান থেকে তোমাকে দেখতে পায় পুকুরের ঘাটে গা ধুতে। তারপর আমি বন্ধু। আমার কাছে যদি সে তোমার রূপের একটু প্রশংসা করেই থাকে ত অন্যায় কি করেছে আমি ত বুঝতে পারছি না।

সে তুমি বুঝতে পারবে না কোনদিন, বলে নীলিমা মাথার বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজে যেন হাঁপাতে থাকে। তারপর একটু নীরব থেকে আবার বলে, তা না হ'লে তার কথা শুনে তুমি চুরি করে এইভাবে রাত্রে আমার রূপ যাচাই করবে কেন, তোমার নিজের কি চোখ নেই?

সতীশ বললে, চোখ হয়ত আছে, কিন্তু কবির সে চোখ পাবো কোথায় নীলি—এটা কি তুমি বুঝতে পারো না? ওরা হলো কবি—রূপের জহুরী—জগতের রূপ নিয়ে ওদের কারবার—ওদের মতামতের মূল্য যে আমার নিজের মতের চেয়ে অনেক বেশি!

তোমার কাছে তার মতামতের মূল্য যতখানিই থাক, কিন্তু স্ত্রীর কাছে স্বামীর মতের মূল্য সবচেয়ে বেশী জেনো! স্ত্রীর রূপের সমালোচনা যদি পরপুরুষের মুখ থেকে শুনতে হয় তাতে স্ত্রীর রীতিমত অপমান। এটা বোধ করি তোমায় আর বেশী বুঝিয়ে বলতে হবে না?

সতীশ বলে, তুমি এতটা রাগ করবে জানলে আমি ওকথা তোমায় বলতুম না! সত্যি অমিয়কে তুমি ভুল বুঝো না—ও বড় চরিত্রবান ছেলে—ভারি সুন্দর ওর স্বভাব—দেশের সবাই ওকে মান্য করে!

নীলিমা ক্ষুব্ধস্বরে বললে, চুরি ক'রে যে পরস্ত্রীর দেহের গঠন ছাখে তাকে আর

যে-ই ভাল বলুক আমি কিন্তু কিছুতেই বলতে পারবো না! এই বলে সে সতীশের দিকে পিছন ফিরে শুলো। সতীশও আর কোন কথা না বলে চুপ করে গেল।

গভীর রাত। সব নিস্তব্ধ। শুধু ঝিঁঝিঁ পোকার একটানা আওয়াজ বাইরে থেকে এসে তাদের দুজনের মধ্যের এই নীরবতাকে যেন আরো বাড়িয়ে দিলে।

কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ এক সময় নীলিমা প্রশ্ন করলে, আর কিছু বলেনি তোমার বন্ধু?

সতীশ গম্ভীরভাবে শুধু বললে, না।

তারপর আরো কয়েকদিন কেটে গেল। অমিয়র সম্বন্ধে নীলিমা আর কোন কথাই সতীশকে যেমন জিজ্ঞাসা করে না, তেমনি সতীশও নিজে থেকে কিছু বলে না।

এর মধ্যে হঠাৎ একদিন সতীশ অমিয়কে নিমন্ত্রণ করে বসল। কথাটা এতদিনে হয়ত নীলিমা ভুলেই গেছে—এই ছিল তার ভরসা, তবু ভয়ে ভয়েই কথাটা পাড়ল। কিন্তু নীলিমা কোন আপত্তিই করলে না, বরং একটু যেন উৎসাহই দেখালে। সতীশ হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

সমস্ত দিন ধরে নীলিমা নিজে হাতে নানারকমের রান্নাবান্না করলে অমিয়র জন্যে, কিন্তু সন্ধ্যের আগে সে ঘরে এসে সতীশকে বললে, ছাখো আমি কিন্তু তোমার বন্ধুর সামনে বেরিয়ে পরিবেশন করতে পারবো না, আগেই বলে রাখছি।

কেন?

কেন আবার কি? আমার ইচ্ছে। তোমার যা বন্ধু, হয়ত আবার আমার রূপের খুঁত ধরে কত কি বলবে—আমার ভারি লজ্জা করে।

কিন্তু তুমি তাকে নেমন্তন্ন করেছ—অথচ তুমি যদি আড়ালে থাকো সেটা কি ভাল দেখাবে?

নীলিমা বললে, নেমন্তন্ন করেছি বলেই যে আমায় তার সামনে বারবার বেরিয়ে পরিবেশন করতে হবে, তার মানে কি?

সতীশ বললে, যা তুমি ভালো বোঝো তাই কোরো।

নীলিমা আবার নিজেই যেন কৈফিয়তের স্বরে বললে, পরিবেশন করতে গিয়ে গায়ের মাথার কাপড়চোপড় কখন কোথায় সরে যাবে—আমার যেন ভারি লজ্জা করে!

খেতে বসে কিন্তু সতীশ অবাক হয়ে গেল। নীলিমা রঙিন শাড়ী পরে চুনীর ফুল কানে ঝুলিয়ে—বারবার নিজে এসে তাদের পরিবেশন করতে লাগল। সত্যি এমন পরিপাটি করে সাজতে সতীশ বহুদিন নীলিমাকে দেখেনি! তার বেশ ভালই লাগল।

খাওয়াদাওয়ার পর অমিয়কে পৌঁছে দিয়ে সতীশ যখন বাড়ী ফিরল তখন রাত হয়েছে অনেক। নীলিমা বিছানায় শুয়েছিল কিন্তু ঘুমোয়নি। সতীশ তাকে দেখেই একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো। বললে, রান্নাগুলো আজ ভারি চমৎকার হয়েছে!

নীলিমা কণ্ঠে একটা ক্লান্ত স্বর টেনে এনে বললে, এটা কি তোমার নিজস্ব মত —না বন্ধু বলে দিয়েছে?

অমিয়র সম্বন্ধে কি জানি কেন সতীশের মনে বরাবরই একটু দুর্বলতা ছিল। তার কথা বলতে গিয়ে সে রীতিমত গর্ব অনুভব করতো। তাই সতীশ স্ত্রীর এই প্রশ্নের উত্তরে চট্‌ করে জবাব দিলে, সত্যি বলেছ নীলিমা,—আমি ভালমন্দর কি বুঝি! অমিয় কত বড় বড় লোকের বাড়ী খাওয়াদাওয়া করে—সে বলেছে তোমার হাতটা সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দেবার মত।

নীলিমা এই কথা শুনে বিদ্রূপভরা কণ্ঠে বললে, পরের স্ত্রীর হাত সকলেরই সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দিতে ইচ্ছা করে—নিজের স্ত্রীর হাত তোমার বন্ধু ক'বার বাঁধিয়ে দিয়েছে জিজ্ঞেস করো ত? তারপর একটু থেমে কি চিন্তা করে বললে, তোমার যদি বলতে লজ্জা করে ত আমার নাম ক'রে বলো—আমি তাতে ভয় পাই না।

সতীশ বলে, আরে এতে তুমি রাগ করো কেন—সে তোমার প্রশংসাই করেছে। আমি তোমার স্বামী, আমার কাছে বলবে না? আমার ত শুনতে খুব ভাল লাগে। আমি মুখ্যু মানুষ, অত ভালমন্দ বুঝি না—কিন্তু অমিয়র মত ছেলের মুখের প্রশংসার দাম অনেক। বাস্তবিক ওর চোখই আলাদা—এই ত্যাখো না, তুমি ত কতদিন কত সেজেগুজে আমায় খেতে দাও, কিন্তু আজ তোমার বেশভূষা দেখে অমিয় কি বললে জানো—

কি বললে, বলো না গো? নীলিমার কণ্ঠে সহসা যেন কিসের ব্যাকুলতা ফুটে উঠলো।

সতীশ উত্তর দিলে, সে বললে, একটা ক্যামেরা থাকলে তোমার ফটো তুলে নিয়ে বাঁধিয়ে রাখত! ওই কালো শাড়ীটায় তোমায় নাকি এমন মানিয়েছিল যে কোমরে আঁচল জড়িয়ে খাবার থালা হাতে নিয়ে তুমি যখন ঘরে ঢুকলে তখন তোমার দিকে চেয়ে তার—

চুপ্ করো বলছি। এই বলে একটা ধমক দিয়ে নীলিমা বললে, কোন্ শাড়ী পরলে আমায় বেশী ভালো দেখায় সে আমি জানি, তোমার বন্ধুকে বলে দিতে হবে না।

সতীশ বললে, জানো, ও হলো কবি, ওর পছন্দর কত দাম!···শহরের কত সুন্দরীরা মাথা কোটাকুটি করে ওর পছন্দমত শাড়ী পরবার জন্যে ?

যারা করে করুক। আমি সে দলের নই—এ কথাটা তোমার বন্ধুকে ভাল করে স্মরণ করিয়ে দিয়ো। আর তা যদি করাতে তোমার লজ্জা করে ত আমায় বলো, আমি বেশ করে তাঁকে বুঝিয়ে দেবো।

এই বলতে বলতে হঠাৎ নীলিমার কণ্ঠস্বর উত্তেজিত হয়ে উঠলো। সে আবার শুরু করলে, ভদ্রঘরের কুলবধূদের রূপের প্রশংসা পরপুরুষের মুখ থেকে শোনা যে পাপ, এটা বোঝবার মত শিক্ষা কি তোমার বন্ধু পাননি ? আচ্ছা, আমার সঙ্গে এবার দেখা হলে আমি ভাল করে সেই কথাটা তাঁকে বুঝিয়ে দেবো!

লজ্জা, শালীনতা, ভব্যতা প্রভৃতি গুণগুলি নীলিমার মধ্যে অত্যন্ত প্রবল ছিল। তাই কোথাও তার এতটুকু ত্রুটিবিচ্যুতি সে সহ্য করতে পারতো না, একথা সতীশ জানে! তবুও অমিয়র মত কবি ও সুশিক্ষিত চরিত্রবান বন্ধুর মুখের প্রশংসায় যে কোন অন্যায় থাকতে পারে, তা সে ভেবেই পায় না। অথচ নীলিমা এসব বিষয়ে অত্যন্ত তেজস্বিনী বলে আবার সতীশের মনে একটু ভয়ও হলো। কি জানি যদি সত্যিসত্যিই সে কোনদিন সেই সব কথা বলে অমিয়কে অপমান করে! অমিয় যে এখনো সেই বাল্যকালের কথা স্মরণ করে তাকে বন্ধু বলে স্বীকার করে—এতেই সে ধন্য!

সতীশ অত্যন্ত সাদাসিধে ধরণের মানুষ! অতশত ঘোরপ্যাঁচ বোঝে না—একটু ভালো খাওয়া আর একটু বেশী ঘুমোতে পেলেই সে খুশি। পল্লীগ্রামের একটা সুনিবিড় প্রশান্তি যেন তার মুখচোখে সর্বদেহে!

পরদিন সকালে উঠে সতীশের সকলের প্রথমে অমিয়র কথা মনে পড়লো। সে তার বাড়ীতে গিয়ে নীলিমা যা যা বলেছিল সব কথাই তাকে খুলে বললে—কিছু গোপন করলে না।

অত্যন্ত ভদ্র মন অমিয়র। তাছাড়া সতীশের মধ্যে সে এখনো তার বাল্য-বন্ধুত্বের ছবি দেখতে পায়! তাই নীলিমার কথা শুনে সে মনে মনে একটু ব্যথা পেলে। সতীশের বৌ যে তাকে এমন কথা শোনাতে পারে তা সে কখনো আশা করতে পারেনি। সতীশ তার প্রিয়পাত্র বলে তার স্ত্রীর মধ্যে থেকে সেইসব সুদুর্লভ সৌন্দর্য

আবিষ্কার করে সে বন্ধুকে খুশি করতে চেষ্টা করতো।

এদিকে অমিয় যখন সত্যিসত্যিই সতীশের বাড়ীতে আসা বন্ধ করলে তখন আর এক বিভ্রাট দেখা দিল। সতীশ একদিন বেড়িয়ে রাত্রে বাড়ী ফিরতেই নীলিমা রান্নাঘর থেকে ছুটে এসে তাকে জিজ্ঞেস করলে, হ্যাঁগা, তোমার বন্ধুকে বুঝি তুমি বলে দিয়েছ আমার কথা ?

অত্যন্ত সরল প্রকৃতির লোক সতীশ, সত্য কথা বলতে সে এমন অভ্যস্ত যে স্ত্রীর কাছে মিথ্যা বলার চেষ্টা করতে গেলেই ধরা পড়ে যায়। তাই সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলে, তুমি ত তাকে বলতে বলে দিয়েছিলে !

নীলিমা এক মুহূর্তের জন্য যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়লো। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে অন্তরে যত ঝাঁজ ছিল, সব রসনায় টেনে এনে বললে, বলবো না ? বেশ করবো বলবো—একশোবার বলবো ! পরের বৌ-ঝিয়ের রূপ নিয়ে যে ব্যাখ্যা করে তাকে কোন্ সমাজে ভদ্দরলোক বলে শুনি !

সতীশ দু'হাত জোড় করে বললে, দোহাই তোমার, সে বেচারীকে নিয়ে আর টানাটানি করো না, ঢের হয়েছে, এখন একটু থামো !

কেন, তোমার বন্ধু বলে পীর নাকি, যে পরের বৌ সম্বন্ধে যা মুখে আসবে তাই বলবে ? আর আমরা কিছুই বলতে পারব না ! মেয়েমানুষ বলে বুঝি আমাদের কোন মান-সম্ভ্রম নেই ! এই বন্ধুর তুমি আবার গর্ব করো—লেখাপড়া জানা, শিক্ষিত বলে ? আমরা হলে অমন বন্ধুর মুখ দেখতুম না।

সতীশ তখন বললে, মুখ দেখা ত তুমি অনেক দিন তার বন্ধ করেছ, তবে আর কেন বেচারীকে শুধু শুধু গালাগালি করছো ?

আরো উত্তেজিত হয়ে নীলিমা বলে, আমি ত বন্ধ করেছি, এইবার তুমিও যাতে করো তার ব্যবস্থা করছি। একবার সামনাসামনি পাই তারপর দেখি সে কেমন ভদ্রলোক। ঝেড়ে কাপড় পরিয়ে না দিতে পারি ত আমি বাপের বেটী নই। এই কথা বলতে বলতে নীলিমার সর্বাঙ্গ থরথর করে কাঁপতে লাগল, চোখমুখ লাল হয়ে উঠলো।

সতীশ স্ত্রীর এই মূর্তি দেখে ভয় পেয়ে গেল। তাড়াতাড়ি [illegible] থেকে পাখাটা তুলে নিয়ে তার মাথায় বাতাস দিতে দিতে বললে, তা হ্যাঁগো তুমি অমন করছো কেন ? বেশ ত, তাকে বারণ করেছি, সে এখানে আর আসবে না। কোনদিন আর তোমার সম্বন্ধে কোন কথাও বলবে না।

কেন সে আমার কথা বলবে ? না হয় আমার রূপ নেই—না হয় শহরের বড়

লোকের মেয়েদের মত আমায় সুন্দর দেখতে নয়—তা বলে ঠাট্টা করবার তার কি অধিকার আছে আমার রূপ নিয়ে? নীলিমা এবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো ছোট মেয়ের মত।

সতীশ পড়লো মহাবিপদে। সে কিছুতেই তাকে বোঝাতে পারে না যে, অমিয় ঠাট্টা করেনি, সত্যি সত্যি তার প্রশংসা করেছে। যত সেকথা নীলিমাকে বোঝাতে যায়, তত সে বলে ওঠে—ওই বলে আমায় ভোলাতে হবে না, আমি সব বুঝি।

সতীশ বলে উঠলো, আরে ভালো জালায় পড়লুম—তুমি তা কি করে বুঝবে?

নীলিমা বললে, কৈ তুমি ত সে-কথা কোনদিন আমায় বলোনি—এতদিন হলো আমার বিয়ে হয়েছে। সত্যি যদি আমার রূপ থাকতো, তাহলে তুমি কি তা দেখতে পেতে না?

সতীশ পড়ে আরো বিপদে। সে বলে, আরে আমি হলুম পাড়াগেঁয়ে মুখ্যু মানুষ—আমার চোখের সঙ্গে অমিয়র চোখের তুলনা? সে কত বড় কবি, কত লেখাপড়া জানা লোক। সে যে জিনিসকে যে চোখে দেখবে, আমাদের সাধ্য কি তাকে সেই-ভাবে দেখি?

নীলিমা তার কথা বিশ্বাস করে না। বলে, যা ভালো তাকে সবাই ভালো বলে—কিবা পণ্ডিত, কিবা মূর্খ। সতীশ অনেক করে তাকে বোঝাতে চেষ্টা করলে, কিন্তু কিছুতেই সে-কথা তার মাথায় ঢুকলো না। বললে, না, না, না—ও-সব মিথ্যে আমি বুঝি।

কিন্তু আশ্চর্য মেয়েমানুষের মন। মুখে যতই সে-কথা অস্বীকার করুক, মনে মনে বুঝি কোথায় নিজের রূপের প্রতি তার আস্থা ছিল, তাই মুখে সে যে অমিয়কে অত গালাগাল দিত, শুধু তার রূপের প্রশংসা এতদিন পরে যে করেছে তারই নাম বারংবার মুখে উচ্চারণ করবার জন্যে। এ যেন তার বৈরীভাবে ভজনা। রূপের প্রশংসা সুরার মত যে মেয়ে একবার পান করে সেই জানে কি ভীষণ তার মাদকতা। তাই বুঝি প্রতিদিন সে তার রূপের পূজারীর নাম স্মরণ করতো ওইভাবে। অথচ নীলিমার অপরাধ কি? উনিশ বছরের স্বাস্থ্যবতী যুবতী সুন্দরী সে—কোনদিন স্বামী বা বাড়ীর অন্য [illegible] থেকে রূপের প্রশংসা শোনেনি—শুধু শুনেছে নিত্যনূতন রান্নার [illegible] তালিকা। তাই তার রূপের বহ্নিতে যেই প্রশংসার বাতাস লাগলো, অমনি যেন তার শিখা লক লক করে সহস্র গুণ বর্ধিত হয়ে তার সমস্ত অন্তরকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিলে। নীলিমা যত তাকে নেভাতে চেষ্টা [illegible] গোপন করতে যায়, ততই তার মুখ দিয়ে বার হয় ঝাঁজ—যে তার মনকে

এমনিভাবে জ্বালিয়ে দিলে তার প্রতি তার হৃদয়ের এই আক্রোশ। রোজই তাই স্বামীর গলার আওয়াজ পেলে ঘর থেকে সে ছুটে বেরিয়ে আসে, অমিয়র মুখের কথা আরো নতুন কিছু শুনতে পাবার আশায়। কিন্তু হায়! তার সে আশা মেটে না। সে তখন সতীশকে জিজ্ঞাসা করে, সত্যি বলো ত, আর কিছু অমিয় আমার সম্বন্ধে বলেছে কিনা, তখন সতীশ তার গায়ে হাত দিয়ে দিব্যি করে বলে, 'মাইরি বলছি, কিচ্ছু বলেনি।'

আরো কিছুদিন এইভাবে কেটে যাবার পর একদিন নীলিমা সতীশকে জিজ্ঞেস করলে, হাঁগো, তোমার বন্ধু ত এত শিক্ষিত, বিদ্বান, কিন্তু বন্ধুর বৌ যদি ঠাট্টা ক'রে কিছু বলেই থাকে, তা বলে কি এ বাড়ীতে আর আসতে নেই? একেবারে যাওয়া-আসা বন্ধ করে দিতে হয়?

সতীশ বিস্মিত দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর বলে, তুমি নিজেই ভাঙছ আবার নিজেই গড়ছো। সত্যি কোন্‌টা তোমাদের ঠাট্টা আর কোন্‌টা ঠাট্টা নয়, এ যে বুঝবে সে এখনো মায়ের গর্ভে।

আহা কথার ছিরি দেখো না—শুনলে গা জ্বালা করে। আমাদের নাকি কিছুই বোঝা যায় না আর তোমাদের সব বুঝি বোঝা যায়। বলতে বলতে নীলিমা দ্রুত-পদে গৃহান্তরে চলে গেল।

কয়েকদিন পরে আবার নীলিমা তার স্বামীকে প্রশ্ন করলে, হ্যাঁগো, তোমার শিক্ষিত বন্ধু না হয় আমার সঙ্গে না-ই দেখা করলে, তা বলে যাবার আগে মার সঙ্গে ত একবার দেখা করা উচিত ছিল।

সতীশ ততোধিক বিস্মিত হয়ে বললে, কে বললে তোমায় যে সে চলে গেছে এখান থেকে? এখনো তার পনেরো দিন ছুটি রয়েছে!

নীলিমার মুখে এবার রহস্যময়ীর হাসি ফুটে উঠলো। বললে, ওমা আমি বলি বুঝি চলে গেছেন—তা না হলে তোমার মুখে আর বন্ধুব নাম শুনতে পাই না কেন?

সতীশ জবাব দেয়, তার নাম শুনলেই যে তোমার গা জ্বলে ওঠে—কাজেই আমি আর ওধার দিয়েই যাই না। বাপ্‌ 'একে মা মনসা, তায় ধুনোর গন্ধ'। তোমায় যে চেনে সে আবার ও-নাম মুখে আনবে?

এই শুনে সত্যি নীলিমা রাগে জ্বলে ওঠে! বলে, হ্যাঁ আমি খারাপ, আমি বদমায়েস, আমি সব—আর তোমার বন্ধুর সব ভালো—হলো ত? আচ্ছা, এই

আমার ঘাট হয়েছে, এই তোমার পায়ে দণ্ডবৎ—আর তোমার বন্ধুর যদি কোন নিন্দে কখনো করি। তাকে দয়া করে এবার এ বাড়ীতে আসতে বলো—কোন্ হারামজাদী আর একটা কথা মুখে উচ্চারণ করে।

সতীশ স্ত্রীর মুখের এই রকম সব উল্টোপাল্টা কথা শুনে কিছুই বুঝতে পারে না, হকচকিয়ে যায়। ভাবে নীলিমার মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? কখনো ত সে এ রকম ছিল না। এইভাবে ইতিপূর্বে তার সঙ্গে কখনো ত সে আলাপ করেনি? তাই কি যেন ভেবে আবার নীচুস্বরে সে বললে, নীলি, তুমি কি যা-তা সব বলছো? আমি কি কোনদিন তোমায় ওকথা বলেছি?

নীলিমা হিস্টিরিয়া রোগীর মত বলে উঠলো, এই নাকে কানে খত দিচ্ছি—আর এই জোড়হাত করছি, তোমার বন্ধুকে আর কখনো কিছু বলবো না। এবার হয়েছে?

কেন আমি কি সেজন্য তোমায় কোন তিরস্কার করেছি!

তা না করলেও আমি কি তোমার মুখ দেখে বুঝতে পারি না ভেবেছ?

সতীশ বিস্মিতকণ্ঠে বলে, তুমি আমায় ভুল বুঝেছ নীলি!

নীলিমা ছোট মেয়ের মত ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বলে, না গো না, আমি ভুল বুঝিনি। ঠিকই ধরতে পেরেছি।

এরপর সতীশ যত নীলিমাকে বোঝাতে চেষ্টা করে, নীলিমা তত কাঁদে। আর বলে, ওগো আমার অপরাধ মার্জনা করো, আমি আর কোনদিন তোমার বন্ধুকে কিছু বলবো না।

অগত্যা সতীশ বলে, আচ্ছা, আচ্ছা, আমি অমিয়কে বলবো যে তুমি তার ওপর আর রাগ করোনি! কেমন হয়েছে ত? এবার তাহ'লে চুপ করো।

আঁচলের প্রান্ত দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে এবার নীলিমা চুপ করলে। তারপর বললে, কেন মিছি মিছি আমি তাঁর কাছে অপরাধী হয়ে থাকবো এইভাবে?

সতীশ গলায় একপ্রকার অবিশ্বাসের সুর এনে বললে, অপরাধী! কিসের অপরাধ তোমার নীলিমা, যে তুমি বার বার এই কথাটায় এত জোর দিচ্ছ?

হ্যাঁ গো, এ আমার গুরুতর অপরাধ, তুমি জানো না।

আচ্ছা আমি না হয় জানি না,—তুমি ত জানো, তাহলেই হলো। এই বার চুপ করো, প্রকৃতিস্থ হও।

নীলিমা প্রকৃতিস্থ হলো বটে, তার মন কিন্তু পড়ে রইল বাইরে—অমিয়র গলার [illegible]র জন্যে।

দু'তিন দিন পরে হঠাৎ অমিয় এসে সতীশের নাম ধরে ডাকলে বাইরে থেকে। সতীশ তখন বাড়ি ছিল না। তার মা তাকে ভিতরে ডেকে বললেন, তুই ত ঘরের ছেলে বাবা, তুই আবার অমন করে বাইরে থেকে ডাকছিস কেন?

অমিয় বললে, সে যখন ছোট ছিলুম তখন একরকম ছিল মাসীমা, এখন পরের মেয়ে ঘরে এসেছে, তার মানইজ্জত বাঁচিয়ে চলতে হবে ত?

তিনি বললেন, ওমা কি বলিস রে, সতীশ তোর ছেলেবেলার বন্ধু। তার বৌ আবার পরের মেয়ে কিরে তোর কাছে?

সে তুমি বললে কি হবে মাসীমা।

তাই নাকি? বলে তিনি তখনি নীলিমাকে সেখানে ডেকে পাঠালেন, ও বৌমা এদিকে এসো ত, দেখে যাও কে এসেছে!

নীলিমা তখন তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে শাড়ী বদলাচ্ছিল। অন্য একখানা শাড়ী পরতে গিয়ে হঠাৎ তার কি মনে হলো, সেদিনের সেই কালো রঙের শাড়ীটাই বার করে সে পরলে, তারপর সেদিনের সেই চুনীর দুল দুটো কানে ঝুলিয়ে ছুটে বেরিয়ে এলো।

নীলিমাকে আসতে দেখে অমিয় ঘাড় হেঁট করে রইল। তার মুখের দিকে না চেয়েই সে বললে, আজ রাত্রের গাড়িতেই চলে যাবো মাসীমা, হঠাৎ অফিস থেকে টেলিগ্রাম এসেছে। সতীশও জানে না এ কথা।—সে বাড়ী ফিরলে একবার আমার সঙ্গে তাকে দেখা করতে বলবেন। বলে তাঁকে প্রণাম করতেই তিনি বলে উঠলেন, ওমা সে কি হয়, খালিমুখে চলে যাবি ফিরে, যা যা ঘরে বোস—ও বৌমা খানকতক লুচি আর একটু চা ওকে শিগ্‌গির করে দাও ত।

নীলিমা তখন চা ও খাবার তৈরী করে, ঠিক সেদিনকার মত কাপড়ের আঁচলটা কোমরে জড়িয়ে ঘরে এসে অমিয়কে খেতে দিলে। অমিয় ঘাড় হেঁট করে বসে বসে খেতে লাগল। খাওয়া শেষ হতে নীলিমা খিল খিল করে হেসে উঠে বললে, রসিকতা বন্ধুর বৌরা-ই ক'রে থাকে স্বামীর বন্ধুর সঙ্গে।

জানি। বলে তেমনিভাবে তার মুখের দিকে না তাকিয়েই উত্তর দিলে এবং খাওয়া শেষ ক'রে সুবোধ বালকের মত ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

নীলিমা তখন ছুটে নিজের ঘরে গিয়ে খাটের ওপর আছড়ে পড়ে কাঁদতে লাগল। সেই কালো রঙের শাড়ীটাকে পাগলের মত দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করলে এবং কানের দুল দুটোকে খুলে ঘরের মেঝেয় ছুঁড়ে ফেলে দিলে।

রাত্রে সতীশ বাড়ি ফিরতেই আবার তার বন্ধুকে গালাগালমন্দ দিতে শুরু করলে নীলিমা।

আজ আবার কি হলো। অমিয় ত এসেছিল বাড়িতে।

এসেছিল, তাতে হয়েছে কি? আমার চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করে গেছে?

তখন সতীশ তাকে বললে, এই না তুমি সেদিন প্রতিজ্ঞা করলে আর কখনো তাকে কিছু বলবে না?

নীলিমা এবার পাগলের মত চীৎকার করে উঠলো, বলবো না—এত বড় ছোট-লোক অভদ্র চাষাকে বলবো না কিছু? একশোবার বলবো—হাজারবার বলবো—সারা জীবন ধরে বলবো···বলতে বলতে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল।

সতীশ কিছু বুঝতে না পেরে শুধু হতভম্বের মত স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

এই যুদ্ধ

বিলাসিতার মধ্যে ছিল একটু ভালখাওয়া-দাওয়া, তাও ঘুচলো একে একে!

দোকানের খাবার কেনা আগেই বন্ধ হয়েছিল। বাড়িতে পরোটা, হালুয়া তৈরী ক'রে অনুপমা ছেলেমেয়েদের ও স্বামীকে খাওয়াতো। কিন্তু আটার মূল্য অসম্ভব বৃদ্ধি পাওয়াতে এবার পরোটা খাওয়াও উঠলো। প্রিয়নাথ বললে, এক টাকা সেরের আটা কেনবার মত অবস্থা আমার নয়। জলখাবার তখন গিয়ে দাঁড়ালো শুধু চা আর হালুয়ায়। চিনিটা প্রিয়নাথ অফিস থেকে পেতো সস্তায়—আর চা-টা তাকে কিনতেই হতো না—অফিসের বাবুর্চি সাহেবদের টিফিনের চা থেকে প্রতি মাসে কিছু কিছু সরিয়ে তাকে উপহার দিতো। অবশ্য এর জন্যে প্রিয়নাথকে তার চিঠির ঠিকানা লিখে দিতে হতো, দেশে টাকা পাঠাবার সময় লিখে দিতে হতো মনিঅর্ডারের ফর্ম!

অনুপমা আত্মীয়স্বজনের আসা-যাওয়া, লোকলৌকিকতা সবই রক্ষা করতো এই ভাবে গৃহজাত খাদ্য দিয়ে। প্রথম প্রথম তার চক্ষুলজ্জায় বড় বাধতো। জলখাবারের রেকাবটা সামনে রাখতে রাখতে তাই বলতো, আমাদের উনি আবার বাজারের খাবার একেবারে বাড়িতে ঢুকতে দেন না—বলেন সব ভেজাল।

ছোট ছেলেমেয়েগুলো যদি কোনদিন খাবারের জন্যে বায়না ধরতো তো অনুপমা তাদের বুঝিয়ে দিতো যে পৃথিবীর যেখানে যতো খারাপ জিনিস আছে তাই দিয়ে আজকাল শহরের দোকানে সিঙাড়া, কচুরী, পানতুয়া, রসগোল্লা প্রভৃতি তৈরী হয়। আর সেসব খেলেই ভয়ানক অসুখ করে।

এইভাবে চলছিল। কিন্তু কিছুদিন পরে হঠাৎ অফিসের চিনির স্টক ফুরিয়ে যেতে হলো বিপদ। বাজার থেকে ডবল দাম দিয়ে চিনি কেনবার মতো সচ্ছল অবস্থা প্রিয়নাথের নয়, অথচ রাস্তায় যে সব 'কনট্রোলের' দোকান আছে, সেখানে গিয়ে ধন্না দেবারই বা তার সময় কই! তবু বড় ছেলেটাকে একদিন সে পাঠিয়েছিল চিনি কেনবার জন্যে। লেখাপড়া কামাই করে, সেখানে 'কিউ' দিয়ে তিন-চার ঘণ্টা ভিড় ঠেলে অবশেষে সে বাড়ী ফিরে এলো—জামা ছিঁড়ে, কাঁদতে কাঁদতে। সে দোকানের কাছ পর্যন্ত পৌছবার আগেই চিনি ফুরিয়ে গেছে।

প্রিয়নাথ চিনি কেনা বন্ধ করে দিলে। ফলে চা-হালুয়া খাওয়াও বন্ধ হয়ে গেল।

এইবার জলখাবার বন্দোবস্ত হলো মুড়ি আর মুড়কি। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে প্রিয়-

নাথও তাই খায়, অনুপমাও বাদ যায় না। তবে একটু গরম জল তার পেটে না পড়লে চলতো না, সেইজন্যে স্বামী অফিসে বেরিয়ে যাওয়ার পর সে গুড় দিয়ে চা তৈরী করে কলাইচটা বড় মগের মত কাপটা ভর্তি ক'রে খেতে বসতো।

ছেলেমেয়েরাও এক-একদিন মাকে ঘিরে ধরতো একটু প্রসাদ পাবার জন্যে। অনুপমা পেয়ালাটা সকলের মুখের কাছে এক-একবার ক'রে ঠেকিয়ে বলতো, খবরদার, তোর বাবাকে যেন কেউ বলিস নি যে আমি চা খেয়েছি!

বড় ছেলের নাম মিণ্টু। বয়েস তার বছর আষ্টেক, জিজ্ঞেস করতো, কেন মা?

ধমক দিতো অনুপমা, তোর অত খবরে দরকার কি?

অবশ্য এই লুকোচুরির কারণ খুবই সামান্য! একদিন প্রিয়নাথের মাথা ধরলে অনুপমা গুড় দিয়ে এক পেয়ালা চা তৈরী করে তার হাতে দিয়ে বলেছিল, চা খাওনি বলে মাথা ধরেছে, এটা খেয়ে ফেলো দেখি, এখনি মাথাটা হাল্‌কা হয়ে যাবে।

কিন্তু এর উত্তরে প্রিয়নাথ সেই চা না খেয়ে তখনি নর্দমায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল আর বলেছিল, এমন নেশা করি না যে চিনির অভাবে গুড় দিয়েও খেতে হবে।

স্বামীর মুখ থেকে এ ধরণের কথা শোনবার পর আর কোন সতী-সাবিত্রীর পক্ষেই বোধ হয় সত্য কথা বলা সম্ভব নয়, তাই প্রিয়নাথের কাছে নিজের এই দুর্বলতাটুকু গোপন রাখবার জন্যে অনুপমা ছেলেমেয়েদের ওইটুকু ঘুষ দিতো। কেন না চা খাওয়ার অভ্যাস অনুপমা কিছুতেই ছাড়তে পারবে না। তার বিশ্বাস ইঞ্জিন যেমন কয়লা না হলে চলে না, তেমনি সংসারের চাকা যাদের দিনরাত্রি ঘোরাতে হয় তাদের পক্ষে ওটা অপরিহার্য। তাই এর'পর যখন গুড়ের দাম বাড়লে প্রিয়নাথ গুড় কেনা বন্ধ করে দিলে, অনুপমা তখন একটুও ইতস্ততঃ না ক'রে মুন দিয়ে 'র' চা চালাতে লাগল।

যুদ্ধের বাজারে যেন সব জিনিসে আগুন লাগল।

এদিকে আবার চাল-ডাল ও তরিতরকারির মূল্যও অসম্ভব রকম বেড়ে গেল। প্রিয়নাথ এবার অস্থির হয়ে ওঠে—কোন্‌দিক সামলাবে। ষাট টাকা মাইনের কেরানি সে, অথচ তিনটি ছেলেমেয়ে ও নিজেরা স্বামী-স্ত্রী! কলকাতায় বাড়ী ভাড়া দিয়ে, এ বাজারে ওই টাকায় সংসার চালানো দুঃসাধ্য।

প্রিয়নাথ চালের দাম বাড়তে সরু ছেড়ে মোটা ধরলে। আলুর অগ্নি-মূল্য দেখে আলু কেনা বন্ধ করলে। মাছের সের সাড়ে তিন টাকা হতে নিরামিষ খাওয়া শুরু

করে দিলে। এমনি করে সস্তার তরিতরকারি খেয়েও কোনরকমে দিন কাটছিল, কিন্তু তাও বন্ধ হলো যখন কয়লার দাম হঠাৎ সাড়ে চারটাকা হয়ে গেল। একমণ কয়লা সাড়ে চারটাকা! প্রিয়নাথ এবার মাথায় হাত দিয়ে পড়লো। দু'টো ভাত সিদ্ধ করেও কি ভগবান তাদের খেতে দেবেন না!

অনুপমা কোনরকমে একবেলা দু'টো ভাতে-ভাত রাঁধে, আর তাই দু'বেলা সকলে মিলে খায়।

আগে ভালো খাওয়া-দাওয়ার দিকে প্রিয়নাথ বরাবর-ই দৃষ্টি রাখতো—স্বাস্থ্যই যে জীবনের একমাত্র সম্পদ একথা সে কোনদিন ভোলেনি। এখন তাই ভাতের থালার সামনে বসে বারবার সে শুধু দীর্ঘনিঃশ্বাস চেপে নেয়।

কিন্তু অনুপমার চোখে এটুকু এড়ায় না। স্বামীর এই প্রচ্ছন্ন মনোবেদনা বুঝি সেও বুঝতে পারে! তাই কোনদিন দু'টো আলুর খোসা ভেজে, কোনদিন বা কুমড়োর খোসার তরকারি রেঁধে—ওরই মধ্যে একটু বৈচিত্র্য আনবার চেষ্টা করতো।

আর ছেলেমেয়েরাও যে ভাল আহার্যের জন্যে খেতে বসে বায়না ধরতো না এমন নয়, তবে অনুপমা তাদের সান্ত্বনা দিয়ে বলতো, আগে যুদ্ধটা থামুক বাবা, তারপর তোরা কত খেতে পারিস দেখবো। রোজ বড় বড় মাছ, বাটি বাটি তরকারি রেঁধে দেবো!

মায়ের মুখ থেকে এই রকম কথা শুনে ছেলেমেয়েরা উৎসাহের সঙ্গে বলতো, মা তখন চারখানা মাছ ভাজা আমায় কিন্তু একসঙ্গে দিতে হবে! অনুপমা বলতো, আচ্ছা।

বড় মেয়েটা বলতো, তখন কিন্তু আলুর খোসা ভাজা আমি খাবো না—এতগুলো আলু ভাজা দিতে হবে বলে দিচ্ছি! তাকেও 'আচ্ছা' বলে সান্ত্বনা দিয়ে অনুপমা আবার নিজের কাজে মন দিত।

কিন্তু এই সামান্য বৈচিত্র্যটুকুও বেশী দিন সইলো না। একদিন গরম দু'খানা বেগুন ভাজা প্রিয়নাথের পাতে দিতেই সে একেবারে রাগে জ্বলে উঠলো। বললে, সখ তো দেখছি ষোল আনা, তারপর মাস-কাবারের আগেই বলবে তেল ফুরিয়েছে। মনে থাকে যেন তখন এক ফোঁটা তেল দেবো না—ওই পাঁচপো তেলে একমাস চালাতে হয় চালাবে, না হয় পুড়িয়ে খাবে। তিন টাকা করে তেলের সের, আমি কোথা থেকে এর চেয়ে বেশী পাবো—তুমি কি আমায় চুরি করতে বলো নাকি—

দশ টাকা ধুতির জোড়া, পঁইতিরিশ টাকা চালের মন—সব জেনেশুনেও তোমার নবাবী গেল না।

স্বামীর মুখের ওপর অনুপমা কোনদিন কথা কয়নি, কিন্তু আজ আর সে চুপ করে থাকতে পারলে না। বললে, কত কালিয়া-পোলোয়া আমায় খাওয়াচ্ছো, আর কি ঢাকাই-বেনারসী পরাচ্ছো যে আমার নবাবী দেখলে। দু'বেলা দুটো ভাত আর আলু সেদ্ধ খাই তাও যদি দিতে কষ্ট হয় ত স্পষ্ট বলে দাও—রোজ রোজ তোমার মুখনাড়া আর সহ্য হয় না—যেন আমি ঝি-চাকরাণী, চুরি করে সব নিজের পেটে পুরছি।

মুহূর্তে তাদের ভদ্রতা ও শোভনতার সব আবরণ যেন ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায়। দারিদ্র্যের নগ্নতায় ও কদর্যতার গ্লানিতে পরস্পরের মন বিষাক্ত হয়ে ওঠে। তাদের দশ বৎসরের বিবাহিত জীবনে ঝগড়া এই প্রথম! হঠাৎ কোথা থেকে কি যেন হয়ে গেল! প্রিয়নাথ শিক্ষিত ভদ্রলোক, পরমুহূর্তে তাই অনুতপ্ত হলো। সে পরিষ্কার বুঝতে পারলে এতে অনুপমার কোন দোষ নেই, তারই দরিদ্র-মনের ক্ষণিক বিকৃতি ছাড়া এ আর কিছুই নয়। অনুপমাও স্বামীর মুখের দিকে যেন লজ্জায় তাকাতে পারে না!

এমনি করে তারা নিত্য নতুন অভাবের সম্মুখীন হতে লাগল। যুদ্ধ যে কত ভয়াবহ তা তারা প্রথম উপলব্ধি করলে যখন এর ওপর আবার কেরোসিন তেল দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠলো। সরকারী ব্যবস্থা হলো, চার পয়সার বেশী তেল কাউকে একসঙ্গে দেওয়া হবে না। সভ্যতার আলোয় যারা এতদিন চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে এসেছে তাদের এই প্রচেষ্টায় দেশবাসী বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো। তাছাড়া সকলের এই চার পয়সার তেল পাবার উপায়ও ছিল না। রথ-দোলের মত ভিড় লাগতো এই তেলের দোকানে। একজনের পেছনে আর একজন লোক সারি সারি দাঁড়িয়ে যেতো—এমনি কত—পাঁচশো, হাজার, দু'হাজার বালক বৃদ্ধ যুবক—নরনারী ও জাতিধর্ম-নির্বিশেষে! কিন্তু এতো তেল কোথায়? কোনদিনই শেষ পর্যন্ত সবাই পেতো না। যাদের গায়ে জোর আছে এবং যারা সকাল থেকে এসে দু'ঘণ্টা চার ঘণ্টা ধন্না দিতে পারে তারা হয়ত পায়! প্রিয়নাথের সে সময় নেই। কাজেই রাত্রে আলো জ্বালা তাদের বন্ধ হয়ে গেল।

কোনরকমে দু'টো ভাত খেয়ে নিয়ে সকাল সকাল সবাই শুয়ে পড়তো। অন্ধকার গলির মধ্যে পুরানো জীর্ণ একটা বাড়ীর একতলার দু'খানা ঘরে তারা বাস করে, দিনের বেলাই সেখানে ভালো করে আলো ঢোকে না, তার ওপর আলোক-নিয়ন্ত্রণ,

যুদ্ধের জন্ম ত ছিলই! প্রিয়নাথ মনে মনে হাসে। তারা যেন আবার অন্ধকার-যুগে বাস করছে! সৃষ্টির সেই আদিম যুগে! আবার এক-এক সময় ভাবে, এই ভালো! ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্যে! এই অন্ধকারকে যেন আশীর্বাদ মনে হয়। অন্ধকার তার বেশ ভাল লাগে—এতে ইতর-ভদ্র, ধনী-দরিদ্র চেনা যায় না!

কিন্তু আহার্যের ভিতর দিয়ে বুঝি এই পার্থক্য ধরা প'ড়ে যায়! তাই অল্পদিনের মধ্যে নানা রকমের অসুখ-বিসুখ দেখা দিল। আজ ছেলেটার জ্বর, কাল মেয়েটার পেটের অসুখ, পরশু নিজের আমাশয়, তার পরের দিন হয়ত স্ত্রীর! প্রিয়নাথ বিরক্ত হয়ে ওঠে—কোন্ দিক সামলাবে ভেবে পায় না।

ভায়রাভাইয়ের এক খুড়তুতো শালা কলকাতার নামকরা ডাক্তার, তাঁর ঠিকানা খুঁজে বার ক'রে প্রিয়নাথ ওষুধ নিয়ে আসতো, কোন কোন দিন বা ছেলেমেয়েকে নিয়ে যেতো রিক্সা ভাড়া করে তাঁর কাছে দেখাতে।

একদিন ডাক্তার বললেন, ওষুধে কিছু হবে না, ছেলেদের সব 'ভাইটালিটি' কমে গেছে, পথ্য চাই—ফল, দুধ, মাংস, মাছ প্রচুর খাওয়া দরকার।

প্রিয়নাথের মুখ শুকিয়ে গেল। খালি শিশি হাতে করে সে বাড়ী ফিরে এলো। তারপর আকাশ-পাতাল চিন্তা করে এক সময় নিজের মনকে সে নিজেই সান্ত্বনা দিলে —গরীবদের মৃত্যু ত চিরকাল এই ভাবেই হয়—তবে মিছি মিছি ভেবে লাভ কি!

অনুপমা শুধু নীরবে অশ্রুবর্ষণ করে। স্বামীর ওই সামান্য আয়, কি করে ছেলে-মেয়েদের ভালোমন্দ খাওয়াবে ভেবে পায় না, তার গায়ে যা দু' একখানা অলঙ্কার ছিল তা ইতিপূর্বেই গিয়েছে সংসারের অনটনে।

তার চোখের সামনে ছেলেমেয়েরা শীর্ণ থেকে শীর্ণতর হয়ে আসে, স্বামীর দেহ রীতিমত ভেঙ্গে পড়ে—তবু সে কিছু করতে পারে না। কেবল কাঁদতে কাঁদতে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানায় যেন এই যুদ্ধ শিগগির থেমে যায়! যেন শিগগির দেশের সচ্ছল অবস্থা ফিরে আসে!

এই সময় একদিন সামনের মাড়োয়ারীদের বাড়ীতে বিয়ের বাজনা বেজে উঠলো। লক্ষপতির ছেলের সঙ্গে কোন ক্রোড়পতির মেয়ের নাকি বিয়ে! এই বিরাট অট্টালিকার ঠিক পিছন দিকের সবচেয়ে সরু গলিটাতে প্রিয়নাথের বাসা! ভিয়ানের গন্ধে মেতে উঠেছে পাড়া। বিশুদ্ধ ঘৃতে নানাবিধ মিষ্টান্ন প্রস্তুত হচ্ছে।

বহুদিন পরে এমন সুখাদ্যের গন্ধ নাকে যেতে অনুপমার মনটা সহসা—তীব্র

আক্রোশে ভরে ওঠে। নাকে কাপড় চেপে, কতকটা যেন আপন মনেই সে বলে, উঃ, মুখপোড়ারা গন্ধ বার করেছে দেখো না কিরকম, ঘরে টেঁকা দায়!

বড় ছেলেটা কাছেই কোথায় ছিল। খপ্ ক'রে বলে উঠলো, মা আমরা নেমন্তন্ন খেতে যাবো!

অনুপমা বলে, ছিঃ বাবা, ওরা বড়লোক, ওদের বাড়ী কি যেতে আছে!

মিণ্টু বলে, আচ্ছা মা, আমরা যদি রাত্রে লুকিয়ে খেয়ে আসি তাহ'লে ওরা কি করে জানতে পারবে!

ছেলের কানটা বেশ করে মলে দিয়ে অনুপমা বললে, ছোটলোকের মত এই সব কথা শিখছিস্ কার কাছে—শিগগির বল—তা না হ'লে এখুনি মেরে হাড় ভেঙ্গে দেবো।

ছোট মেয়েটা টপ্ ক'রে বলে ফেললে, মা দিদি বলেছে।

দিদি বলেছে! দাঁড়াও আজ দিদির পিঠ ভাঙছি। রাগে অগ্নিমূর্তি হয়ে অনুপমা বড় মেয়েটার কাছে ছুটে গিয়ে তার পিঠে দুমদাম ক'রে ঘা কতক বসিয়ে দিলে। বড় ছেলে ও মেয়েটা একসঙ্গে তারস্বরে চীৎকার করতে লাগল।

প্রিয়নাথ সবে অফিস থেকে ফিরে জামা-কাপড় ছাড়ছিল। ছেলেমেয়েদের কান্না কানে যেতেই তার মেজাজটা কেমন রুক্ষ হয়ে উঠলো। সে ঘর থেকে চেঁচিয়ে বললে, ছেলেমানুষ না হয় একটা কথা বলেই ফেলেছে, তা বলে কি ওই রকম ক'রে ঠ্যাঙাতে হয়!

না, ঠ্যাঙাবে না! ঠ্যাঙানীর এখনই হয়েছে কি। এতবড় আস্পর্দা তোমার ওই ছেলেমেয়ের, বলে কিনা চুরি করে ওদের বাড়ীতে খেতে যাবে! আবার কাঁদছে—লজ্জা করে না, ছোটলোক কোথাকার! এই বলে আরো দ্বিগুণ রাগে অনুপমা জ্বলে ওঠে! কিসের এক উত্তেজনায় তার সর্বশরীর যেন ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতে থাকে।

রাত্রে ঘুমোতে ঘুমোতে ছেলেটা চমকে ওঠে—বারবার তার ঘুম ভেঙ্গে যায় কিসের শব্দে। বাইরে ঠিক তাদের ঘরের সামনে এঁটো পাতা গেলাস চাকরেরা ফেলে যাচ্ছে, আর কতকগুলো কুকুর তারই ভেতর থেকে ভুক্তাবশিষ্টগুলি নিয়ে টানাটানি ছেঁড়া-ছিঁড়ি করছে। সরু গলির রাস্তাটা ভরে ওঠে উচ্ছিষ্টে।

অনুপমা বিছানার মধ্যে শুয়ে গরগর করে রাগে। মুখপোড়ারা আর এঁটো ফেলবার জায়গা পেলে না, আমার দরজার সামনে মরতে এলো। ছি-ছি গলায় দড়ি! গরীব বলে কি এত হেনস্তা!

—অকস্মাৎ কতকগুলি কুকুর ঘেউ ঘেউ করে ডেকে উঠলো! অনুপমা দাঁতে দাঁত

চেপে বললে, মর্ মর্ মড়ারা, এত গিলছিস্ তবে আবার চেঁচিয়ে মরিস কেন!

ওগো, তোমার পায়ে পড়ি একটু চুপ করো। আমায় ঘুমোতে দাও—বলে পাশের ঘর থেকে প্রিয়নাথ স্ত্রীর ওপর ঝেঁজে ওঠে।

তা আমার ওপর রাগ করলে কি হবে—মুখপোড়াদের কাণ্ডটা একবার দেখছো! যত রাজ্যির এঁটো এনে আমাদের বাড়ীর দরজার সামনে ফেলছে! শুনতে পাচ্ছো না? কেন আর কি কোন চুলোয় জায়গা নেই!

তা তোমার এত গায়ের জ্বালা কেন! তোমার ঘরের ভেতরে ত ফেলতে আসেনি—সরকারী রাস্তায় ফেলছে। তুমি বাধা দেবে কোন্ অধিকারে?

সরকারী রাস্তা বলে যা ইচ্ছে তাই ওরা করবে নাকি?

প্রিয়নাথ এবার রীতিমত চটে উঠলো। বললে, তা কি করতে হবে—না ঘুমিয়ে সারারাত তোমার মত নিজের মনের সঙ্গে ঝগড়া করতে হবে?

তারপর স্বরটা একটু নামিয়ে বলে, যারা করছে করুক—তা তোমার এত মাথাব্যথা কেন—তুমি ঘুমোও না চুপ করে।

অনুপমা বলে, এতে ঘুম আসে মানুষের চোখে!

তোমার চোখে ঘুম না আসে ত তুমি চুপ ক'রে থাকো—যাদের আসে তাদের ঘুমোতে দাও! দোহাই তোমার! এই বলে প্রিয়নাথ যেই থামলো অমনি সঙ্গে সঙ্গে কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করে ডেকে উঠলো।

মিণ্টু চুপিচুপি বলে, মা ওদের তাড়িয়ে দিয়ে আসবো?

প্রিয়নাথ চেঁচিয়ে উঠলো, চুপ কর্ হারামজাদা—এখনো জেগে আছে, চোখে ঘুম নেই—এই রাত্রে উনি যাচ্ছেন রাস্তায় কুকুর তাড়াতে!

স্বামীর ওপর এবার আরো এক পর্দা গলা চড়িয়ে দিলে অনুপমা। বললে, তা ওর ওপর রাগ করলে কি হবে শুনি! সকলে ত আর তোমার মত এই গোলমালের ভেতরেও ঘুমোতে পারে না!

প্রিয়নাথ বললে, আচ্ছা, আমার ঘাট হয়েছে, দোহাই তোমাদের—তোমরা দয়া করে একটু চুপ করো। অফিসের হাড়ভাঙা খাটুনির পর এ যেন আর সহ্য হয় না। আবার কাল সকালে অফিস আছে, ভুলে যেয়ো না।

অনুপমা এবার তীব্র ভাষায় গালাগাল দিয়ে উঠলো তাদের—সেই কুকুরগুলো যাদের উচ্ছিষ্ট ভোজন করছে। কি জানি কেন, তখন তার মনে হলো, দোষ কুকুরদের নয়—দোষ সেই সব ধনীদের যারা প্রলুব্ধ করে কুকুরদের তাদের ভুক্তাবশিষ্ট দেখিয়ে। অনুপমা অকথ্য ভাষায় অভিসম্পাত দিতে লাগল তাদের। রাত্রের সেই নির্জনতায়

তার সেই গালাগালগুলো যেন তারই কানে ফিরে এসে বার বার তাকে ধিক্কার দিতে থাকে।

পরের দিন সকাল থেকে ভেদ-বমি শুরু হয়ে গেল অনুপমার ও বড় ছেলেটার।

ডাক্তার বমি পরীক্ষা করে বললেন, অত্যধিক ঘৃতপক্ক খাদ্য পেটে পড়েছে। প্রিয়নাথ বিস্মিত দৃষ্টিতে ডাক্তারের মুখের দিকে চেয়ে বললে, ঘৃতপক্ক দূরে থাক এক ফোঁটা ঘি আমার বাড়ীতে ঢোকেনি আজ চার মাস।

ডাক্তার বললেন, ওকথা আমায় বললে বিশ্বাস করবো না—কেন না লুচি ও সন্দেশের টুক্‌রো এখনও রয়েছে বমির সঙ্গে।

প্রিয়নাথ এবার মাথায় হাত দিয়ে যেন আকাশ-পাতাল কিসব ভাবতে থাকে।

ডাক্তার দু'জনকে দু'টো 'সেলাইন ইন্‌জেক্‌শন' দিয়ে চলে গেল।

পরদিন সকালে বড় ছেলেটি একটু সামলে উঠলো বটে, অনুপমার রোগ আরও বেড়ে গেল। তৃতীয় দিন ভোরে অনুপমার মৃত্যু হলো!

স্ত্রীকে দাহ করে ফিরে আসবার পথে প্রিয়নাথ একখানা খবরের কাগজ দু'আনা দিয়ে কিনে আনলে। বহুদিন পরে সে আজ কাগজ কিনলে—শুধু মনটাকে একটু অন্যভাবে ব্যস্ত রাখবার জন্যে।

বাড়ীতে গিয়ে রকে একখানা মাদুর পেতে প্রিয়নাথ কাগজটা নিয়ে শুয়ে পড়লো। কিন্তু প্রথম পাতা খুলতেই সর্বপ্রথম তার দৃষ্টি গিয়ে পড়লো বড় বড় হরপে ছাপা এই সংবাদটার ওপর—বাংলাদেশে বিমান-হানায় এ পর্যন্ত মোট ২৬ জন নিহত হয়েছে আর আহত হয়েছে ৩৪ জন!

এর ঠিক নীচেই ছিল বড়লাটের এক বেতার-বাণী। তিনি বাংলাদেশের লোকদের অভয় দিয়ে বলেছেন, আর দুশ্চিন্তার কারণ নেই। এখন আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও আফ্রিকা থেকে বহু অস্ত্রশস্ত্র ও লক্ষ লক্ষ সৈন্যসামন্ত ভারতবর্ষে এসে পৌঁছে গেছে। শত্রুদের আর সাধ্য নেই যে ভারতবর্ষের কোন ক্ষতি করে। এ যুদ্ধে আমাদের জয় সুনিশ্চিত!

প্রিয়নাথ কাগজটা আর পড়তে পারলে না। তাড়াতাড়ি বন্ধ ক'রে রেখে বুকের মধ্যে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস চেপে নিলে।

বাড়ীর কর্তা

বৈঠকখানার পাশে যে ছোট ঘরটা তাতে থাকেন মহেশবাবু। ঐশ্বর্য দূরে থাক, বিলাসিতার তুচ্ছতম উপকরণও একটা চোখে পড়ে না কোথাও। এতবড় বাড়ী, যার দোতলা ও তিনতলা মিলিয়ে বারো-তেরোখানা ঘর, তার কর্তা যে ওইভাবে বাস করতে পারেন তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত। বাস্তবিক ঘরটার মধ্যে ঢুকলে মনে হয় না যে এ-বাড়ীর কর্তা ওই মহেশবাবু, আর ওঁরই পয়সায় তৈরী এই প্রাসাদোপম অট্টালিকা! লেক অঞ্চলের ওই অতি আধুনিক পরিবেশের মধ্যে এ যেন একটা সাক্ষাৎ ছন্দ-পতন! খাটো ধুতির ওপর সাদা ফতুয়া গায়ে ও পায়ে একজোড়া চটি দিয়ে মহেশবাবু একটা হাতল ভাঙ্গা ইজিচেয়ারে দিনের বেশীর ভাগ সময় শুয়ে থাকেন মুখে গড়গড়ার লম্বা নলটা লাগিয়ে। আর চোখে চশমা দিয়ে সংবাদপত্র, ধর্মগ্রন্থ প্রভৃতি পড়েন।

বিলাসিতার মধ্যে আছে ওই তামাক খাওয়াটুকু! চাকরি-জীবনের সর্বোচ্চ শিখরে যখন উঠেছিলেন তখন যে তামাক যে দোকান থেকে কিনে খেতেন আজো সেই দোকানের সেই তামাক খাওয়ার অভ্যাসটা শুধু ছাড়তে পারেন নি—যদিও এ নিয়ে স্ত্রী মনোরমার সঙ্গে তাঁর উঠতে-বসতে ঠোকাঠুকি লাগে! মনোরমা বলেন, এত দামী তামাক খেয়ে মিছিমিছি পয়সা পুড়িয়ে দেওয়ার কোন অর্থ হয় না! অর্থ হয় কি না হয় তা নিয়ে বৃথা তর্কাতর্কি করেন না মহেশবাবু। শুধু ফি-মাসে পেন্‌সন্ নিয়ে ফেরবার পথে একেবারে তামাকের ঠোঙ্গা হাতে করে বাড়ী ঢোকেন। অম্বুরী তামাকের সুগন্ধ সমস্ত বাড়ীটার আব্‌হাওয়ার সঙ্গে এমনভাবে মিশে থাকে যে বাড়ীতে পা দিলেই আগে যেন তা স্মরণ করিয়ে দেয় বাড়ীর কর্তার কথা!

কিন্তু ওই পর্যন্ত। যারা আসে তারা নীচের সেই ঘরটার দিকে পিছন করে ওপরে উঠে যায়। মহেশবাবুর স্ত্রী-পুত্র-কন্যা ও নাতিনাতনীদের কলগুঞ্জন মুখরিত সংসার। সেখানে তাদের কত হাসি উচ্ছ্বাস, কত পরিচিত অপরিচিতের নিত্য আনাগোনা! সে যেন একটা স্বতন্ত্র জগৎ, যার সঙ্গে মহেশবাবুর কোন যোগাযোগ নেই। সত্যি, মহেশবাবুকে দেখলে দুঃখ হয়! তাঁর নিজের সংসারে নিজের অস্তিত্বটা এখন বড় অদ্ভুত! এক বিরাট বৃক্ষের মূলের মত তিনি যেন আছেন শুধু অদৃশ্যে, কেউ তাঁকে দেখে না, গ্রাহ্য করে না, অথচ তাঁরই যারা ডালপালা, ফুল-ফল তাদের নিয়ে যত মাতা-

মাত্তি, সংসারের যত প্রয়োজন। এমন কি স্ত্রী, যাঁর ওপর তাঁর দাবি সবচেয়ে বেশী, তিনিও এখন কেমন করে যেন সবচেয়ে বেশী পর হয়ে গিয়েছেন। নাতিনাতনীদের দিয়ে পাঁচবার ডেকে পাঠালেও একবার তাঁর সময় হয় না, ওপর থেকে এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করার। হয় কখনো কাউকে দিয়ে বলে পাঠান, কি দরকার ঠাকুমা বলতে বলে দিয়েছেন—ওঁর এখন সময় হবে না আসবার।

কি দরকার। বলে মহেশবাবু একটু ইতস্তত করে আবার বলেন, না থাক। কোন দরকার নেই। হয়ত বা একটা গভীর নিঃশ্বাস বুকের মধ্যে চেপে নিতে নিতে গড়গড়ার নলটা আবার মুখে তুলে দেন। মনোরমাও সংসারের নানা ঝঞ্ঝাটে সে কথা ভুলে বসে থাকেন, তিনি পরদিন চলে গেলেও হয়ত খেয়াল হয় না কর্তা কেন ডেকে পাঠিয়েছিলেন। ঠাকুর-চাকর আছে—তারা তাঁকে খেতে দেয়, তাঁর ঘর সাফ করে—তাঁর ফায়ফরমাজ খাটে।

শুধু টাকার প্রয়োজন হ'লে আর ডাকতে হয় না মনোরমাকে। একেবারে সোজা স্বামীর ঘরে তিনি এসে হাজির হন। আর কারুর কাছে হাত পাততে তাঁর যেন মাথা কাটা যায়। রোজগারী ছেলে, বিবাহিতা মেয়ে, জামাই, নাতিনাতনী সকলকে যেন তখন পর বলে মনে হয়। অন্ততঃ ঠিক তা মনে না হ'লেও নিঃসঙ্কোচে তাদের কাছে হাত পেতে টাকাপয়সা চাইতে যেন তাঁর কেমন বাধ-বাধ ঠেকে। অথচ তিনি অনায়াসে মহেশবাবুর কাছে গিয়ে জুলুম করার ভঙ্গীতে বলেন, দেখি পঁচিশটা টাকা শিগ্‌গির।

কোথায় পাবো, এত টাকা। পেন্‌সনের টাকা সব ত তোমার হাতে এনে দিয়েছি এর মধ্যে সব খরচা হয়ে গেল ?—বলে মহেশবাবু গড়গড়ার নলটা হাতে টেনে নিতে নিতে তাঁর মুখের দিকে তাকান।

রাগতস্বরে মনোরমা বলেন, খরচ হয়ে না গেলে কি তোমার কাছে আবার টাকা চাইতে আসতুম ?

কিন্তু কিসে এত টাকা খরচ করলে শুনি ? এই ত গেল মাসে সত্তরটা টাকা দিলুম, বললে মেয়েদের কলেজ যাওয়ার ভাল শাড়ী ছিল না বলে ধার ক'রে কিনেছিলে, এখন কাপড়ওলা তাগাদা করছে ! আবার এমাসে কি ?

এবার ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন মনোরমা—তোমার মেজ মেয়ে যে বাচ্ছাকাচ্ছা নিয়ে এসে রয়েছে এখানে আজ একমাস, তা কি চোখে দেখতে পাও না ? তাদের জন্যে যে বেশী দুধ নিতে হয়েছে সে দাম দিতে হবে না ?

তাই বলো। ও মিনু এখানে রয়েছে বটে, ভুলেই গিয়েছিলুম। বলে মহেশ-

বাবু সুড়সুড় করে উঠে গিয়ে বাক্স থেকে পঁচিশটা টাকা এনে স্ত্রীর হাতে গুঁজে দেন।

টাকাটা হাতে নিয়ে এবার মনোরমা বলেন, মেয়েরা বিয়ে হলে পর হয়ে যায় শুনেছি, কিন্তু বাপ-মার কাছে ত তারা চিরকাল তেমনি থাকে! আমি ত কই কোনদিন তাদের ভুলতে পারি না! আর তুমি বাপ হয়ে কি করে যে মেয়ের কথা ভুলে থাকো এভাবে তা ঈশ্বর জানেন! বলতে বলতে মহেশবাবুর ঘাড়ে সমস্ত অপরাধের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যান মনোরমা।

অবশ্য মহেশবাবুকেও এর জন্য দোষ দেওয়া যায় না। মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে অনেকদিন! তাছাড়া যে মেয়ে যেদিন প্রথম বাপের বাড়ী আসে সেদিন একবার বাপের ঘরে ঢুকে তাঁকে প্রণাম করে জিজ্ঞেস করে, বাবা কেমন আছো, তোমার শরীর এখন কেমন? তিনিও তার উত্তরে যথারীতি সংক্ষেপে শুধু এইটুকু প্রতিবার বলেন, আর শরীর! এখন কি আর ভাল থাকার কথা মা—এখন গেলেই হয়!

কি যে বলো বাবা, তোমার এমন কি বয়েস হয়েছে! বলতে বলতে ঘর থেকে বেরিয়ে মেয়েরা সেই যে ওপরে মায়ের ঘরে গিয়ে ওঠে, তারপর আর বাপের সঙ্গে কোন সম্পর্কই থাকে না। মা-ই যেন তাদের সব। মায়ের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া, ওঠা-বসা, সিনেমা দেখা, এখানে ওখানে ট্যাক্সি করে বেড়াতে যাওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি। তারপর যেদিন সেই মেয়ে আবার শ্বশুরবাড়ী যায়, ফটকে ট্যাক্সি এসে দাঁড়িয়ে থাকে, তখন সেজেগুজে বাপের ঘরে ঢুকে একবার টিপ ক'রে একটা প্রণাম ক'রে ভারী গলায় শুধু বলে, বাবা আজ যাচ্ছি!

'এসো মা' বলে তিনি যখন আশীর্বাদ করেন, তখন মেয়ে আক্ষেপের সঙ্গে বলে, একবার ত তুমি আমার ওখানে গেলে পারো বাবা--তোমার জামাই কত দুঃখু করে। বলে এতদিন বিয়ে হয়েছে একবারও এলেন না আমাদের এখানে! মেয়ে-জামাই ত তোমার পর নয় বাবা?

তা ঠিক! আচ্ছা দেখি মা, এবার যাবার চেষ্টা করবো! এই বলে মহেশবাবু বিদায় দেন মেয়েকে! কিন্তু ওইখানেই শেষ! তারপর মেয়েও আর বাপের খবর নেয় না—বাপও মেয়ের কথা ভুলে বসে থাকেন!

ছোট মেয়ে দু'টো বাড়ীতেই আছে কিন্তু তাদের সঙ্গেও তাঁর কোন সম্পর্ক নেই বললেই চলে! তারা কলেজে পড়ে। তাছাড়া তাদের আছে গানের ক্লাস, নাচের স্কুল, সেতার শেখা, জলসা, সিনেমা, ইদানীং আবার অতিরিক্ত উপদ্রব বেড়েছে পুরুষদের মত খেলার মাঠে যাওয়া—আজ ফুটবল, কাল ক্রিকেট, পরশু এম. সি. সি. তার

দরদিন অলিম্পিক ইত্যাদি ইত্যাদি! তারা কখন বাড়ীতে থাকে বা কখন থাকে না, তার খোঁজই রাখেন না মহেশবাবু বা তাঁর রাখবার উপায় নেই! তবু যদি কোনদিন জিজ্ঞেস করেন, হ্যাগো কাল তোমার ছোট মেয়ে সন্ধের পর সেজেগুজে একটি ছোকরার সঙ্গে কোথায় যাচ্ছিল? গিন্নীর কাছ থেকে হয়ত তখনই জবাব আসে, তা জেনে তোমার লাভ কি?

মহেশবাবু গড়গড়ার নলটা মুখ থেকে নামিয়ে নিয়ে বল্লেন, না, মানে ছোকরার চালচলনটা আমার ভাল মনে হলো না, সোমত্ত মেয়ে আমার—ওর সঙ্গে বেশী মেলা-মেশা করাটা আমি পছন্দ করি না! তুমি রেবাকে ডেকে বলে দিয়ো!

ঘর থেকে বেরুতে গিয়ে মনোরমা থমকে দাঁড়িয়ে বলেন, ওমা, তুমি কার সম্বন্ধে কি বলছো জানো? ও যে আমাদের ব্যারিস্টার রায়ের ছেলে অতনু। সামনের সেপ্টে-ম্বরে 'ফুলব্রাইট স্কলারশিপ্' নিয়ে আমেরিকা যাচ্ছে। আমাদের এ অঞ্চলে অমন ভাল ছেলে ক'টা আছে!

মহেশবাবু সব শুনে বললেন, ভাল ছেলে হলেই যে একেবারে ভীষ্ম কি যুধিষ্ঠির হবে তার কি মানে আছে! অপবাদ একটা রটতে কতক্ষণ! তাই বলছিলুম, তুমি মেয়েকে একটু সাবধান করে দিয়ো—অন্ততঃ আমার নাম করে!

তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মনোরমা বলেন, থাক, ও নিয়ে আর তোমায় মাথা ঘামাতে হবে না--তোমার মেয়ে কচি খুকী নয়--আজ বাদে কাল বি. এ. পাশ দেবে। বলতে বলতে তিনি গৃহান্তরে চলে যান।

মহেশবাবুর কর্তৃত্ব এ সংসারে কেউ মেনে না নিলেও তিনি যে বাড়ীর কর্তা, এ বাড়ীর প্রতিটি সুখ-দুঃখের দায়িত্ব যে তাঁর স্কন্ধে, কেউ না মানলেও সেকথা তিনি যেন কিছুতেই ভুলতে পারেন না!

হঠাৎ কোনদিন ডাক্তারবাবুকে ব্যাগ হাতে ক'রে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে দেখলে তাঁর বুকটা ধড়াস্ ক'রে ওঠে। চাকরবাকর বা ছেলেপিলে যাকে সামনে দেখতে পান ডেকে জিজ্ঞেস করেন, এই শোন্, কার অসুখ করেছে রে!

হয়ত শোনেন মেজ ছেলের বড় মেয়েটার প্যারা-টাইফয়েড কিংবা বড় মেয়ের ছোট ছেলেটার বুকে সর্দি বসেছে! নাতিনাতনীর অসুখ শুনে বিচলিত হয়ে পড়েন মহেশবাবু। তখনি মনোরমাকে ডেকে পাঠান। তিন-চার বার ডেকে পাঠাবার পর হয়ত তাঁর সময় হয়, তিনি এক সময় ঘরে ঢুকে বলেন, কি হয়েছে, এত ডাকাডাকি করছো কেন?

মহেশবাবু চিন্তিতমুখে বলেন, হ্যাগা, শুনলাম বাবলুর নাকি বুকে সর্দি বসেছে—

তাই বলছিলুম কি, হোমিওপ্যাথি না দেখিয়ে ভালো একজন এলোপ্যাথকে দেখালে কেমন হয় ?

কোন্ ডাক্তারকে দেখালে ভাল হয় সে তার মা বাপ রয়েছে, তারা বুঝবে— তোমাকে তা নিয়ে কে মাথা ঘামাতে বলেছে তা ত জানি না। তুমি তোমার নিজের চরকায় তেল দাও ! বলে 'মার চেয়ে ব্যেথিনী তারে বলি ডান' ! বলতে বলতে স্বামীর মুখের ওপর একটা তীক্ষ্ণ কটাক্ষ হেনে ঘর থেকে দ্রুত বেরিয়ে যান মনোরমা।

কিন্তু তবু তাঁর ভাবনা যায় না। তিনি ডাক্তারের আসা-যাওয়া লক্ষ্য করেন, তেমনি উদ্বেগের সঙ্গে রোগীর অবস্থা জিজ্ঞেস করে বেড়ান বাড়ীর ছোট-বড় সকলকে !—হাঁরে, কেমন আছে আজ বাব্‌লু ?

ওদিকে বড় বা মেজ ছেলের দর্শন পাওয়াও মহেশবাবুর কাছে একটা দুর্লভ সৌভাগ্য বিশেষ ! যদি কোন কারণে কোনদিন তাদের ডেকে পাঠান ত তারা চেষ্টা করে বাপকে এড়িয়ে যেতে। তারা মনে ভাবে, বাবা বুঝি টাকার তাগাদা করবেন বলে এত ডাকাডাকি করছেন। বড় ছেলে ছোট আদালতে ওকালতী করে। ছেলে মেয়েদের হাওয়া বদলাতে বিদেশে নিয়ে যাবার সময় মহেশবাবুর কাছ থেকে তিন মাসের কড়ারে পাঁচশো টাকা ধার নিয়েছিল কিন্তু তিন বছর কেটে গেছে সেটাকা আজো শোধ দেয়নি ! তাই বাপকে ভুল বুঝে লুকিয়ে বেড়ায়। আর মেজ ছেলে ব্যবসায়ী। বি-এ ফেল করে এক্সপোর্ট ইমপোর্টের কারবার করে। মোটা লাভের অর্ডার দেখিয়ে মহেশবাবুর কাছ থেকে একাধিকবার টাকা চেয়ে নিয়েছে। মোটা লাভও হয়ত সে করেছে কিন্তু মহেশবাবুকে তাঁর টাকা শোধ দেওয়া আজো পর্যন্ত তার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। সবচেয়ে মজা, কোনদিন যদি এ নিয়ে তিনি গিন্নীকে কিছু বলতে যান ত উল্টো ফল হয়। তাড়া দিয়ে ওঠেন মনোরমা। বলেন, ছেলেরা কি তোমার পর যে কাব্‌লীওলার মত তাদের কাছে টাকার তাগাদা দিতে হবে ? যখন তাদের সময় হবে তখন নিশ্চয়ই তারা তোমায় দিয়ে দেবে।

ছেলেমেয়েরা না এলেও নাতিনাতনীরা আসে বৈকি ! এক-একদিন নাতিনাতনী গুলোর জ্বালায় অস্থির হয়ে পড়েন মহেশবাবু। কোনদিন খবরের কাগজটা খুঁজে পান না, কোনদিন বা চশমা, কখনো বা ফাউন্‌টেন্‌পেনটা। হাঁকাহাঁকি, ডাকাডাকি করেন ছোটছেলের নাম ধরে। বাপি, ওরে বাপি ?

তিনতলার চিলকুঠরীতে বসে টেস্ট্ পরীক্ষার পড়া তৈরী করতে করতে ছুটে

নেমে আসে বাপি। তারপর এঘর ওঘর সেঘর খুঁজে খুঁজে কাগজটা এনে দিয়ে যায় মহেশবাবুর হাতে। মহেশবাবু নাতিনাতনীদের শাসন করেন, ফের যদি কোনদিন তোরা কেউ আমার জিনিসে হাত দিবি ত মেরে গায়ের ছাল-চামড়া তুলে দেবো।

ছেলেমেয়েগুলো দাদুকে ভেংচি কাটতে কাটতে তাঁরই কথার পুনরাবৃত্তি করে লুকিয়ে পড়ে আনাচে কানাচে।

একদিন চশমাটা অনেকক্ষণ ধরে খুঁজে না পেয়ে মহেশবাবু একেবারে রাগে অগ্নিমূর্তি হয়ে উঠলেন। একটা নাতির হাত ধরে বললেন, এ নিশ্চয়ই তোর কাজ, শিগ্‌গির বের করে দে কোথায় রেখেছিস, তা না হ'লে মেরে হাড় ভেঙে দেবো!

দাদুর ক্রুদ্ধ মুখের দিকে চেয়ে ভ্যাঁ করে সে কেঁদে ফেললে। তারপর চোখ রগড়াতে রগড়াতে বললে, আমি বুঝি নিয়েছি? তুলু ত নিয়েছিল?

সঙ্গে সঙ্গে তার হাত ছেড়ে দিয়ে মহেশবাবু চীৎকার করে উঠলেন, তুলো—এই তুলো হারামজাদা, শিগ্‌গির শোন্ এদিকে!

শঙ্কর ছুটে গিয়ে সিঁড়ির নীচে থেকে তুলুকে টানতে টানতে এনে হাজির করে দাদুর কাছে। বলে, এই যে দাদু লুকিয়েছিল ও সিঁড়ির তলায়! তারপর তার হাফ-প্যাণ্টের পকেট থেকে শঙ্কর চশমাটা টেনে বার ক'রে যেই মহেশবাবুর হাতে দিলে অমনি তিনি তুলুর কান মলে দুই গালে দুই চড় কষিয়ে দিয়ে বললেন, হারামজাদা, ফের আমার জিনিসে হাত দিয়েছিস্! সেদিন না আমার কলমের নিবটা তুই ভেঙেছিস্?

কাঁদতে কাঁদতে তুলু একেবারে ওপরে মার কাছে চলে গেল।

মা ছেলেকে বুকে টেনে নিয়ে ভোলাচ্ছে এমন সময় হঠাৎ মনোরমা সেখানে গিয়ে পড়লেন। বললেন, কি হয়েছে রে মেজবৌ, ও এত কাঁদছে কেন?

মেজবৌ একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, দেখুন না, বাবা ওকে কি রকম মেরেছেন, দু'টো গাল একেবারে লাল হয়ে উঠেছে। তারপর আবার একটু থেমে আপন মনেই বলে ছেলেকে, তুই যাস্ কেন দাদুর কাছে—দাদু তোকে দু'চোক্ষে দেখতে পারে না, জানিস্ ত?

মনোরমা প্রতিবাদ করে বলেন, ও কি কথা গা মেজবৌ, ওর সামনে ওসব বলতে আছে, ও বালক, ওর কি মনে হবে বল দেখি!

যা সত্যি তা আর কতদিন চেপে রাখব মা! ও বালক বলে কি এটুকু বোঝবার শক্তি ওর নেই! এখনো কি রকম ফোঁপাচ্ছে দেখুন না? বলতে বলতে মুখটা অন্য-দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে আবার গর্জে উঠলো, আমি বরাবর লক্ষ্য করেছি, বাবা একেবারে

আমার ছেলেকে দেখতে পারেন না! কোন অন্যায়, কোন দোষ কেউ করলে, তিনি আগে বলে ওঠেন, এ ঠিক সেই ভুলোব্যাটার কাজ!

ক্রোধে অগ্নিমূর্তি হয়ে তখনি মনোরমা একেবারে মহেশবাবুর ঘরে নেমে গেলেন। তারপর বললেন, তুমি কেন ভুলুকে অমন করে মেরেছো! দিন-দিন তোমার যেন ভীমরতি হচ্ছে!

মহেশবাবু স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে বললেন, বারে, ওরা যা তা অসভ্যতা শিখবে, আর আমি চোখে দেখেও ওদের শাসন করতে পারবো না?

মনোরমা ঝাঁজালো কণ্ঠে বলে উঠলেন, না। এই আমার দিব্যি রইল, আজ থেকে যদি আর কোন ছেলের গায়ে হাত দিয়েছো, তাহ'লে হয় তুমি এ বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাবে, নয় আমি।

এর ওপর আর কোন কথা বলতে না পেরে মহেশবাবু শুধু অস্ফুটস্বরে বললেন, বেশ। তোমাদের ভাল হোক, মন্দ হোক, কখনো সেদিকে আর আমি ফিরেও তাকাবো না। তবে এর ফল পাবে একদিন, মনে থাকে যেন। সেদিন আমি দেখতে আসবো না কিন্তু তখন বুড়োটার শাসনের কি মূল্য বুঝবে হাড়ে হাড়ে।

মহেশবাবু এর পর থেকে চুপ করেই থাকেন, কোন কথা কন না। নিজের ইজি-চেয়ারটায় বসে গড়গড়ার নলটা মুখে দিয়ে ভুড়ুক ভুড়ুক আওয়াজ তুলতে তুলতে কখনো ঝিমোন, কখনো বা খবরের কাগজটা বুকের ওপর দিয়ে নাক ডাকাতে থাকেন। নলটা কিন্তু সব সময়ই তাঁর হাতে ধরা থাকে—তাঁর জীবনের ওই বুঝি শেষসম্বল।

সেদিন চাকরটাকে ডেকে ডেকে তাঁর গলা ধরে গেল। ওরে হারা, কোথায় গেলি, তামাক দিয়ে যা—হারা—ও হারা!

বার আষ্টেক-দশ ডেকেও কিন্তু ও তরফের কোন সাড়া পাওয়া গেল না। এ ব্যাটার গায়েও এ বাড়ীর হাওয়া লেগেছে দেখছি। বলে আবার একটু পরে তিনি 'হারা—ও হারা তামাক দিয়ে যা' বলে বার কতক হাঁক পাড়লেন। তখনো হারাধনের কাছ থেকে কোন উত্তর না পেয়ে তুঁষের আগুনের মত ভেতরে ভেতরে তিনি জ্বলতে লাগলেন। ঘর থেকে বাইরে এবং বাইরে থেকে ঘরে বারকতক পায়চারী ক'রে সবে ইজিচেয়ারটায় হেলান দিয়ে বসেছেন এমন সময় হারাধন কলকে হাতে করে প্রবেশ করলো।

তাকে দেখেই মহেশবাবু একেবারে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন। বললেন, হারামজাদা, আমার ডাক কি তোর কানে যায় না! আমাকে মনিব বলে গ্রাহ্য করিস না—কে ডাকছে ত কে ডাকছে!

হারাধন কি বলতে যাচ্ছিল, সঙ্গে সঙ্গে ধমক দিয়ে তাকে চুপ করিয়ে দিলেন মহেশবাবু। বললেন, চুপরও বদমায়েস কোথাকার, আবার মিথ্যে বলার চেষ্টা হচ্ছে। [illegible] আমি [illegible] বেরিয়ে যা আমার বাড়ী থেকে—এই মুহূর্ত—আমার হুকুম।

চাকর গম্ভীরমুখে সেখান থেকে বেরিয়ে গেল বটে তবে বাইরে নয়। একেবারে সোজা তেতলায় গিন্নীমার ঘরে গিয়ে হাজির হলো। তার মুখ থেকে বাবুর হুকুমের কথা শুনে তখনি দ্রুতপদে নেমে এলেন মনোরমা। তারপর স্বামীর ঘরে ঢুকে গম্ভীর স্বরে বললেন, তুমি নাকি হারাধনকে জবাব দিয়েছো—বলেছো—এক্ষুনি বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে?

মহেশবাবুর রাগ তখনো কমেনি। জোরালো স্বরে বললেন, হাঁ, দিয়েছি ত, ওকে ভয় করব নাকি? ব্যাটা চাকর, তার এত বড় আস্পদ্দা যে ডেকে ডেকে আমার গলা ধরে গেলেও তবু আমার কথার উত্তর দেয় না! মনিব বলে তার মনে এতটুকু 'সমীহ' নেই! এখনি ওর যা মাইনে বাকী আছে ওকে চুকিয়ে বিদেয় ক'রে দাও—ও চলে যাক্।

মনোরমা এবার চড়াস্বরে উত্তর দিলেন, তোমার হুকুম মেনে কাজ করতে গেলে ত আমার চলবে না! বলি তোমার তামাক সাজবার জন্যে ত আর আমি চাকর রাখিনি। সকালবেলা তোমার তামাক সাজাটা আগে না বাসন-কোসন মাজাটা, তাই শুনি? ঠাকুরের ওদিকে উনুন জ্বলে যাচ্ছে তাকে যোগাড় না দিলে ছেলে-মেয়েদেরই স্কুল-কলেজের, আপিস-আদালতের ভাত সময়ের মধ্যে হয় কি করে? বলি, এতটুকু আক্কেল-বিবেচনাও কি তোমার নেই? আমি বলে কতদিন ধরে সাধ্যি-সাধনা করে জামাইবাবুকে খোশামোদ করে তাঁর কাছ থেকে এই চাকরটা আনিয়েছি—এখন তাকে না তাড়ালে তোমার বুঝি চলছে না? বলি ও চলে গেলে আমার সংসারের কাজগুলো কি তুমি করে দেবে?

একটা দুরন্ত রাগ ভেতরে ভেতরে চেপে নিয়ে মনোরমা আবার বললেন, ফের যদি কোনদিন আমার চাকরের ওপর কোন মেজাজ করেছো ত তোমার এক-দিন কি আমার একদিন। উনি বাড়ীর কর্তা—মনিব! শুধু বসে বসে তামাক খাওয়া ছাড়া আর কিছু বোঝেন না! অত যদি তামাক খাবার শখ ত নিজে সেজে খেতে পারো না? তারপর কতকটা স্বগতভাবেই বলে উঠলেন, এত বড় সংসারের কাজ করতে বলে দু'টো লোক হিমসিম খেয়ে যায়—তাই একা ওই হারাধন হাসিমুখে করে দিচ্ছে, তা বুঝি তোমার সহ্য হচ্ছে না? এত যদি অসহ্য বোধহয় ত অন্য কোথাও গিয়ে

থাকো গে। তোমার ওই মনিবগিরি এখানে ফলাতে এসো না, তা আমি স্পষ্টই বলে দিচ্ছি।

মনোরমা ঘর থেকে চলে যেতে চুপচাপ ইজিচেয়ারে শুয়ে মহেশবাবু ভাবতে থাকেন। তাঁর জীবনে কোথায় যেন কি একটা গোলমাল ঘটেছে। তা না হলে একদিন এই বাড়ীর চাকরবাকর থেকে ছেলেমেয়ে, স্ত্রী, মাছিমশা পর্যন্ত তাঁর হুকুমে উঠতো বসতো, অথচ আজ আর তারা কেউ তাঁকে মানে না কেন?

সমাধি-মন্দির

বৈষ্ণবদের শ্রেষ্ঠ তীর্থ যেমন বৃন্দাবন, যুবকদের তেমনি আগ্রা—এই আমার বিশ্বাস। সেখানে হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রীষ্টান, পারসীর মধ্যে কোন ভেদাভেদ নেই। সকল জাতির সকল সম্প্রদায়ের যুবক এক। তাদের এক ধর্ম, এক নাম! সে শুধু নিখিল-বিশ্বের যৌবন! ফুলে ফুলে বিছানো তার পথ, রঙে রঙে ছাওয়া তার আকাশ, গন্ধে বিহ্বল তার সমীরণ, কল্পনায় শিহরিত তার প্রতিটি মুহূর্ত! তাই আগ্রার নাম শুনলে সহসা যুবকদের মন কেমন যেন সকলের অজ্ঞাতে একবার চমকে ওঠে। মৌমাছির পায়ের শব্দে যেমন ফুলের পাপড়ি কাঁপে, সুরের স্পন্দনে যেমন সেতারের তারে তারে মূর্ছনা ওঠে—এ যেন সেই রকমের একটা শিহরণ, যা কেবল অনুভব করা যায়—কিন্তু ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আগ্রা ত নয়, সে যে তাজমহলের দেশ। সম্রাট শাজাহানের দীর্ঘশ্বাসে ভরা রাজত্ব। বিরহ-বেদনার সর্বশ্রেষ্ঠ ইতিহাস। প্রেমকাব্যের বাস্তব রূপ। যুগ যুগ ধরে মানুষ কেবল কেঁদেছে—বিরহে-প্রেমে, কিন্তু কখনো কি দেখেছে সে কান্না কেমন! কি সুন্দর, কি মধুর, কি সুশোভন তার মূর্তি! দেশ-বিদেশে অনেক কাব্যগাথা রচিত হয়েছে এই বিরহ-প্রেমের কাহিনী নিয়ে, আর তারা অমর হয়ে আছে মানুষের বেদনার তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে। কিন্তু সেই সুমহান বেদনাকে কি কেউ কখনো চাক্ষুষ করেছে? পৃথিবীর আর কোন দেশে কি তার কোন প্রমাণ আছে? তাই দেশ-বিদেশ থেকে লোক ছুটে আসে সেই প্রেম-কাব্যের বাস্তব রূপ দেখে চক্ষু সার্থক করতে!

শুধু যুবক-যুবতী নয়, আমি বহু প্রৌঢ়, বৃদ্ধ, অরসিক-অকবিকেও দেখেছি, আগ্রার কথা বলতে গিয়ে যাদের চক্ষু স্বপ্নালস হয়ে ওঠে, কণ্ঠস্বর আবেগে বুজে আসে। বাল্যকালে, কেউ আগ্রায় গিয়েছে শুনলে আমি আর স্থির থাকতে পারতুম না, ছুটে যেতুম শুধু তাদের চোখে দেখবার জন্যে। আমার কাছে তারাই ছিল যেন একটা পরম বিস্ময়ের বস্তু। ছেলেবেলা থেকে কেন জানি না, এই স্থানটি সম্বন্ধে আমার মনে সব চেয়ে দুর্বলতা ছিল। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব বা পাড়ার লোক কেউ আগ্রা দেখে এসেছে শুনলে আমি তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করতুম, কেমন দেখতে সেই তাজমহল, কত বড়, কত সুন্দর? ছবিতে যেমন দেখি, বইয়ে যেমন পড়ি, ঠিক সেই রকম কি?—কেমন দেখতে সেই যমুনা, যার বুকের ওপর তাজ-

মহলের প্রতিবিম্ব দিন-রাত নীরবে ঘুমোয়? ছেলেবেলায় ইতিহাসে যত রকমের কাহিনী পড়েছি—সবগুলো একসঙ্গে তখন মনের দুয়ারে ভীড় ক'রে আসতো। তাদের মনে যেমন লেগেছে তারা তেমনি ভাবে উত্তর দিলেও, আমার কিশোর-মনের কল্পনা বুঝি তাতে পুরিতৃপ্ত হতো না—যেন আরো কিছু চাইতো, আরো কিছু প্রত্যাশা করতো।

এমনি ক'রে যত দিন যায়, আমার মনে আগ্রা সম্বন্ধে তত কৌতূহল বাড়তে থাকে।

অবশেষে একদিন এলো সে সুবর্ণ সুযোগ। তখন আমার বয়স বাইশ কি তেইশ। আমার মনের কুঞ্জবনে সবে ফুল ধরেছে। আগ্রার টিকিট কেটে আমি ট্রেনে চাপলুম।

পরদিন টুণ্ডলা থেকে যখন গাড়ী বদল ক'রে আগ্রার দিকে অগ্রসর হলুম, তখন আমার বুকের সমস্ত শিরা-উপশিরাগুলো যেন কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল, বুঝি এখনি আমার সেই বহু প্রতীক্ষার ধন, সেই পরম প্রিয়ের দর্শন পাবো!—কখন দেখবো তাজমহল? জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকি, সতর্ক দৃষ্টি মেলে।

সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত যেন আমার দৃষ্টি এড়িয়ে না যায়; দূর থেকে যেন সর্বপ্রথম সে আমার চোখে পড়ে।

আর সামান্য দূরে আগ্রা, মাত্র তিনটে স্টেশন।

গাড়ী যতই ছুটে চলে, আমার চোখ তত ব্যাকুল হয়ে কাকে খোঁজে? ধূ-ধূ করছে মাঠ দু'পাশে। পশ্চিমের তৃণলতাহীন বিশুষ্ক প্রান্তর যেন আকাশের সঙ্গে মিশে গিয়েছে। কোন্ দিকে তাজ তা জানি না। কয়েকটি মাত্র যাত্রী আমার কামরায়। তারা বোধহয় সকলেই স্থানীয় লোক। কারো মুখে তাই তাজ দেখবার কোন ব্যাকুলতা নেই। দেখে আমার মনটা দমে গেল। যে যার নিজেদের কাহিনী নিয়েই ব্যস্ত।

প্রথম শরতের নীল আকাশে তখন মধ্যাহ্নের রৌদ্র স্তব্ধ হয়ে আছে। আমার মনে হচ্ছিল যেন আকাশ তার দীর্ঘ নীল নয়ন দু'টি বিস্ফারিত ক'রে চেয়ে আছে এই পৃথিবীতে কা'কে দেখবার জন্যে।

গাড়ী চলেছে তেমনি গতিতে।

সহসা দূরচক্রবালে যেন সাদা মেঘের মত এক টুকরো দেখা গেল। গাড়ীর মধ্যে কে একজন বলে উঠলো উর্দুতে 'উয়ো তাজ'—ওই তাজমহল!

আমার চোখ যেন তখনো বিশ্বাস করতে পারছিল না যে, সত্যিই তারা তাজ

দেখছে। যেন এক টুকরো সাদা মেঘ দূরে—ওই আকাশের কোণে। সেই অমল-ধবল রজত-শুভ্র কান্তি ক্রমশঃ স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠতে লাগল। আমার মনে হলো, এ ত তাজমহল নয়—এ যে এক তন্বী, সুন্দরী যুবতী—নীলওড়না তার গায়ে জড়ানো, আমার দিকে এগিয়ে আসছে। তবে কি ও তাজমহল নয়—ও মমতাজ? সমাধি-মন্দির ছেড়ে কি সে এখনো যায় নি কিংবা ও তারই আত্মার মর্মর রূপ!

যমুনার পুল পেরিয়ে ট্রেন এসে থামল আগ্রা ফোর্ট স্টেশনে। নামলুম সেখানে। তাজমহলের কোল ঘেঁষে চলে গিয়েছে যে যমুনা, তার দিকে চেয়ে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়লো। যমুনার সে জলকল্লোল আর নেই, এক দিন শাজাহানের অশ্রুতে যার দু'কূল করতো ছল-ছল। এখন যমুনা যেন বৃদ্ধা পিতামহীর মত তার কঙ্কালসার দেহখানাকে নিয়ে তাজমহলের মুখের দিকে চেয়ে আছে, আর তার লোলচর্ম কোটরগত চক্ষুতে জমে রয়েছে শেষ অশ্রু।

যমুনার ধার দিয়ে এঁকে-বেঁকে তাজমহল যাবার রাস্তা। তার দু'ধারে ঝাউবন, আর উঁচু উঁচু মাটির ঢিবি পাহাড়ের মত। এ রাস্তাটা বড় অদ্ভুত! যত এগিয়ে যাওয়া যায় তাজমহলের দিকে, তত আর তাকে দেখা যায় না—কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে যায়—শেষে হঠাৎ ফটকের সামনে গেলে যেন চোখের ওপর পরিপূর্ণ মূর্তিতে বিকশিত হয়ে ওঠে! সমগ্র ভাবে দেখতে পাওয়ায় যেমন একটা চমক লাগে, তেমনি সহসা যেন বুকের মধ্যটা দুলে ওঠে—কিসের ব্যথায়!

যাই হোক, সেই রাস্তাটা দিয়ে চলতে চলতে আমার কেবলই মনে হতে লাগল, সম্রাট শাজাহান যখন এই পথ দিয়ে যেতেন—তিনি কি আমার মত তাঁর বুকে এমন স্পন্দন অনুভব করতেন তাজকে দেখতে যাবার সময়?

এমনি করে যেতে যেতে হঠাৎ একেবারে ফটকের সামনে এসে পড়তে মন আর মুখ দুইই একসঙ্গে স্তব্ধ হয়ে গেল। সামনে তাজমহল! নীরব নিস্তব্ধ প্রাঙ্গণ। চারিদিকে মধ্যাহ্নের তপ্তরৌদ্র যেন সচকিত!

আমি চুপ করে সেখানে দাঁড়িয়ে রইলুম। আমার পা যেন নিশ্চল হয়ে গেছে। আমার সম্মুখে শ্বেতমর্মরখচিত যেন এক বিরাট প্রেমকাব্য, ছন্দে মাধুর্যে রূপে রসে অনবদ্য কল্পনাতীত! কারুশিল্পের চরম নিদর্শন তাজমহল। লোক দেখছে বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে। শুধু কি তার গঠন-বৈচিত্র্যে তারা মুগ্ধ! তারা কি ভাবছে, এমন নিখুঁত স্থাপত্যকলা পৃথিবীর আর কোথাও নেই? সেই পাথরের অন্তরালে রয়েছে যে শিল্পীর চোখের জল তারা কি তাকেও অনুভব করছে না আমার মত?

এমনি কত কি চিন্তা করতে করতে আমি ধীর-পদে ভিতরে প্রবেশ করলুম।

আগে বাইরে থেকে তাকে দেখলুম—যত রকমে দেখা সম্ভব। দূরে থেকে, কাছ থেকে, মাঝখান থেকে, কোণ থেকে, ঘুরে ফিরে, দাঁড়িয়ে, বসে সর্বপ্রকারে। দিনের আলোয় তার সবটুকু বাহ্যিক রূপ দু'চক্ষু দিয়ে শুষে নিয়ে তারপর গেলুম ভিতরে।

ভিতরের অত্যাশ্চর্য রূপ দেখে যখন চক্ষু স্তব্ধ, মুখ বাক্যহারা, তখন ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যে ঘরে প্রবেশ করলুম সে যেন তাজমহলের অন্তঃকরণ। আলো-ছায়া দিয়ে তৈরী সেই সুন্দর ঘর—মাটিতে পাশাপাশি দু'টি সমাধি—যেন শাজাহান আর মমতাজ তেমনি ঘুমোচ্ছেন যেমন জীবিত কালেও ঘুমুতেন—শ্বেতপাথরের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কারুকার্য খচিত একটি প্রকাণ্ড জাফ্‌রি দিয়ে ঘেরা মশারীর মধ্যে।

বাগান থেকে কয়েকটা ফুল সংগ্রহ করে পকেটে রেখেছিলুম। 'গাইডটা' সেই-খানে নিয়ে গিয়ে কোন্‌টা কার সমাধি ব'লে একবার চেঁচিয়ে উঠলো তার ভাঙ্গা-ধরা গলায়—'আল্লা-হো-আকবর'।

সঙ্গে সঙ্গে তার কণ্ঠস্বর ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে হতে সেই ঘরের দেওয়ালে দেওয়ালে ঘুরতে ঘুরতে মিলিয়ে গেল সেই হিমশীতল নীরব নিশ্চল পাষাণের বুকে। আমি ফুলগুলো সেই সমাধির ওপর ফেলে দিয়ে মাথা নীচু ক'রে নীরবে অভিবাদন করলুম। আমার মন তখন বলে উঠলো, ধন্য তুমি শাজাহান, ধন্য তোমার প্রেম! কত নবাব, কত সম্রাট, কত রাজা-উজীর এই পৃথিবীতে জন্মেছে, কিন্তু প্রেমের এমন জ্বলন্ত উদাহরণ আর কে রেখে গেছে?

সেই দিনই অপরাহ্নে আগ্রার দুর্গ দেখতে গেলুম। শাজাহানের ঘরে ঢুকে মাথা ঝিম্ ঝিম্ করতে লাগল। যমুনার ওপারে তাজ আর এপারে এই দুর্গ। তবু দিনরাত তাজমহল দেখে বুঝি সম্রাটের আশা মেটেনি, তাই ঘরের দেওয়ালে দেওয়ালে সে অসংখ্য ফুল লতাপাতা চিত্রিত তার মধ্যে এমন ভাবে সব হীরা-মণি-মুক্তা তিনি বসিয়েছিলেন যাতে ওপার থেকে তাজমহলের সম্পূর্ণ ছবিটি তার মধ্যে প্রতিফলিত হয়ে অহর্নিশ তাঁর চোখে বিরাজ করে। ঘুরতে ফিরতে যখন যেদিকে তিনি চাইবেন যেন প্রিয়তমা মহিষীর সেই শুভ্র, নিষ্কলঙ্ক স্মৃতি তাঁর দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে রাখে।

নিঃশব্দে অনেকক্ষণ শাজাহানের এই কক্ষের এক কোণে দাঁড়িয়ে চেয়ে রইলুম ওপারে তাজমহলের দিকে।

সেখান থেকে বেরিয়ে আবার গেলুম তাজ দেখতে। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। অনেক রাত পর্যন্ত বসে রইলুম তাজের পাষাণচত্বরে।

কত রকমে তাজকে দেখলুম তার ঠিক নেই। ঘোর অন্ধকারে দেখলুম, ক্ষীণ চাঁদের আলোয় দেখলুম, সন্ধ্যায় দেখলুম, অধিক রাত্রে দেখলুম,—যত দেখি তত যেন দেখা ফুরোয় না। এ যেন নিত্য নব আবিষ্কার, নিত্য নব বিস্ময়! সুন্দরী রমণীর মত তাকে যখন যে অবস্থায় দেখি যেন চোখ জুড়িয়ে যায়। দেখে দেখে আশা আর মেটে না। অক্ষয় সৌন্দর্য আর অমর প্রেমের সে যেন মহামিলন।

পূর্ণিমার পরিপ্লাবিত জ্যোৎস্নায় তাজ দেখবো, অনেক কালের বাসনা ছিল। কয়েক দিন পরে সে সুযোগ আসতে মন নেচে উঠলো। সন্ধ্যার দিকে দর্শকের ভিড় থাকে বেশী, তাই একটু বেশী রাত করে গেলুম। সেই বিশাল প্রাঙ্গণে অল্প দু-চারটি লোক তখনো আমার নজরে পড়লো। কেউ স্তব্ধ হয়ে তাজমহলের দিকে তাকিয়ে বসে আছে, কেউ নিঃশব্দে শুধু ছায়ার মত পায়চারি করছে, পাছে তাজমহলের স্বপ্ন ভেঙ্গে যায় এই ভয়ে সবাই যেন সশঙ্কিত। কেউ বা যেন শুধু ধ্যানস্থ হয়ে বসে আছে।

আমি ধীরে ধীরে বাগানের যে দিক্‌টা সব চেয়ে নির্জন সেখানে গিয়ে বিলিতী ঝাউগাছের তলায় ছায়ায় অবগুণ্ঠিত একটি শ্বেত পাথরের বেঞ্চিতে বসলুম। সামনে তাজমহল। আশে পাশে যতটা দেখা যায় তার মধ্যে কোন মানুষ দেখতে না পেয়ে মনটা খুশীতে ভরে উঠলো।

শুধু আমার চোখের সামনে সেই তুষারধবল শ্বেত-মর্মরের উপর জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ আলোক-সম্পাতে যে অপরূপ সৌন্দর্যলোকের সৃষ্টি হয়েছিল, আমি তার দিকে চেয়ে যেন সম্মোহিত হয়ে গিয়েছিলুম। মনে হচ্ছিল, এ তাজমহল যেন পৃথিবীর নয়, কল্পনার অতীত কোন্ এক মায়ালোকের স্বপ্নমূর্তি।

কতক্ষণ এই ভাবে বসেছিলুম জানি না, হঠাৎ আমার পাশে একটা ভারী পায়ের আওয়াজ শুনে চমক ভাঙলো। চেয়ে দেখি, আমার পাশে এক শান্ত্রী-পাহারা দাঁড়িয়ে আছে—লম্বা একহারা চেহারা, মাথায় রঙিন পাগড়ি, সর্বাঙ্গে মূল্যবান পোশাক আর কোমর থেকে ঝুলছে চকচকে খাপে মোড়া এক তলোয়ার।

সেই মহাক্ষণে একটা মূর্তিমান বেরসিককে সামনে দেখে সমস্ত মনটা যেন বিষিয়ে উঠলো। কঠিন দৃষ্টিতে একবার তার দিকে চাইতেই সে আমার কাছ থেকে সরে চলে গেল অন্য দিকে।

পরক্ষণেই আমি আমার ভাবরাজ্যে আবার ডুবে গেলাম। কিন্তু একটু পরে দেখি, সেই লোকটি কখন এসে একেবারে আমার বেঞ্চিতে আমারই পাশে বসেছে। আশে

পাশে আরো কয়েকটা বেঞ্চি খালি পড়েছিল, সেগুলোতে না গিয়ে আমায় এই ভাবে বিরক্ত করাতে আমি মনে মনে তার মুণ্ডপাত করতে করতে সেখান থেকে তৎক্ষণাৎ উঠে পড়লুম এবং সেই তলোয়ারধারী শান্ত্রী-পাহারাটির সংসর্গ ত্যাগ করে সম্পূর্ণ বিপরীত দিকের একটা বেঞ্চিতে গিয়ে বসে পড়লুম।

সেখানে বসে বসে আবার তাজের দিকে চেয়ে কখন যে আত্মবিহ্বল হয়ে গিয়েছিলুম জানি না। হঠাৎ আমার কাঁধের কাছে একটা সশব্দ দীর্ঘশ্বাস শুনে চমকে দেখি, সেই মূর্তিমান আবার আমার পাশে। অগ্নিময়ী দৃষ্টিতে এবার তার দিকে তাকিয়ে যেমন উঠে দাঁড়িয়েছি, অমনি সে বলে উঠলো পরিষ্কার উর্দু ভাষায়, কি বাবুজি, আমার উপর কি আপনার গোসা হলো ?

বললুম, হবে না ? এত জায়গা থাকতে একটা মানুষের ঘাড়ের উপর এসে বসলে কোন্ ভদ্দরলোকের মেজাজ ঠিক থাকে ?

সে বললে, একলা আমার ভাল লাগছে না, তাই আপনার কাছে বসতে এলুম।

তার মুখ থেকে এই কথা শুনে সর্বাঙ্গ রাগে জ্বলে উঠলো। বললুম, একলা ভাল লাগছে না তা আমি কি করবো—একটা সঙ্গী কোথাও থেকে ধরে আনলে পারতে।

সঙ্গী! বলে সজোরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেই লোকটা একেবারে চুপ করে গেল। আমারও মুখের কথা যেন সব থেমে গেল। উভয়েই নিস্তব্ধ। কয়েক মূহূর্ত এইভাবে কেটে যাবার পর আমি বললুম, তোমার স্ত্রী নেই ?

সে কোন জবাব না দিয়ে তেমনি নীরব রইল।

বললুম, তা যদি তোমার ভাল না লাগে ত চলে গেলেই ত পারো এখান থেকে।

এইবার সে কথা বললে। বুকের মধ্যে যেন একটা গভীর নিঃশ্বাস লুকিয়ে নিয়ে বললে, এখান থেকে চলে যাবার আমার হুকুম নেই।

হুকুম নেই ? কেন ?

সে তেমনি উদাসকণ্ঠে বললে, আমাদের বেগম-সাহেবা এসেছেন পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় তাজমহল দেখতে। তিনি যতক্ষণ এখানে থাকবেন ততক্ষণ আমাদেরও থাকতে হবে। কোথাও নড়বার উপায় নেই।

বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলুম, বেগম-সাহেবা !

হ্যাঁ, ফের্দৌসগড়ের বেগম-সাহেবা। ফের্দৌসগড়েব নাম শোনেননি ?

বললুম, হ্যাঁ শুনেছি। তুমি বুঝি ওখানে প্রহরীর চাকরি করো ?

মুহূর্ত কয়েক চুপ করে থেকে সে উত্তর দিলে, আমি বেগম-সাহেবার হারেমের খোজা প্রহরী।

খোজা প্রহরী! অস্ফুট স্বরে আমার মুখ দিয়ে এই কথাটা বেরিয়ে পড়লো। এর পর কি প্রশ্ন করবো ভেবে না পেয়ে চুপ ক'রে গেলুম। সেও আর কোন কথা না বলে তেমনি নীরবে বসে রইল।

এই চন্দ্রালোকিত রজনীতে, তাজমহলে এসে একজন খোজা প্রহরীর পাশে বসে আছি, এই কথাটা মনে করে তখন কেমন যেন গা-টা ঘিন্-ঘিন্ করে উঠলো। পরক্ষণে আমি সেখান থেকে উঠে দূরে আর একটা বেঞ্চিতে গিয়ে বসলুম। সেই বেঞ্চিটা ছিল কতকগুলো ঝাউগাছের ঝোপের আড়ালে। সে আমাকে উঠে যেতে দেখে আর কোন কথা জিজ্ঞেস করলে না, শুধু তেমনিভাবে বসে কি যেন ভাবতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে আবার আমার পাশে তার উপস্থিতি অনুভব ক'রে অস্বস্তি বোধ করতে লাগলুম। কেমন করে কখন নিঃশব্দে সে যে আমার পাশে এসে বসেছে জানতে পারিনি। কিন্তু এবার বিরক্তিভরা মুখে তার দিকে তাকাতে গিয়ে স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে রইলুম। এ ত সেই খোজা প্রহরী নয়—এ যে এক তন্বী সুন্দরী যুবতী! চোখে তার বিলোল কটাক্ষ, কণ্ঠের বঙ্কিম ভঙ্গীতে পুরুষের হৃদয়ে বিদ্যুতের প্রবাহ খেলে যায়—মাথায় কালো চুলের রাশ।

আমার বিমুগ্ধ চোখের ওপর তার দৃষ্টি স্থাপিত করে সে মৃদুকণ্ঠে বললে, বাবুজি, আমি খোজা নই, আমি জেনানা!

বললুম, সেকি! নবাবদের হারেমে ত জেনানা প্রহরী থাকে না!

সে এইবার আর একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেললে। বললে, তা ঠিক, তবে আমি জোর ক'রে খোজা সেজে আছি, কেউ জানে না যে আমি জেনানা।

এই কথা শুনে আমার বিস্ময় আরও বেড়ে গেল। বললুম, স্ত্রীলোকের পক্ষে খোজা কি জোর ক'রে সেজে থাকা সম্ভব!

সে উত্তর না দিয়ে চুপ ক'রে রইল। আমিও তার মতন কিছুক্ষণ নীরব থেকে আবার প্রশ্ন করলুম, তোমার যদি কোন আপত্তি থাকে ত বলো না।

এইবার সশব্দে একটা নিঃশ্বাস ফেলে সে বললে, বাবুজি, তুমি যদি কোন দিন কাউকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতে, তাহ'লে বুঝতে পারতে তার জন্যে সব কিছুই করা যায়!

বললুম, তার মানে? তুমি ত বেগমের হারেমে থাকো?

সে বললে, হ্যাঁ, বেগমের হারেমে এই চাকরি নিয়েছি শুধু নবাবজাদাকে চোখে দেখতে পাবো বলে।

বললুম, তুমি কি তাহ'লে নবাবকে ভালবাস ?

সে বললে, হ্যাঁ।

কিন্তু কেমন ক'রে তা সম্ভব হ'লো ?

সে বললে, তরুণ নবাব যখন ঘোড়ায় চেপে আমার কুটিরের সামনে দিয়ে প্রত্যহ ভোরে বেড়াতে যেতেন, আমি তখন ঘুম ভেঙ্গে উঠে জানালার পাশে বসে তাঁকে দেখতুম। তারপর একদিন কেমন ক'রে যে তাঁকে আমার সমস্ত প্রাণমন এই দেখার ভেতর দিয়ে সমর্পণ করেছিলুম জানি না। যেদিন থেকে তিনি সেই পথে যাওয়া বন্ধ করলেন, সেইদিন থেকে আমি অনুভব করলুম যে, তাঁকে চোখে না দেখলে আমি কিছুতেই বাঁচবো না। তাই এই খোজা প্রহরী সেজে হারেমের চাকরি নিয়েছি। উঃ, সে যে কি যন্ত্রণা! আমার চোখের সামনে তিনি বেগম-সাহেবাদের ঘরে যান, তাও আমি সহ্য করি, কিন্তু তবু—ওঁকে না দেখলে কিছুতেই বাঁচতে পারবো না! তাই সুদীর্ঘ বারো বছর কেটে গেছে আমি এখনো এ চাকরি ছাড়তে পারিনি। এই বলে সে যেন উদ্‌গত অশ্রু সংবরণ করতে করতে সেখান থেকে উঠে পড়লো এবং দ্রুতপদে এক দিকে চলে গেল।

আমি বজ্রাহতের মত সেখানে বসে রইলুম। তাজমহল তখন আমার চোখের সামনে থেকে কোথায় যেন বিলুপ্ত হয়ে গেল। আর তার স্থলে জেগে উঠল সেই খোজা প্রহরিণীর মূর্তিটি, যেন সেই পাথরে গাঁথা ইমারতের আত্মা ঐ প্রহরিণীর রূপ পরিগ্রহ করে আমার চোখের সামনে এসে দাঁড়ালো।

সেদিন সারা-রাত আমার চোখে ঘুম এলো না। মনে হলো, এমনভাবে আমার মত বোধ হয় পৃথিবীতে আর কেউ তাজমহল দেখেনি!

ছায়াসঙ্গিনী

স্কুলের মধ্যে হরিবিলাসবাবুই সবচেয়ে ছাত্রদের প্রিয়। আরো পঁচিশজন শিক্ষক আছেন কিন্তু ছেলেরা এমন সহজে আর কারুর সঙ্গে মিশতে পারে না। হরিবিলাস-বাবুরও ছাত্রদের ওপর যেন পুত্রাধিক স্নেহ। খেলাধূলা, ম্যাগাজিন, লাইব্রেরী, পুয়োর ফণ্ড, ডিবেটিং ক্লাব, কো-অপারেটিভ স্টোরস্ প্রভৃতি যত রকমের উৎপাত সবই তিনি সহাস্যবদনে বহন করেন। ক্লাসের ছুটির পর আর কোন শিক্ষক যখন স্কুলে থাকতে রাজী হন না তখন তিনি কিন্তু কোন আপত্তিই করেন না। ছোট ছোট ছেলেগুলি তাদের ঔৎসুক্যভরা চোখ তুলে যখন তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থাকে, তখন তিনি যেন অন্তরে কেমন এক অনাস্বাদিতপূর্ব্ব পুলক অনুভব করেন—তাঁর মনে হয় তিনি যেন কোন প্রস্ফুটিত পুষ্পকাননের মধ্যে দাঁড়িয়ে দিশেহারা হয়ে গেছেন। তাঁর প্রতি ছাত্রদের এই অহেতুক প্রীতি লক্ষ্য ক'রে অন্য শিক্ষকরা যে অন্তরে ঈর্ষা অনুভব না করেন তা নয়, কিন্তু বাজে ঝক্কির হাত থেকে নিস্তার পান বলে মনে মনে তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে কেউ কেউ বলেন, তা আপনি অবিবাহিত লোক—মাগ নেই, ছেলে নেই, সংসার নেই, পেছনে আর কোন টান নেই, আপনারই ত এসব করা পোষায়।

এতগুলি বাজে কাজ সব একজনের ঘাড়ে তুলে দিতে বোধকরি হেডমাস্টার মশাইয়েরও একটু চক্ষুলজ্জায় বাধে, তাই তিনি মধ্যে মধ্যে সলজ্জকণ্ঠে বলেন, ছেলেরা সব আপনাকে চায়, কি করি বলুন দেখি হরিবিলাসবাবু—অথচ আপনিই বা একলা এত কাজ পেরে উঠবেন কেমন করে সেটাও ত আমার দেখা কর্ত্তব্য ?

হরিবিলাসবাবু তাঁর সদাহাস্যময় মুখখানি উঁচু করে বলেন, তাতে কি হয়েছে—ছেলেরা যদি আমায় চায় ত নিশ্চয়ই আমি সব ঘাড় পেতে নেবো—আমারও যে সেটা কর্ত্তব্য মাস্টারমশায় ?

বাস্তবিক কথাটা মিথ্যে নয়। যেই নতুন কিছু একটা স্কুলে হবার কথা ওঠে, অমনি ছেলেরা একবাক্যে প্রস্তাব করে হরিবিলাসবাবুর নাম। শীত নেই, গ্রীষ্ম নেই, বর্ষা নেই, এমন কি রবিবার পর্যন্ত নেই, স্কুল বুকে ক'রে পড়ে আছেন তিনি। সমস্ত প্রাণ যেন তিনি ঢেলে দিয়েছেন এই স্কুলের প্রতি অণুতে পরমাণুতে। ছেলেদের নিয়ে তিনি মেতে থাকেন দিনরাত। বন্ধুর মত তিনি তাদের সঙ্গে ব্যবহার করেন—যেমন কোন্ দিক্ দিয়ে সেক্রেটারীকে ধরলে কবে ছুটি বা 'হাফহলিডে' আদায় করা

যায় তার সন্ধান দিয়ে দেন, তেমনি আবার কেমন ক'রে দরখাস্ত লিখতে হয় তার খসড়া পর্যন্ত গোপনে করে দেন ছেলেদের। ছেলেরা যদি স্কুলের কোন ব্যাপারের ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে স্ট্রাইক করে, তখন তিনি ছাড়া আর কেউ তা থামাতে পারেন না। আশ্চর্য্য প্রভাব তাঁর ছেলেদের উপর। ছেলেরা তাঁর কথায় ওঠে বসে!

ভবানীপুর অঞ্চলে এই স্কুলটিতেই ছেলে সবচেয়ে বেশী! কাজেই প্রতিপত্তিও হরিবিলাসবাবুর এখানে সর্বাধিক। শুধু তাই নয়, বহু ছেলের বাড়ীর সঙ্গেও তাঁর খুব ঘনিষ্ঠতা। অভিভাবকরা এমন কি বাড়ীর মেয়েরাও অনেক স্থলে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। তাঁদের কেউ বলেন মাস্টার মশাই, কেউ ছেলে, কেউ ভাই, কেউ বা শুধু তাঁর নামকে দু'ভাগ ক'রে প্রথমার্ধ বা দ্বিতীয়ার্ধের সঙ্গে বাবু যোগ করে ইচ্ছামত ডাকেন। ফলে অসুখ করলে তাঁর ডাক্তারের ফি লাগে না ওষুধ কিনতে হয় না; উকিলের প্রয়োজন হ'লেও বিনা পয়সায় হয়, এমন কি কাপড়-জামাও 'কন্‌সেসন্ রেটে' পান। এর জন্যে তাঁকে কিছুই করতে হয় না, ছাত্ররাই সব ব্যবস্থা করে দেয়। তাছাড়া আজ পৈতে, কাল অন্নপ্রাশন, পরশু জন্মদিন—এতো আছেই হামেসা। একজন না একজন ছাত্রের বাড়ী তাঁর নেমন্তন্ন লেগেই থাকে। কিন্তু কেবল একটা জায়গায় ছিল তাঁর দুর্বলতা! বিয়ের নিমন্ত্রণ হ'লে তিনি কোথাও খেতে যান না। সে যেন তাঁর ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা। ছাত্ররা পরের দিন যখন ঔৎসুক্যভরা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, স্যার কাল আমাদের বাড়ী গেলেন না কেন? একটু থেমে তিনি উত্তর দেন, শরীরটা ভাল ছিল না রে।

ছাত্রদের ওই কথা ব'লে ভোলানো চলত বটে শিক্ষকরা কিন্তু তাঁকে খোঁচা মারতে ছাড়তেন না। কেউ বলতেন, কি হরিবিলাসবাবু, বিয়ের নেমন্তন্ন খেলেও কি কৌমার্য ভঙ্গ হয়? কেউ বা বলতেন, না, না, বিয়ে দেখলে ওঁর যে বিয়ের বয়স উত্তীর্ণ হয়ে গেছে এবং আর কেউ ওঁকে মেয়ে দেবে না এই কথা মনে পড়ে যায়, ফলে আহারের আর রুচি থাকে না—তাই বিয়ে বাড়ী উনি সর্বদা এড়িয়ে চলেন। হেড-পণ্ডিত সুরসিক। তিনি সংস্কৃত কাব্য থেকে একটি শ্লোক উদ্ধৃত ক'রে বলেন, 'ইহাকে দেখিয়া কি তাহার কথা মনে পড়ে'? না, ব্যর্থ প্রণয়? বলুন না হরিবিলাসবাবু, আমরা ত আর মেয়ের বাপের কাছে সে খবর দিতে যাচ্ছি না!

তিনি সহকর্মীদের সব রসিকতাই হাসিমুখে সহ্য করতেন। আবার কখনো কখনো অল্প কথায় এমন উত্তর দিতেন যে তাঁদের সমস্ত সন্দেহ নিমেষে ধূলিসাৎ হয়ে যেতো। এইভাবে হেসে সকলের কাছে আসল ব্যাপারটা গোপন করলেও তিনি বুঝি নিজের কাছে লুকোতে পারতেন না। তাই বিয়ের উৎসব, বিয়ের বাঁশী, বিয়ের নাম শুনলে,

তিনি সেখান থেকে পালিয়ে গিয়ে বাঁচতেন বটে, তবে সেদিন সারারাত তাঁর চোখে এক ফোঁটা ঘুম আসতো না। বিয়ের সঙ্গে যেন কিসের একটা করুণ স্মৃতি জড়ানো ছিল!

লোকে কথায় বলে—'কারণ ছাড়া কার্য হয় না।' এই প্রবাদ বচনটি যে কতদূর সত্য তা হরিবিলাসবাবুর অতীত জীবনের দিকে চাইলে বেশ বোঝা যায়। আজ তিনি অতি নিষ্ঠাবান স্কুল মাস্টার ও আদর্শ শিক্ষাব্রতী হলেও একদিন কিন্তু তা ছিলেন না। সাধারণ লোকের মত একটা পাশ ক'রে পল্লীগ্রাম থেকে কলকাতায় আসেন চাকরি করতে। বাড়ীর অবস্থা তাঁর একেবারেই ভাল ছিল না। গৃহশিক্ষকরূপে এক সজাতির গৃহে থেকে তাই তিনি এক মার্চেণ্ট অফিসে চল্লিশ টাকা মাইনের চাকরি করতেন। গৃহস্বামীর একটি রূপবতী কন্যা ছিল, তার নাম সুরমা। হরিবিলাসবাবু তাকে রমা বলে ডাকতেন। ক্রমশঃ তাঁদের মধ্যে প্রণযেব সঞ্চার হয় এবং তিনি তাকে বিয়ে কববার জন্যে পাগল হয়ে ওঠেন। সুরমার মায়ের এতে মত ছিল, কিন্তু তার বাবা কিছুতেই রাজী হলেন না। পাত্র অল্পশিক্ষিত, এই হলো তাঁর অমতের কারণ। এর অল্প দিন পরেই বি-এ পাশ করা অতি সুদর্শন এক জমিদার পুত্রের সঙ্গে সুরমার বিয়ে হয়ে গেলো। সে আজ প্রায় আঠারো বছর আগের কথা। তারপর পৃথিবীতে যেমন অনেক পরিবর্তন ঘটেছে, তেমনি সেই হরিবিলাসবাবুও আর পূর্বের মত নেই। তিনি এখন আর সদাগরী অফিসের কেরাণী নন, দস্তুরমত এম-এ, বি-টি, বি-এল। অশিক্ষিত নন, পূর্ণ শিক্ষাপ্রাপ্ত। মাঝে অবশ্য বিয়েব জন্য অনেক পাত্রীর পিতা তাঁকে তাড়া করেছিলেন এবং বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনরাও অনেক চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কোন ফল হয়নি। যদিচ বাঙালীর ঘরে ছেলের বিয়ের বযেস কখনই যায় না, তবু তিনি যে আর কোনদিন বিয়ে করবেন না, এ সম্বন্ধে কেন জানি না সকলেই ছিল একমত। তিনি আদর্শ-চরিত্র শিক্ষক—সবাই তাঁর হৃদয় মাধুর্যে মুগ্ধ! তাঁর চরিত্রে কোন কলঙ্কের দাগ তখনো পর্যন্ত পড়েনি এবং তা কেউ কোনদিন কল্পনাও করতে পারে না। শত্রু-মিত্র সবাই তাঁর চরিত্রের প্রশংসায় মুখর।

দিনরাত তিনি কাজের মধ্যে ডুবে থাকেন। স্কুল-শিক্ষক ছাড়াও তিনি ছিলেন একজন আদর্শ দেশসেবক—কংগ্রেসকর্মী। সারাজীবন এইভাবে দেশসেবা করে এবং জাতির ভবিষ্যৎ বংশধরদের মানুষ ক'রে জীবনটা কাটিয়ে দেবেন, এমনি ছিল তাঁর মনের দৃঢ় সঙ্কল্প! বাস্তবিক এই রকম একটা ব্রত গ্রহণ না করলে তিনি নিজেকে কখনো স্কুলের কাজে এভাবে উৎসর্গ করতে পারতেন না।

কিন্তু মানুষের মন দুর্জ্জেয়। কখন কোথায় তার ভাঙাগড়া চলে তা বুঝি সে নিজেও জানে না—বোঝে না। তাই একদিন খবরের কাগজে মফঃস্বলের কোন এক স্কুলে একজন শিক্ষকের পদ খালি আছে এই বিজ্ঞাপনটি চোখে পড়তে হঠাৎ তিনি এক দরখাস্ত ক'রে বসলেন এবং ডাকে চাকরি হওয়ার খবর আসতে একেবারে এখানকার স্কুলে ইস্তফা দিলেন। কলকাতার সহরের এমন নাম-করা স্কুলে দীর্ঘ বারো বৎসর সগৌরবে ও সুনামের সঙ্গে শিক্ষকতা করতে করতে বিনা কারণে কেন যে তিনি সুদূর পল্লীগ্রামের স্কুলে কম বেতনে এবং নিম্নতম সাধারণ শিক্ষকরূপে গেলেন তা বুঝতে না পেরে সবাই বিস্মিত হলো। এ যেন বিনা মেঘে বজ্রাঘাত! হেডমাস্টার হরিবিলাসবাবুকে অনেক অনুরোধ করলেন, সেক্রেটারী অনেক বোঝালেন কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। অচল অটল তাঁর প্রতিজ্ঞা। তখন সহকর্মী অন্যান্য শিক্ষকেরা 'কমনরুমে' বলাবলি করতে লাগলেন, বেশী দিন বিয়ে না করলে এই রকমই হয়—এসব 'ডিপ্রেসন্'-এর লক্ষণ, অবদমিত চেতনে মানুষ কখন যে কি ক'রে বসে তার কি ঠিক-ঠিকানা আছে?

যে কোন জ্ঞানী-গুণীর কাছে হরিবিলাসবাবুর এই কাজ শুধু খামখেয়ালিপনা ছাড়া আর কিছুই মনে হ'তে পারে না। হয়ত তাই। হরিবিলাসবাবুও তা জানেন। তবু তাঁর মত বিদ্বান, বুদ্ধিমান, আদর্শ-চরিত্র দেশহিতব্রতী ব্যক্তি যখন এমন একটা কাজ ক'রে বসলেন তখন তার পিছনে কোন যুক্তি নিশ্চয়ই ছিল—যার অর্থ হয়ত বাইরের পৃথিবীর চোখে ধরা না পড়লেও তাঁর নিজের কাছে তা ছিল অখণ্ডনীয়, অনতিক্রম্য।

যাই হোক, স্কুল থেকে বিদায়-অভিনন্দনের পালা চুকিয়ে বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্রদের বহু উপহার সুটকেসের মধ্যে ভরে নিয়ে একদিন অপরাহ্ণে হরিবিলাসবাবু হাওড়া জেলার এক সুদূর পল্লীতে, মার্টিন কোম্পানীর ছোট রেলে চেপে এসে হাজির হলেন। তারপর সেই গ্রামের জমিদার—যিনি সেক্রেটারী, তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন। বিজ্ঞাপনে লেখাই ছিল যে থাকা ও খাওয়া ফ্রি। সেক্রেটারীবাবু প্রথমেই তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে নিজের বাড়ীর বৈঠকখানায় নিয়ে গিয়ে বসিয়ে বললেন, গরীবের এই ঘরেই আপনাকে কষ্ট করে থাকতে হবে, আপনার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাও আমার এখানে। তা বলেই অন্য প্রসঙ্গে ফিরে গেলেন, ভবানীপুরে আমার ভায়রাভাইয়ের বাড়ী—তাঁর কাছে আপনার সব খবর শুনলুম। বাস্তবিক আপনার মত লোককে যে আমাদের গ্রামের এই দরিদ্র স্কুলে কোনদিন পাবো তা কল্পনাও করতে পারিনি। আপনার যোগ্য সমাদর করবার ক্ষমতা আমাদের স্কুলের নেই, তবু আপনি একজন দেশসেবী

ও শিক্ষাব্রতী বলেই আপনাকে বলতে সাহস করেছি যে আপনার পদার্পণে যেন কেবল স্কুল নয় আমাদের গ্রামেরও উন্নতি হয়। গ্রামের শিক্ষক আমাদের স্কুলে সব —বাইরের খবর তারা বিশেষ কিছু রাখেন না—তাই আমাদের স্কুল একটু 'ব্যাক-ওয়ার্ড' সব বিষয়ে।

ইতিমধ্যে খবর পেয়ে বৃদ্ধ হেডমাস্টার মহাশয় ও আরো কয়েকজন শিক্ষক এবং কতকগুলি ছাত্র সেখানে এসে হরিবিলাসবাবুকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিলেন। হেডমাস্টার মহাশয় সেক্রেটারীর কথারই সুর টেনে বললেন, আপনাকে একটু সবদিকে চোখ রাখতে হবে। আগে ত জমিদারবাবু নিজেই স্কুলে পড়াতেন এবং ছেলেদের যাতে উন্নতি হয় সে সব নিয়ে মাথা ঘামাতেন কিন্তু এখন আর ওঁর মোটে সময় হয় না, তাই আপনাকে আনানো হয়েছে।

জমিদারবাবু সগর্বে একবার সকলের দিকে চেয়ে বললেন, বিষয় সম্পত্তি এখন হয়েছে যেন বিষ! দিনরাত মামলা-মোকদ্দমা, কোর্টে ছুটোছুটি না করলে বিষয় সম্পত্তি রক্ষা করা দায়! তাই পেটের চিন্তা করবো না স্কুল দেখবো, কোন্‌টা আগে করি বলুন ত?

এমন সময় একটি বছর আষ্টেকের ফুটফুটে মেয়ে এসে জমিদারবাবুর হাতে মুখটা ঘষতে ঘষতে বললে, বাবু, তোমাকে মা ডাকছে।...চলো শিগ্‌গির—দেরি করছো কেন? এই বলে হাতটা ধরে টানতে লাগল।

চুপ করো বাবা, দেখছো একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছি, বিরক্ত করো না।

একটু পরে আবার 'চলো না বাবা' বলতে বলতে সেই চঞ্চলা মেয়েটি একবার আড়চোখে হরিবিলাসবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে আবার মুখটা ঘুরিয়ে নিলে।

যাচ্ছি, একটু চুপ করো বাবা—বলে আবার তিনি হরিবিলাসবাবুর সঙ্গে পূর্ব প্রসঙ্গের জের টেনে শুরু করলেন—হাঁ, তাই আপনাকে—

হরিবিলাসবাবু তখন তাঁর কথায় কান না দিয়ে মেয়েটির মুখের দিকে হাঁ ক'রে চেয়েছিলেন—সেই চোখ, সেই মুখ অবিকল—কথা বলার ভঙ্গীটা পর্যন্ত ঠিক সুরমার মত। সে কি এখন তাঁকে চিনতে পারবে? কতদিনের কথা! তাছাড়া তাঁর নিজের চেহারার এখন কত পরিবর্তন হয়েছে—

এই সব কথা ভাবতে ভাবতে সহসা তিনি জমিদারবাবুর কথার মাঝখানেই বলে ফেললেন, এইটি বুঝি আপনার বড় মেয়ে?

ঈষৎ ম্লান হেসে তিনি বললেন, বড়?—না—হ্যাঁ, তবে এইটিই উপস্থিত বড়। বলে মুহূর্ত কয়েক চুপ ক'রে থেকে তিনি আবার বললেন, ছেলে-মেয়ে আমার সবসুদ্ধ

ছ'টি হয়েছিল, কিন্তু তার মধ্যে এখন দু'টিতে ঠেকেছে—এইটি মেয়ে, আর ছেলেটি ক্লাস সিক্সএ পড়ে। সে ফুটবল ম্যাচ খেলতে গেছে, এখনো ফেরেনি।

খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনটি পড়তে পড়তে শুধু জায়গাটির নাম শুনে সর্বপ্রথম হরিবিলাসবাবুর সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিল। বহুদিনের ভুলে-যাওয়া বিস্মৃত এক রাগিণী সেদিন যেন কে তাঁর কানের কাছে আবার গেয়ে উঠেছিল নতুন সুরে। মধু-মালতীপুর! শুধু সুরমার যে ওই গ্রামে বিয়ে হয়েছে এই কথাটাই তখন বার বার তাঁর মনের মধ্যে গুঞ্জন করে ফিরতে লাগল। তাঁর স্বামীর নাম তিনি জানতেন না, তবে তিনি যে জমিদার এই কথাটা মনে ছিল। তাই জমিদারের স্কুল শুনে তাঁর মনে সহসা কিসের একটা আকাঙ্ক্ষা যেন তীব্র হয়ে উঠেছিল। যেমন করে হোক তাঁকে সেখানে যেতে হবে। তিনি আকাশ-পাতাল ভাবতে থাকেন, আর যত ভাবেন তত তাঁর মন টানে সেই গ্রামটির দিকে। মধুমালতীপুর—মধুমালতীপুর! কি সুন্দর নাম! কি মধুর নাম! আহারে তাঁর রুচি চলে গেল, রাত্রে নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটলো। অবশেষে হঠাৎ তিনি একদিন তাঁর কর্তব্য স্থির করে ফেললেন এবং স্কুলের চাকরিতে জবাব দিয়ে বসলেন।

কিন্তু ভগবান যে তাঁকে এইভাবে সত্যিসত্যি সেই জমিদারবাবুর বাড়ীতেই থাকবার ও খাবার ব্যবস্থা করে দেবেন এবং সেই জমিদারবাবুই যে সুরমার স্বামী, এই কথা চিন্তা করতে তাঁর সর্বশরীর যেন বার বার রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো। সুরমার কন্যাকে চোখে দেখে তার মায়ের কত কথা হরিবিলাসবাবুর মনে পড়তে লাগল। সে কতদিনের কথা! তবু তার প্রত্যেকটি এখনো তাঁর মনে পড়ছে, এখনও তিনি ভোলেননি। কত লুকোচুরি ক'রে দেখা। শুধু দুটো কথা বলার জন্যে দুজনের কত ছল, কত ফাঁদের অবতারণা।......একদিন রাত্রে তাঁর ঘরে যেখানে জানলা দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়েছিল, ঠিক সেইখানটায় সুরমা ছিল দাঁড়িয়ে। আর তিনি ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে তার দু'খানি কুসুমপেলব হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বলেছিলেন, সুরমা, তুমি আমায় বিয়ে করবে? সুরমার গাল দু'টি মুহূর্তে গোলাপী হয়ে উঠেছিল, হাত দুটি তাঁর হাতের মধ্যে একবার ঈষৎ কেঁপেও উঠেছিল, তারপর লজ্জাবনতমুখে সে শুধু বলেছিল, আমার মতে ত বিয়ে হবে না বিলাসদা।

হরিবিলাসবাবু আর চিন্তা করতে পারলেন না। সুরমাকে একবার চোখে দেখার জন্য তখন তাঁর সমস্ত মন যেন তৃষিত হয়ে উঠলো। তাই তিনি উপস্থিত

শিক্ষক-মণ্ডলী ও সেক্রেটারী মহাশয়ের সঙ্গে গ্রামের স্বাস্থ্য কিরকম, কত লোক, ধান-চাষের অবস্থা কেমন ইত্যাদি ইত্যাদি আলাপ-আলোচনা জুড়ে দিলেন, কেবল নিজেকে তার মধ্যে লুকিয়ে রাখবার জন্যে। ঠিক জায়গায় যখন এসে পড়েছেন, তখন একদিন না একদিন তাকে চোখে দেখতে পাবেন-ই—শেষে এইভাবে তিনি তাঁর মনকে প্রবোধ দিলেন।

পল্লীগ্রামের জমিদার! এককালে ঐশ্বর্য খুবই ছিল। কিন্তু এখন শুধু নামে তাল-পুকুর আছে। ভগ্নপ্রায় বিরাট অট্টালিকাই একমাত্র তার সাক্ষী। হরিবিলাসবাবু বৈঠক-খানায় থাকেন—ভিতরের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই। ছ'মাস কেটে যাবার পরও তাই হরিবিলাসবাবুর ভাগ্যে দেবীদর্শন ঘটলো না।

এ দিকে যত দেরি হয়, তত তাঁর সাধনাও যেন কঠোর হয়ে ওঠে। তিনি স্কুলের পেছনে দিবারাত্রি যেমন খাটতে শুরু করলেন, তেমনি পল্লীতে জনহিতকর নানা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে তার উন্নতিকল্পে উঠে পড়ে লাগলেন। 'অনাথ ভাণ্ডার' 'ছাত্রসঙ্ঘ' 'পল্লীমঙ্গল সমিতি' 'জাতীয় প্রতিষ্ঠান' প্রভৃতি দেখতে দেখতে ছাত্রদের ও পল্লীবাসীদের উৎসাহে যেন জ্বলে উঠলো। সকলেরই মনে জাগলো নতুন প্রেরণা, নতুন উদ্দীপনা! গ্রামের ছেলেবুড়ো সবারই মুখে শুধু হরিবিলাসবাবুর নাম। এদিকে স্কুলেও স্পোর্টস, ম্যাগাজিন, ডিবেটিং ক্লাব প্রভৃতি স্থাপন ক'রে তিনি ছাত্রদের প্রিয় হয়ে উঠলেন।

জমিদারবাবুর আনন্দ আর ধরে না। এ রকম একজন লোক গ্রামে থাকলে যে তার উন্নতি অবশ্যম্ভাবী, সে সম্বন্ধে তাঁর মনে আর কোন দ্বিধা রইল না। তিনি হরি-বিলাসবাবুর হাতে আরো কিছু টাকা দিয়ে বললেন, গ্রামে একটা লাইব্রেরী করুন। তাতে যেসব বই রাখলে দেশের পক্ষে কল্যাণকর হয় আপনি নিজে তার ব্যবস্থা করুন।

সুরমার কিন্তু এত বাড়াবাড়ি ভাল লাগে না। স্বামীর মুখে অনবরত ওই আদর্শ শিক্ষক হরিবিলাসবাবুর কথা শুনতে শুনতে তার যেন বিরক্তি ধরে যায়। সে বলে, তা এইবার ঐ মাস্টারকে ঠাকুরের মত কাঁধে তুলে তুমি ধেই ধেই করে নাচো, তাহ'লে লোকে বুঝবে যে এমন মানুষ আর হয় না!

—সত্যি সুরমা, দেশকে প্রকৃত ভাল না বাসলে কেউ কখনো অতগুলো পাশ করে আমাদের মত স্কুলে এসে পড়ে থাকে! আর শুধু তাই নয়—আর একটা কথা, তুমি শুনলে আশ্চর্য হয়ে যাবে যে কলকাতার স্কুলে এখানকার চেয়ে ডবল মাইনে উনি পেতেন। হেলায় সেটা তিনি ছেড়ে দিয়ে এসেছেন। টাকা দিয়েই মানুষের মনের আসল পরিচয় পাওয়া যায়! আর কি উদার দৃষ্টিভঙ্গী, কি মহৎ অন্তঃকরণ! সত্যি,

সুরমা, আমি এরকম মানুষ আর দেখিনি। প্রকৃত শিক্ষক এঁকেই বলে। আর একটা আশ্চর্যের কথা কি জানো! পাছে দেশের কাজে তিনি সম্পূর্ণভাবে মনোনিবেশ করতে না পারেন, সেই জন্যে নাকি বিয়েই করেননি। কি আশ্চর্য ত্যাগী পুরুষ!

গ্রামে একটা ছোট মেয়ে স্কুল ছিল। তার সেক্রেটারী হচ্ছে সুরমা। হরিবিলাস-বাবুর প্রশংসা যখন চারিদিক থেকে তার কানে আসতে লাগল, তখন সেও প্রতিজ্ঞা করলে যেমন ক'রে হোক তার এই স্কুলটির উন্নতি করবে। চুপি চুপি সে তখন নিজের টাকা দিয়ে ভাল ভাল চেয়ার-বেঞ্চি কিনে আনিয়ে স্কুল সাজালে। তারপর বোনা ও সেলাইয়ের নতুন ব্যবস্থা করলে এবং তার জন্য কলকাতা থেকে সেলাইয়ের কল ও কার্পেট, ছুঁচ, সুতো, পশম এক গাদা এনে নিজেই নিয়মিত মেয়েদের একঘণ্টা করে ক্লাস নিতে লাগল। তাই দেখে জমিদারবাবু একদিন ঠাট্টা করে স্ত্রীকে বললেন, কি, তুমিও যে উঠে পড়ে লাগলে স্কুল নিয়ে। খুব ভালো, খুব ভালো—দেখছো ত, একটা লোক দেশে আসাতে চারিদিক থেকে কেমন একটা কর্ম-প্রেরণা জাগছে!

—তা' আমার স্কুলের সঙ্গে তোমার হরিবিলাসবাবুর সম্পর্ক কি? কোন্ দুঃখে আমি তাঁর কাছ থেকে কর্মপ্রেরণা নিতে যাবো, আমি কি পারি না? বলে সুরমা ভ্রূ-কুঞ্চিত করে স্বামীর মুখের দিকে তাকালো।

—তুমি পারো না এমন কথা বলবার সাহস আমার নেই; তবে এতদিন ত তোমার এরকম চাড় দেখিনি—নিজে গিয়ে আজকাল স্কুলে শেখাচ্ছো!

সুরমা বললে, কেন আমি কি তোমাদের দেশের মেয়েদের জন্তে কখনো কিছু করিনি—না এই প্রথম?

বাস্তবিক সুরমাকে গ্রামের মেয়েরা দেবীর মত পুজো করতো। দান-ধ্যান, দয়া-ধর্মে সে ছিল মুক্তহস্ত! যা বলে কেউ দুঃখ জানালেই হলো! কার ছেলের কাপড় নেই, কে স্কুলে মাইনে দিতে পারছে না, কার টাকার অভাবে চিকিৎসা হচ্ছে না, কার মেয়ের বিয়ের খরচা নেই, দুধের জন্য কার ছেলে মরছে—সব দিকে ছিল তার প্রখর দৃষ্টি। সুরমাকে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী অন্নপূর্ণা বলে গ্রামের মেয়েরা মনে মনে পুজো করতো। তাই স্ত্রীর মুখ থেকে ওই কথা শুনে জমিদারবাবু রীতিমত অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন। সুরমা তখন স্বামীকে বললে, এবছর থেকে আমি স্কুলের মেয়েদের প্রাইজ দেবো মনে করেছি—তোমায় কিন্তু তার খরচ দিতে হবে।

—বেশ, বেশ, নিশ্চয়ই দেবো। এতে মেয়েদের পড়াশুনো করবার উত্তম আরো বাড়বে—তাতে গ্রামেরই মুখ উজ্জ্বল হবে! এই বলে জমিদারবাবু তাঁর স্ত্রীর এই সদিচ্ছার প্রশংসা করলেন।

হাইস্কুলে প্রাইজ ছিল না। তাই পাছে তার আগে হরিবিলাসবাবু সুরমাকে টেক্কা দেয়, এই জন্যে সে কয়েকদিন পরেই প্রাইজের ব্যবস্থা করলে।

স্কুলটা জমিদার-বাড়ীর বিরাট অঙ্গনের একপ্রান্তে। জমিদারবাবু জেলার হাকিমকে করলেন সভাপতি। স্কুলের মাস্টারমশায়রাও সকলে নিমন্ত্রিত হয়ে এলেন।

এইদিন হরিবিলাসবাবু প্রথম সুযোগ পেলেন সুরমাকে চোখে দেখবার। ঠিক তাঁর সামনে নানা অলঙ্কার ও বেশভূষায় সুসজ্জিতা হয়ে রাজেন্দ্রাণীর মত সুরমা উঠে দাঁড়িয়ে সম্পাদিকার অভিভাষণ পাঠ করলে।

তার পাঠ শেষ হতে সকলের করতালি-ধ্বনিতে যখন প্রাঙ্গণ মুখরিত হয়ে উঠলো তখনও হরিবিলাসবাবু একদৃষ্টে সুরমার মুখের দিকে চেয়ে তার রূপ নিরীক্ষণ করছিলেন। এ যেন সে সুরমা নয়—কে যেন তাকে ভেঙ্গে গড়ে নূতন করে সৃষ্টি করেছে চঞ্চল স্রোতস্বিনী যেন সাগরের বিশালতায় এসে মিশেছে, বিদ্যুতের দীপ্তি যেন চন্দ্রমার স্নিগ্ধ কিরণে পরিণত হয়েছে। সে যেন প্রিয়ার মাতৃরূপ। তার মুখের দিকে চেয়ে হরিবিলাসবাবুর চোখ যেমন তৃপ্ত হলো, মনও তেমনি ভরে উঠলো এক অত্যাশ্চর্য বিস্ময়ে।

একে একে তখন হেডমাস্টারমশায় ও আরো অনেকে বক্তৃতা করলেন। সবাই সুরমা দেবীকে সাক্ষাৎ মা অন্নপূর্ণা জগদ্ধাত্রী বলতে বলতে অশ্রু বিসর্জন করে ফেললেন। শেষে জমিদারবাবু হরিবিলাসবাবুকে কিছু বলতে অনুরোধ করলেন।

হরিবিলাসবাবু উঠে দাঁড়িয়ে আবেগময়ী ভাষায় এক দীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতার মধ্যে দিয়ে তিনি বার বার শুধু সুরমা দেবীরই স্তুতিগান করলেন; তবে পূর্ববর্তী বক্তাদের মত নির্লজ্জ ভাবে নয়। যুক্তি দিয়ে তিনি বুঝিয়ে দিলেন সকলকে, কেন আজকের দিনে বাঙ্গালী জাতির সবচেয়ে প্রয়োজন স্ত্রী-শিক্ষার। আর যিনি সেই প্রয়োজনের কথা অনুভব করে এইখানে এই ঘোর পল্লীগ্রামে স্ত্রী-শিক্ষার আয়োজন করেছেন, কেন তিনি সকলের বরণীয়া। সবার আগে তাঁকে তিনি তাই আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন বারবার।

হরিবিলাসবাবুর মুখ থেকে এই রকম প্রশংসার বাণী শুনতে শুনতে সুরমার মুখ লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠলো। সে একবার ওরই মধ্যে তাঁর মুখের দিকে চট করে তাকিয়ে নিলে। কিন্তু তাঁকে দেখে তার মনেই হলো না যে এই লোকটির মধ্যে এত গুণ থাকতে পারে। বরং উল্টোটাই ভাবলে, লোকটার যদি কোন কাণ্ডজ্ঞান থাকত তা হ'লে কি এতগুলো লোকের মাঝখানে আমার এ রকম নির্লজ্জ প্রশংসা করতে পারতো! লোকে কি ভাবছে—ছি! আমার যেন মাথা কাটা যায়!

তবু ভেতরে ভেতরে তাঁর প্রতি তার মন কেমন যেন প্রসন্ন হয়ে উঠলো। সেইদিন প্রথম সুরমা সত্যিকারের প্রশংসার মদিরা পান করলে। বিশেষ করে হরিবিলাসবাবুর বক্তৃতাটা তার ভাল লাগল সব চেয়ে বেশী।

এর কিছুদিন পরে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে হরিবিলাসবাবু এক জনসভার আয়োজন করলেন এবং তাতে পতাকা উত্তোলন করবার ভার দিলেন সুরমা দেবীর ওপর।

সে প্রথমটা নিজেকে এই কাজের অযোগ্য বলে আপত্তি করেছিল, কিন্তু সভা উদ্বোধন করতে গিয়ে হরিবিলাসবাবু এমন আবেগময়ী ভাষায় সুরমা দেবীর স্তুতিগান করে তাকে সকলের সামনে মহিমান্বিতা ক'রে তুললেন যে এত লোকের মাঝখানে নিজের সম্বন্ধে তার ধারণা সত্যি সত্যি যেন বদলে গেল। তবু উঠে দাঁড়িয়ে ঈষৎ সলজ্জ কণ্ঠেই সে বললে, এইমাত্র আমার সম্বন্ধে যেসব কথা সভাপতি মহাশয় বললেন তার কোনটারই যোগ্যা আমি নই, একথা আমার চেয়ে বোধ করি আর কেউ বেশী জানে না। একজন সামান্যা কর্মী ও তুচ্ছতম দেশসেবিকা ছাড়া আমি নিজেকে অন্য কিছু মনে করতে পারি না এবং মনে করিনিও কোনদিন। তাই দীনতম পূজারীর পূজা করবার যেটুকু অধিকার আছে শুধু তারই বলে আমি আজ দেশমাতৃকার চরণে নিজেকে অর্ঘ্যরূপে নিবেদন ক'রে ধন্য হ'তে চাই। এইটুকুমাত্র আমার আপনাদের কাছে নিবেদন। এই বলে দৃপ্তভঙ্গীতে উঠে গিয়ে সে যখন তার কর্তব্য সম্পাদন করলে তখন চারিদিকে সাধু সাধু রব উঠলো।

খ্যাতি ও প্রশংসার মধ্যে যে এমন উন্মাদনা থাকতে পারে তা এতদিন সুরমার জানা ছিল না, এইবার সেই অজ্ঞাত ও প্রচ্ছন্ন বাসনা যেন নির্ঝরিণীর মত শতমুখে জাগ্রত হয়ে উঠলো তার মনের মাঝে। একটা দারুণ প্রেরণা সে অন্তরে অন্তরে অনুভব করতে লাগল। সে বড় হবে, সে দেশনেত্রী হবে, সে সমস্ত দেশকে উন্নত করবে —তার সেবা দিয়ে, ভালবাসা দিয়ে, দেহ মন সর্বস্ব দিয়ে। চারিধার থেকে কেবল যেন কোন বৃহতের আহ্বান, কোন মহতের আহ্বান অহরহ তার কানে আসতে লাগল। নদী যেমন দূর থেকে সাগরের ডাক শুনে মাতাল হয়ে ছোটে তেমনিভাবে তার সমস্ত অন্তর ব্যাকুল হয়ে উঠলো কোন্ অজানার স্বপ্নে।

সুরমার আব্রু ধীরে ধীরে খসে পড়তে থাকে হরিবিলাসবাবুর সামনে।

হরিবিলাসবাবুর সঙ্গে মিলেমিশে সে এবার কাজ সুরু করে দিলে। একদিকে ভৈরব আর একদিকে পদ্মা—দুই নদ ও নদী যেন প্রচণ্ড বিক্রমে একই স্থানে এসে

মিলিত হলো। তাদের বিস্ময়কর প্রভাবে ভাঙন ধরলো পুরাতনের! নতুন পলিমাটির ফসলের মত পল্লীবাসীদের চিত্ত উর্বর হয়ে উঠলো নিত্যনতুন চিন্তাধারায়! গ্রামের চারিদিকে একটা নতুন জাগরণ দেখা দিল। দেখতে দেখতে লেখাপড়া, খেলাধুলা, দেশ-সেবা, আত্মীয়তা-বোধ—সকলের মনে এমন প্রভাব বিস্তার করলে যে দু'বছর আগে যে সে গ্রামকে দেখেছে এখন তাকে দেখে সে রীতিমত বিস্মিত হলো। আগের গ্রামের সঙ্গে এখনকার গ্রামের যেন আকাশ-পাতাল প্রভেদ!

মেয়েদের উন্নতির দিকটা দেখতে লাগল সুরমা, আর পুরুষদের দিকটা হরিবিলাসবাবু। কিন্তু একটা জিনিস দেখে হরিবিলাসবাবু একটু আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন, সুরমা গোড়া থেকেই তাঁর সঙ্গে এমনভাবে আলাপ-আচরণ করতো যে সে তাঁকে চিনতে পেরেছে কিনা তা তিনি বুঝতেই পারতেন না। এর জন্যে মনে মনে ক্ষুব্ধ হ'লেও কোন দিন তিনি যেচে, নিজে থেকে, সেকথা তাকে স্মরণ করিয়ে দেবার চেষ্টা করেননি। কি দরকার! যদি সত্যি সত্যি তাঁকে সে ভুলে গিয়ে থাকে ত ভালই। সেকথা মনে করিয়ে দিয়ে নিজেকে ছোট করার দরকার কি। যার জন্যে তিনি এতকাণ্ড ক'রে ছুটে এলেন, তার কাছ থেকে এ রকম অবহেলা পেলে বুকে খুবই লাগে সত্যি, কিন্তু যে শিক্ষা-দীক্ষা, যে পাণ্ডিত্যাভিমান তিনি অর্জন করেছিলেন, তার দ্বারা সে দুর্বলতাটুকুও তিনি অনায়াসে জয় করে নিলেন। বরং তাঁর মনে হলো, এই ভালো, যদি কোন দিন সে নিজে থেকে তাঁকে চিনে নেয় সেই হবে তাঁর সবচেয়ে বড় জয়—বড় পুরস্কার!···এর জন্যে দোষ দেওয়াও যায় না সুরমাকে। বাস্তবিক এই দীর্ঘদিনের ব্যবধানে তাঁর চেহারার একেবারে আমূল পরিবর্তন হয়েছে। কি রকম রোগা ও নগণ্য ছিলেন তিনি তখন, আর এখন কি হয়েছেন! সুরমার পক্ষে চেনাও তাঁকে রীতিমত শক্ত! তাছাড়া কোন বিশেষত্বই ত তখন তাঁর চেহারায় ছিল না! এই বলে তিনি নিজের মনকে বোঝাতেন।

এমনি করে দীর্ঘ তিন বছর কেটে গেল।

কলকাতায় সেবার 'এডুকেশন উইক'—এক সপ্তাহ ধরে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে কত সভা সমিতি, বক্তৃতা! রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্যার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ প্রমুখ ভারতের আরো বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতীরা শিক্ষাবিষয়ক বিভিন্ন বক্তৃতা করবেন। বাংলার স্কুল বিভাগে রীতিমত একটা হুলুস্থুল পড়ে গেল। হরিবিলাসবাবু হাই স্কুলের তরফ থেকে এবং মেয়ে স্কুলের দিক থেকে সুরমা দেবী সদস্য নির্বাচিত হলেন। এই সভায় যোগদান করবার জন্য তাঁরা কলকাতায় রওনা হলেন। মহিলা সদস্যের জন্যে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি স্বতন্ত্র ভাবেই করে-

ছিলেন এবং পুরুষদের ত কথাই নেই।

জমিদারবাবু ও হেডমাস্টারমশায় সানন্দে এসে তাঁদের ট্রেনে তুলে দিয়ে গেলেন।

কতবড় সভা, কত বক্তা তাতে বক্তৃতা দেবেন। এই সব চিন্তা করতে করতে সুরমা চললো। জীবনে এই তার প্রথম সুযোগ। কিন্তু এই সবের জন্যে হরিবিলাসবাবুর কাছেই তার কৃতজ্ঞতা বেশী। তিন বছর আগে কে জানতো যে এই সুরমা একদিন এইভাবে মহিলা সদস্য নির্বাচিত হয়ে কলকাতায় নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সপ্তাহে যোগদান করতে আসবে!

কিন্তু হাওড়ায় গাড়ী থেকে নামতেই হরিবিলাসবাবুর চোখে পড়লো একটি নব-বিবাহিত বর ও বধূ! টোপর মাথায় দিয়ে ফুলের মালা পরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এখনি যে গাড়ীটা ছাড়বে, তাতে যাবে তারা। সহসা তাঁর বুকের মধ্যে যেন কিসের একটা ঝড় উঠলো! অনেক কষ্টে তাকে প্রশমিত করে নিয়ে তিনি তখন ভলেন্টিয়ারদের সঙ্গে সঙ্গে নিজ বাসস্থানে গিয়ে হাজির হলেন।

সাতটা দিন খুব আনন্দ উৎসবের মধ্য দিয়ে কেটে গেল। সুরমা স্বামীকে প্রতি-দিনের ইতিহাস লিখে লিখে জানাতো এবং সে যে কতখানি সুখী হয়েছে এর জন্যে—সে কথা বলতে গিয়ে বার বার হরিবিলাসবাবুর নাম উল্লেখ করতে কিন্তু ভুলতো না

এদিকে হরিবিলাসবাবুর মনটা সেই যে প্রথম দিন থেকে ভেঙ্গে গেল, আর যেন তাতে জোড়া লাগল না। কোন একটা বক্তৃতার কথা উল্লেখ করতে করতে উচ্ছ্বসিত হয়ে সুরমা একসময় হঠাৎ হরিবিলাসবাবুর মুখের দিকে চেয়ে থেমে যেতো। সে বলতো—আপনি এত মিইয়ে রয়েছেন কেন ক'দিন হরিবিলাসবাবু?

তিনি তার কোন সঠিক জবাব দিতে না পেরে কেবল বলতেন, শরীরটা ভাল নেই আজ। এই বলে সঙ্গে সঙ্গে একটা দীর্ঘশ্বাস যেন বুকের মধ্যে চেপে নিতেন। শেষদিন রবীন্দ্রনাথকে চোখে দেখে তাঁর মুখের বক্তৃতা শুনে সুরমা একেবারে আত্ম-হারা হয়ে গেল। সে যেন তার মনের আবেগ প্রকাশ করার ভাষা খুঁজে পাচ্ছিল না। চোখে মুখে ভাবে ভঙ্গীতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো—তার সেই আনন্দের আধিক্য, উল্লাসের জোয়ার, অপর্যাপ্ত হৃদয়স্পন্দন! তার জীবন যেন ধন্য হয়েছে, জন্ম সার্থক হয়েছে। মিটিং শেষ হতে না হতে সে তাড়াতাড়ি হরিবিলাসবাবুর কাছে এসে দাঁড়ালো; তারপর তাঁর কৃপায় যে আজ তার জীবনে এই রকম একটা দুর্লভ সুযোগ ঘটলো তার জন্যে গভীর কৃতজ্ঞতা জানালে।

হরিবিলাসবাবু তার মুখের দিকে চেয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। সুরমার এমন

আনন্দোজ্জলমূর্তি তিনি যেন আর কখনো দেখেননি। অনেক দিন আগে তিনি একবার হরিদ্বারে গিয়েছিলেন। লক্ষ্মীপূর্ণিমার রাত। চাঁদের আলো গাছের ফাঁক দিয়ে এসে পড়েছিল উপল-মুখরা কলস্বনা গঙ্গার চলচঞ্চলা একটি ক্ষীণরেখার ওর! সুরমার মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁর সেই বহুদিনকার ভুলে যাওয়া সৌন্দর্যের কথা মনে পড়লো! তিনি ভাবতে লাগলেন বাংলাদেশের মেয়েদের কথা! সুরমার মতো বয়সের আরো অনেককেই ত তিনি দেখেছেন কিন্তু কেউ ত এরকম নয়। এ যেন মাতা ভগ্নী প্রিয়া ও কন্যার অপূর্ব মিলন একই দেহে! নারীত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ! তাকে দেখে সহসা হরিবিলাসবাবুর মনে একটা চিন্তা জাগল। তিনি ভাবতে লাগলেন হয়ত মানুষের মনটা একটা গাছের মত—আর তার অসংখ্য শাখা প্রশাখার মত মানুষের অসংখ্য প্রবৃত্তি। যে প্রবৃত্তি যখন সার্থক হয় তখন সে যেন বিকশিত হয়ে ওঠে ফুলের মত। তাই সুরমাকে দেখে তাঁর মনে হলো তার মনের সমস্ত শাখাগুলো যেন একসঙ্গে মঞ্জরিত হয়ে উঠেছে, কোথাও কোন শূন্যতা নেই, কোন রিক্ততা নেই, কোন অপূর্ণতা নেই।

সুরমা কিন্তু হরিবিলাসবাবুর মুখের দিকে চেয়ে একটু হতাশ হলো—কই তার মত ত আনন্দোচ্ছলতা নেই সেখানে! সে বললে, কি অপূর্ব বক্তৃতা আর কি মধুর কণ্ঠস্বর, না বিলাসবাবু?

ঈষৎম্লান হাসি তাঁর ঠোঁটের কোণে শুধু ফুটে উঠলো। তিনি বললেন, আপনি এই প্রথম শুনলেন কিনা। ছেলেবেলা থেকে আমরা কবির অনেক বক্তৃতা শুনেছি!

প্রথম না হয় শুনলুম, তাই বলে কি আপনার ভাল লাগেনি?

আমরা বুড়ো মানুষ আমাদের আর ভাল লাগলেই বা কি আর না লাগলেই বা কি?

সুরমা ফিক করে হেসে ফেলে বললে, আর আমি বুঝি একেবারে ছেলেমানুষ, না? কী যে বলেন!

হরিবিলাসবাবু বললেন, কিন্তু আমার মত ত চুলে পাক ধরেনি!

এইবার সজোরে হেসে ওঠে সুরমা। তারপর বলে, তার আর খুব বেশী দেরিও নেই বোধ করি।

এর কিছুদিন পরে জেলা কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে হরিবিলাসবাবু হলেন অভ্যর্থনা বিভাগের সভাপতি আর সুরমা দেবী নারীবিভাগের। বিরাট সভা

সরোজিনী নাইডু, সুভাষবাবু প্রভৃতি আরো অনেক বড় বড় নেতা বক্তৃতা করতে এসেছিলেন। প্রথমেই অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হিসাবে হরিবিলাসবাবু সেই বিশ্ববরেণ্য নেতৃবৃন্দের জয়গান করে জেলাবাসীদের পক্ষ থেকে তাঁদের সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করলেন। তারপর কংগ্রেসের উদ্দেশ্য কি—আজকের দিনে ভারতবর্ষকে সকল দিক থেকে উন্নত করতে হলে, একমাত্র কংগ্রেসকেই যে শক্তিশালী করতে হবে, তা না হ'লে, দেশের শিক্ষা সংস্কৃতি বা সভ্যতা রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে পড়বে এ জ্ঞান যাতে ছোট বড় সকলের মধ্যে সমানভাবে জাগ্রত হয় তার জন্যে প্রত্যেক দেশবাসীকে সচেতন থাকতে অনুরোধ ক'রে ওজস্বিনী ভাষায় তিনি এক মর্মস্পর্শী বক্তৃতা দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে করতালিধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠল সভাপ্রাঙ্গণ। হাজার হাজার কণ্ঠে 'বন্দেমাতরম' 'গান্ধীজীকী জয়' উচ্চারিত হলো।

তারপর মহিলাদের পক্ষ থেকে বলতে গিয়ে সুরমা দেবী এমন উত্তেজিত ভাষায় বক্তৃতা দিলেন যে বাংলা তথা সমগ্র ভারতের নারীজাতির অবমাননা যেন তাঁর কণ্ঠে মূর্ত হয়ে উঠলো। দু'শ বছরের পরাধীনতার যত গ্লানি, যত বেদনা সব যেন সেই মুহূর্তে তাঁর কণ্ঠ ভেদ করে বেরিয়ে আসতে চাইল। চারিদিকে সাধু সাধু রব পড়ে গেল। সরোজিনী নাইডু, সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি নেতারা সুরমা দেবীর বক্তৃতার প্রশংসা করে সভামধ্যে বললেন, যেদিন দেশের প্রতি ঘরে ঘরে তাঁর মত মেয়ে জন্মাবে সেই-দিন ভারতবর্ষের মুক্তি আসতে বাধ্য, জগতের কোন শক্তি তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।

আনন্দে-গর্বে সুরমার মুখ একেবারে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। তার মনে হতে লাগল তখনি যদি সে মরে যায় ত দুঃখ নেই! এত বড় বড় দেশপূজ্য, বিশ্ববরেণ্য নেতারা যা বললেন তা কি সত্যি? কিন্তু তার মত একজন সামান্য দেশসেবিকার মধ্যে তাঁরা কি করে এমন বিরাট সম্ভাবনা লক্ষ্য করলেন! সুরমা আর চিন্তা করতে পারে না।

তার সমস্ত দেহের মধ্যে যেন কেমন করতে থাকে।

সুরমার প্রশংসায় হরিবিলাসবাবুর বুক আনন্দে ও গর্বে যেন দশ হাত হয়ে ওঠে। সুরমাকে কি বলে যে তিনি অভিনন্দিত করবেন তার ভাষা যেন তিনি খুঁজে পান না।

তাই গাড়ীতে করে বাড়ী ফেরবার পথে হরিবিলাসবাবু নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলেন না। বললেন, আপনার বক্তৃতা শুনে আমি মুগ্ধ হয়েছি—অসাধারণ বক্তৃতা! এরকম বক্তৃতা করতে পারে বাংলা দেশে এমন মেয়ে খুব কম আছে,

আমি বাজী রেখে বলতে পারি!

সলজ্জ হাসিতে সুরমার মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। তবু তাড়াতাড়ি সেটা গোপন করতে করতে সে বললে, আহা, আর আপনার বক্তৃতা বুঝি কিছু হয়নি! আমি বাজী রেখে বলতে পারি বাংলা দেশে খুব কম পুরুষ আছে যে আপনার মত এত সুন্দর বক্তৃতা দিতে পারে। এই বলে খিল খিল করে হেসে উঠলো।

বিরাট একটা মাঠের মাঝখান দিয়ে তাদের ঘোড়ার গাড়ী চলছিল ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে। একে কাঁচা রাস্তা, তায় সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। পূর্ণিমার আর কয়েক-দিন মাত্র বাকী। মৃদু জ্যোৎস্নার আলোয় সমস্ত মাঠটা তখনি যেন রহস্যময় হয়ে উঠেছে। মাঠের দুপাশে যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু সরিষার ক্ষেতে হলুদ রঙের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অসংখ্য ফুল—হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ! মনে হয় যেন কে একখানি সোনালী কার্পেট বিছিয়ে রেখেছে সারা মাঠময়। ফুলের মৃদু ও সুমিষ্ট গন্ধে সেখানকার আকাশ-বাতাস যেন মদির হয়ে উঠেছে।

হরিবিলাসবাবু বললেন, বাস্তবিক বলছি আপনি জানেন না যে কত ভাল আপনি বলেছেন।

সুরমা তার উত্তর দিতে গিয়ে হঠাৎ একটু থেমে মৃদুতর কণ্ঠে বললে, তার জন্যে সব প্রশংসাটাই ত আপনার প্রাপ্য। আপনি যদি আমায় শিখিয়ে না দিতেন কি বলতে হবে তাহ'লে আমার সাধ্য কি এমনভাবে বক্তৃতা করবার! কাজেই আপনার মুখ থেকে একথা শুনলে লজ্জা করে, মনে হয় আপনি যেন নিজেই নিজের প্রশংসা করছেন!

আপনার প্রাপ্য! এই কথাটা কানে যাবার সঙ্গে সঙ্গে হরিবিলাসবাবুর বুকের মধ্যে থেকে যেন হৃদ্‌পিণ্ডটা কোথায় ঠিক্‌রে গেল। তাঁর সর্বশরীর থরথর ক'রে কাঁপতে লাগল। তিনি যেন কিসের চিন্তায় ডুবে গেলেন।

গাড়ী চলতে লাগল তেমনি মন্দাক্রান্তা ছন্দে।

হরিবিলাসবাবু সুরমার মুখের ওপর থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে চেয়েছিলেন দূরে, মাঠের দিকে—যেখানে আকাশ এসে ছুঁয়েছে মাটিকে, যেখানে মৃদু জ্যোৎস্নার রহস্য-ময় অবগুণ্ঠন! সহসা তাঁর মনে হলো যদি সুরমার সঙ্গে সত্যি সত্যি তাঁর বিয়ে হতো তাহ'লে আজকের এই আনন্দ, এই প্রশংসার সমস্তটুকু ত হতো তাঁর প্রাপ্য। কত সুখী, কত খুশী, কত তৃপ্তি পেতেন তাহলে তিনি—এইভাবে এক সঙ্গে এমনি করে পাশাপাশি বসে, একই গাড়ীতে যেতে!

সুরমাও চুপ করেছিল। কিন্তু হরিবিলাসবাবুকে অনেকক্ষণ মৌন থাকতে দেখে

সে বললে, কি ভাবছেন এমন করে ?

একটা দীর্ঘনিশ্বাস চেপে নিয়ে তিনি বললেন, না, এমন কিছু নয় !

সুরমা একটু হেসে বললে, বেশ লোক ত আপনি ? আমি চোখের সামনে দেখছি চুপ করে বসে রয়েছেন, ভাবছেন, অথচ বলছেন কিছু নয়। আমার কাছে গোপন করতে চান তাই বলুন না ? আচ্ছা, আমি শুনতে চাই না, আপনার সে গোপন কথা !

হরিবিলাসবাবুর দেহমনের কম্পন তখনো থামেনি। একবার তাঁর মনে হলো বলেন, সুরমা, তুমি কি আমায় সত্যিই আজো চিনতে পারোনি ? আবার পরমুহূর্তেই নিজের সে আবেগ ও সে উত্তেজনা দমন করে নিয়ে কথাটাকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেবার জন্যে বললেন, আচ্ছা, সভায় কত লোক হয়েছিল বলে আপনার অনুমান !

সুরমা একটু রহস্য করে বললে, আমার ত মনে হয় শ'তিনেক ?

হরিবিলাসবাবু বিস্মিতকণ্ঠে বলে উঠলেন, মাত্র এই ! আপনার দেখছি অনুমান করবার ক্ষমতা একেবারে নেই—তিন হাজারের কম ত নয়ই—এমন কি বেশীও হতে পারে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস !

সুরমা এবার হেসে ফেললে। বললে, তাই যদি বিশ্বাস তবে আবার আমায় অনুমান করতে বলছেন কেন ? ভয় নেই, আমি আর জিজ্ঞেস করবো না, কি ভাবছেন ! একটা বাজে কথা বলে আমার মনটাকে অন্যদিকে ফিরিয়ে দেবার দরকার নেই ! আপনি ভাবুন—বেশ ভাল করে। এই বলে কণ্ঠে একটা কৃত্রিম অভিমান এনে সে মুখটা ফিরিয়ে নিলে এবং গাড়ীর যে দরজাটা দিয়ে হরিবিলাসবাবু বাইরের দিকে চেয়েছিলেন তার বিপরীত দিকে তাকিয়ে রইল।

গাড়ী চলতে লাগল।

দু'জনেই নীরব ও নির্বাক হয়ে রইল ! তবু হরিবিলাসবাবু তাঁর মনের কথা কিছুতেই ব্যক্ত করতে পারলেন না সুরমার কাছে।

এমনি করে দিন কাটে। সুরমা ইদানীং লক্ষ্য করে হরিবিলাসবাবু যেন তার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে করতে সহসা কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন ! লোকটি বেশ ভাল সবদিকে, কিন্তু একটা জায়গায় সে লোকটাকে যেন বুঝতে পারে না ! কেন পারে না, এই নিয়ে সে অনেক সময় মাথা ঘামায় কিন্তু কোন ফল হয় না ! বিদ্বান, পণ্ডিত, জ্ঞানী, গুণী, দেশকর্মী, দেশের সবাই যাঁকে শ্রদ্ধা করে—সুরমা তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্ব ও

মহান চরিত্রের দিকে বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। বিরাট পাহাড়ের অন্তরের কোন্ অন্তস্তলে কোন্ রত্ন লুকানো আছে তা যেমন লোকের পক্ষে বোঝা দুষ্কর তেমনি ওঁরও চরিত্রের সবটা ধারণা করা কঠিন—অন্তত তাই মনে হয় সুরমার। তবুও কোন্ সে দুর্লভ বস্তু যা এই সুস্থ সবল শান্ত পুরুষটির জ্যোতির্ময় মানসপটে মধ্যে মধ্যে এমনভাবে গভীর ছায়াপাত করে—তার সন্ধানে সুরমার অন্তর সর্বদা সজাগ থাকে! কথাপ্রসঙ্গে নানাভাবে সে-কথা সে জানবার চেষ্টা করে, কিন্তু সব সময় ব্যর্থ হয়। স্তব্ধদীঘির গভীর অতলে যেন গোপন থাকে হরিবিলাসবাবুর সে-কথা—ওপর থেকে সে তার কিছুই আভাস পায় না।

সুরমা একদিন তার স্বামীকে জিজ্ঞেস করলে, আচ্ছা, হরিবিলাসবাবু ইদানীং যেন কেমন অন্যমনস্ক হয়ে থাকেন, না?

তিনি বললেন, বড় বড় নেতাদের মাথায় বড় বড় চিন্তা! তাঁদের দিনরাত মাথা ঘামাতে হয়, তা নাহ'লে কি বড় হওয়া যায়?

সুরমা বললে, না গো না, এ যেন সে চিন্তা ছাড়াও অন্য কিছু!

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে তিনি বললেন, দেখ অন্য কিছুর কথা থাক—সে যার চিন্তা তিনি করুন, আমাদের দেশের জন্যে তিনি যা করেছেন সেই কথাই এখন ভাবো।

সুরমা বললে, তা বলে তাঁর যদি মনে কোন কিছু হয়ে থাকে—

হয়ে থাকে থাক—তাঁর মন নিয়ে এত বাড়াবাড়ি আপাতত তুমি না করলে বোধ হয় তিনি খুশী হন—হেসে বলেন তিনি।

যাও, দিন দিন যেন তোমার কি হচ্ছে! এই বলতে বলতে সুরমা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

হরিবিলাসবাবুও এক-একদিন এমন মানসিক উত্তেজনা অনুভব করেন যে তাঁর মনে হয় ছুটে গিয়ে সুরমাকে বলে আসেন তাঁদের পূর্ব পরিচয়ের কথা! স্মরণ করিয়ে দেন যে শুধু তারই জন্যে, শুধু তাকে চোখে দেখবার জন্যে, তাকে কাছে পাবার জন্যে তিনি ছুটে এসেছেন এখানে! কিন্তু সে এমনি নিষ্ঠুর যে তাঁকে চিনতে পর্য্যন্ত পারেনি, এত দিনের এত মেলামেশার পরও! আবার পরমুহূর্তে কি জানি কেন তাঁর ভদ্র ও শিক্ষিত মন ছি ছি ক'রে উঠে তাঁর এই দুর্বল মনোবৃত্তিকে ধিক্কার দেয়। তিনি সম্বরণ করেন নিজেকে।

এমনি করে অন্তরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে তাঁর দিন কাটে। এমন সময় একদিন স্থরমার স্কুলের একটি মেয়ের বিবাহে হরিবিলাসবাবুরও নিমন্ত্রণ হলো। গাড়ী এলো। কিন্তু স্থরমা রাত্রে সেজেগুজে তাঁর ঘরে এসে দেখলে তিনি চুপ করে শুয়ে আছেন। দূর থেকে বিয়ে বাড়ীর সানাইয়ের স্থর যেন কান্নার মত তখন তাঁর কানে এসে ঢুকছিল। স্থরমা বললে, একি, আপনি এখনো শুয়ে আছেন, তারা গাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছে যে।

হরিবিলাস বাবু গম্ভীরকণ্ঠে বললেন, আমি যাব না, আপনি যান!

সে কি! কত আশা করে তারা আপনার পথ চেয়ে আছে। আপনাকে তার মা-বাপ যে দেবতার মত ভক্তি করেন!

তা হয়ত সবই সত্যি! কিন্তু আমি বিয়ে বাড়ীতে যেতে পারবো না!

কেন?

'কেন'র কোনো উত্তর নেই! পৃথিবীতে এমন অনেকগুলো জিনিস আছে, 'কেন' বললে যার হদিশ মেলে না! তা নাহ'লে আজ 'কেন' আমি এখানে, আর 'কেন' আপনি এখানে—কে বলবে! এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে যেন উত্তেজনায় তাঁর কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠলো।

শুধু তাদের বাড়ীতে আপনার পায়ের ধুলো পড়বে বলে আনন্দে যাদের ঘুম হয় না, তাদের এইভাবে কি আপনার বঞ্চিত করা উচিত?

দেখুন স্থরমা দেবী, কাকে কি থেকে বঞ্চিত করলে ভাল হয় কি মন্দ হয়—সে বোঝবার চেষ্টা দয়া করে আপনি করবেন না। এইটুকু শুধু আপনার কাছে আমার অনুরোধ!

ফিক করে একটু হেসে স্থরমা সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর হয়ে বলে, কেন, আমি কি এতই হৃদয়হীন যে সেটুকু বোঝবার ক্ষমতা পর্যন্ত আমার নেই?

না না, আপনি অত্যন্ত হৃদয়বান! তবু দয়া করে এখন আমায় একটু একলা থাকতে দিন—আমি আপনার কাছে হাতজোড় করে মিনতি জানাচ্ছি। বলে তিনি যেন হাঁপাতে লাগলেন।

আপনার কি শরীর অস্থস্থ? স্থরমা তখন প্রশ্ন করলে।

জানি না। দয়া করে আপনি শুধু চলে যান। এই বলে দু হাত তুলে তিনি এবার হাতজোড় করলেন।

স্থরমা চলে গেল বটে, কিন্তু সমস্তক্ষণ তার মনটা পড়ে রইল হরিবিলাসবাবুর কাছে। এতটা উত্তেজিত হ'তে তাঁকে সে আর কোনদিন দেখেনি।...

বিয়ে বাড়ীতে সুরমা বেশীক্ষণ থাকতে পারলে না। সকাল সকাল ফিরে এলো। আসবার সময় হরিবিলাসবাবুর জন্যে তারা খাবার পাঠিয়ে দিলে তার সঙ্গে।

সুরমা তাড়াতাড়ি বাড়ীতে ফিরেই থালায় ক'রে খাবার সাজিয়ে নিয়ে তাঁর ঘরে এসে ঢুকলো।

পল্লীর রাত! নিস্তব্ধ নিঝুম! তখনো দূর থেকে বিয়ের সানাইয়ের সুর ভেসে আসছিল। হরিবিলাসবাবু তেমনিভাবে চুপ করে বিছানায় শুয়ে যেন কি ভাবছিলেন। তাঁকে সেই অবস্থায় দেখে সুরমার মনে প্রথমটা খটকা লাগল—তারপর জোর করে মুখে হাসি টেনে এনে বললে, কিছুতেই তারা শুনলে না। বললে, মাস্টারমশায় যদি একটু মিষ্টিমুখ না করেন ত তাদের বিয়ের আনন্দ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

গম্ভীরকণ্ঠে হরিবিলাসবাবু তখন বললেন, ও-সব নিয়ে যান, আমি কিছু খাবো না।

সুরমা বললে, কেন খাবেন না? আপনার শরীর কি ভাল নয়?

তা আমি বলতে পারবো না—তবে আমি খাবো না। ব্যস্, এইটুকু জেনে রাখুন।

বাবা কি আপনার রাগ! আজ হলো কি বলুন ত? এই বলে মুখে একটু হালকা হাসি টেনে এনে সুরমা হরিবিলাসবাবুর মেজাজটা পরীক্ষা করবার চেষ্টা করলে।

হরিবিলাসবাবু তার কোন জবাব না দিয়ে তেমনি নীরবে রইলেন।

তখন সুরমা বললে, আহা, তারা কত আশা ক'রে দিয়েছে আপনাকে খাবার জন্যে। মানুষের মনে আপনি বড় ব্যথা দেন, কেন বলুন ত?

এইবার হরিবিলাসবাবুর অন্তরাত্মা যেন আর্তনাদ করে উঠলো। তিনি বললেন, ব্যথা—ব্যথা শুধু আমাকেই দিতে দেখেছেন—আর আমি যে অন্যের কাছ থেকে অহরহ ব্যথা পাচ্ছি, সেটা বুঝি চোখে দেখতে পান না?

সুরমা তাঁর মুখের দিকে চেয়ে বক্রোক্তি করলে, আশ্চর্য, আপনি তাহ'লে ব্যথা পান!

না, আমি মানুষ নই—আমার দেহে রক্তমাংস নেই--ব্যথা পাওয়াটা তাই আমার পক্ষে অপরাধ!

কিন্তু আপনাকে ব্যথা দিতে পারে এমন মানুষ এ সংসারে কে আছে?

সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিয়ে তিনি বললেন, কেউ নেই, শুধু এইটুকু শুনলেই হবে।

সুরমা তার বিছানার কাছে আরও এগিয়ে এসে বললে, দেখুন, কেউ নেই বললে আজ আমি কিছুতেই শুনবো না, আমি অনেকদিন থেকে লক্ষ্য করছি, আপনি মনে

মনে যেন কি একটা গভীর ব্যথা লুকিয়ে রাখেন। কিসের ব্যথা এবং কে সে ব্যথা দিয়েছে, আজ তা আমাকে বলতেই হবে!

হরিবিলাসবাবুর মুহূর্তে যেন ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো। তিনি আর নিজেকে সামলে রাখতে পারলেন না, খপ্ ক'রে বলে ফেললেন, যদি বলি আপনি!

আমি! নিমেষে সুরমার মুখ যেন ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গেল। তারপর বিস্ফারিত দুটি চক্ষু তাঁর মুখের ওপর তুলে ধরে বললে, কিন্তু আমি ত এর কিছুই বুঝতে পারছি না।

তা পারবেন কেন, ওটা আপনাদের ধাতে সয় না যে! তাই আপনারা যেটা সহজে ভুলে যান পুরুষমানুষ হয়ত তা জীবনেও ভুলতে পারে না। এই বলে বিছানার ওপর ধড়মড় করে উঠে বসে তিনি বললেন, রমা, সত্যিই কি তুমি আমাকে এখনো চিনতে পারোনি?

সুরমা চমকে উঠলো। সহসা তার মনে হলো এ কণ্ঠস্বর যেন পরিচিত, বহুদিন পূর্বে কোথায় শুনেছে। সঙ্গে সঙ্গে তার বুকের মধ্যে যেন কেমন একটা শিহরণ অনুভব করলে। তারপর হরিবিলাসবাবুর চোখের দিকে আর একবার তাকিয়ে সে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।...

হরিবিলাসবাবু তেমনি বসে রইলেন চুপ করে।

কিছুক্ষণ পরে সুরমা আবার ঘরে এসে ঢুকলো।

হরিবিলাসবাবু এবার তার একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বললেন, বলো রমা, এ কি সত্যি? তুমি এখনো আমায় চিনতে পারোনি?

সুরমার মুখ দিয়ে অস্ফুটস্বরে বেরিয়ে এলো, কিন্তু সেই আপনি, এখানে—

তার মুখের কথা টেনে নিয়ে হরিবিলাসবাবু বললেন, হ্যাঁ, শুধু তোমাকে চোখে দেখবার জন্য, রমা!

সুরমা বিহ্বল দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চেয়েছিল। সে বললে, কিন্তু সেই আপনার এত পরিবর্তন হলো, কেমন করে সম্ভব!

শুধু তোমাকে একদিন পাবো এই আশায় সুরমা। আমার এ পরিবর্তন নয়, রমা, বলো পরিণতি। অমাবস্যার চাঁদ যেমন তপস্যার বলে পূর্ণিমার মধ্যে পূর্ণত্ব লাভ করে, পদ্মের কুঁড়ি যেমন সূর্যের ধ্যানে মগ্ন থেকে একদিন নিজেকে ফুটিয়ে তোলে—এ আমার তেমনি পরিণতি রমা!

সুরমা তেমনিভাবে তার মুখের দিকে চেয়েছিলে। ধীরে ধীরে বললে, কিন্তু সেই আপনি আজ এই—

হ্যাঁ রমা! সবই শুধু তোমার জন্যে। দীর্ঘ আঠারো বৎসর ধরে তিলে তিলে পলে পলে যাকে দেখবার জন্যে সাধনা করেছি—তারই জন্যে আজ আমি এই!

সুরমা বিহ্বল দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চেয়েছিল। সহসা চমকে উঠে তার হাতখানি মুক্ত করে নিয়ে বললে, ছি, ওকথা আমাকে শোনাবেন না—আমার স্বামী আছে, ছেলেমেয়ে আছে, সংসার, সমাজ, ধর্ম্ম, সব আছে—আপনার মত বিদ্বান, পণ্ডিত লোকের নিশ্চিত বোঝা উচিত যে আমার পক্ষে এ-কথা শোনা পাপ।

তা জানি বলেই এতদিন চুপ করেছিলুম রমা—কিন্তু আজ আর কিছুতেই পারলুম না নিজেকে সামলাতে। বলতে বলতে মুহূর্ত কয়েক চুপ ক'রে থেকে গাঢ়স্বরে বললেন, সহসা এই দুর্বলতা প্রকাশ করে ফেলেছি বলে আমায় ক্ষমা করো রমা। বল, ক্ষমা করলুম!

থাক, থাক, ও-সব কথা বলে আর পাপ বাড়াবেন না আমার। বলতে বলতে সুরমা আবার তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তার হাত-পা-বুক তখন থরথর ক'রে কাঁপছে!

পরের দিন থেকে সে হরিবিলাসবাবুর সঙ্গে রীতিমত ব্যবধান রচনা করে চলতে লাগল। তাঁর কাছ থেকে যেন সুরমা অনেক, অনেক দূরে সরে গেল। আগেকার মত যখন তখন এসে হেসে কথা বলে, না—তাঁর সঙ্গে নানা বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনায়ও মত্ত হয় না। একাকিনী সে নিজের কাজে মনকে ভুলিয়ে রাখে। তবু যেন একটা কিসের চিন্তা তার মন থেকে কিছুতেই তাড়াতে পারে না। কোন কাজে আগেকার মত আর সে উৎসাহ পায় না—যেন তার আনন্দের উৎস সহসা শুকিয়ে গেছে। সুরমা ভাবে এ হরিবিলাসবাবুর ভয়ানক অন্যায়! সব জেনেশুনে এইভাবে তার বাড়ীতে এসে আশ্রয় নেওয়া তাঁর মত লোকের উচিত হয়নি! তিনি কি জানেন না যে এ ধরণের চিন্তাও তার পক্ষে পাপ!···লোকে জানতে পারলে দশজনের সামনে তার মাথা হেঁট হবে—অপযশ ছড়াবে? তবে সব জেনেশুনে একটা বিবাহিত স্ত্রীলোকের সংসারে আগুন লাগাবার জন্যে এই ভাবে এসেছেন! ছি-ছি-ছি। হরিবিলাসবাবুকে সে এখনো মনে মনে রীতিমত শ্রদ্ধা করে। তাই তাঁর চরিত্রের এই দিকটার কথা ভাবতে গিয়ে বড় ব্যথা পায়। আবার এক-একবার মনে হয়, তবে কি তিনি মনে মনে একটা ষড়যন্ত্র করে এসেছিলেন যে একদিন সে তাঁর কাছে ধরা দেবেই! তিনি কি তবে ভণ্ড! এত পাণ্ডিত্য, দেশপ্রেম—সব কি বৃথা, সব

প্রতারণা! তার মাথা গরম হয়ে ওঠে। সে ভাবে, না আর নয়—এভাবে একই বাড়ীতে আর তার সঙ্গে বাস করা সম্ভব নয়। যদি তার স্বামী জানতে পারেন কোনদিন যে তাকে দেখবার জন্যে হরিবিলাসবাবু এইভাবে সমস্ত পেছনে ফেলে রেখে এখানে ছুটে এসেছেন, তাহ'লে তার মুখটা কোথায় থাকবে! আর গ্রামের লোকরাই বা কি মনে করবে! কলঙ্কিনী অপবাদের চেয়ে আত্মহত্যা করা শতগুণে ভাল। এর চেয়ে মেয়েদের আর কি সর্বনাশ হতে পারে! ছি ছি ছি।

হরিবিলাসবাবুর এই অপরাধ কিছুতেই ক্ষমার চোখে সুরমা দেখতে পারলে না। মনে মনে স্থির করলে, হরিবিলাসবাবুকে আর তার বাড়ীতে রাখবে না। কৌশলে তাঁকে কোথাও সরিয়ে দেবে।

দু' তিন দিন পরে রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুয়ে সে স্বামীর কাছে সেই প্রস্তাবটাই করবে চিন্তা করছে, এমন সময় সহসা তার মনে হলো, কিন্তু হরিবিলাসবাবুর অপরাধ কি! তিনি ত নিজে থেকে কোনদিন সে পরিচয় দিয়ে তার ওপর কোন অধিকার বিস্তার করতে চেষ্টা করেননি! তাহলে এই দীর্ঘ দিন কেটে গেল, অথচ দুজনে দু' জনের কাছে রইল সম্পূর্ণ অপরিচিতের মত! বরং তারই প্ররোচনায় তিনি হঠাৎ এই পরিচয় উদ্ঘাটিত করেছেন! তবে তাঁর দোষ কোথায়? এতে তাঁর চরিত্রের ঔদার্য ও মহানুভবতা বরং আরো বেশী বড় হয়ে দেখা দেয় সুরমার চোখে।

সুরমা বিছানায় শুয়ে ছটফট করতে থাকে। তার চোখে ঘুম আসে না কিছুতেই।

পরের দিন থেকে সে আবার হরিবিলাসবাবুর সঙ্গে আগের মত মেলামেশা করবে স্থির করলে। কিন্তু কিসের একটা দুঃসহ লজ্জা যেন তার পায়ে পায়ে জড়াতে থাকে। সে জোর করে তার মনের এই দুর্বলতা সরিয়ে ফেলে আবার সত্যি সত্যি একদিন তাঁর ঘরে গিয়ে হাজির হয়। কিন্তু আলাপ-আলোচনা আগের মত যেন আর তেমন জমে না। সুরমার মনের কোণে কোথায় যেন একটা কি গোলমাল হয়ে গেছে!

হরিবিলাসবাবুও এই কদিনে যেন অনেকটা শুকিয়ে গিয়েছেন—তার মুখেচোখে চিন্তার রেখা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। কাজেকর্মে কেমন যেন অন্যমনস্কতা। সুরমার সঙ্গে কথা কইবার সময় আগেকার মত সে উৎসাহ, সে আগ্রহ, সে উত্তাপ যেন আর তিনি অনুভব করেন না। কোথায় যেন কি হয়ে গেছে! এক এক সময় তাঁর মনে অনুতাপ হয়, বাস্তবিক সুরমার কাছে কেন তিনি পরিচয় দিতে গেলেন! এ অত্যন্ত অন্যায়। ঘর-সংসার, ছেলেমেয়ে, স্বামী, খ্যাতি, যশ, সুনাম—তার মধ্যে যে রাজেন্দ্রাণীর মত ঘুরে বেড়াচ্ছে তার কাছে অতীতের কোন্ ভুলে-যাওয়া প্রণয়ের সুর টেনে এনে ইনিয়ে-বিনিয়ে বলার কি প্রয়োজন ছিল! বারবার কেবল এই কথাই মনে হ'তে

লাগল. এতে হয়ত তাঁর নিজের প্রয়োজন থাকতে পারে কিন্তু সুরমার কেন থাকবে ? এ তাঁর পক্ষে রীতিমত অন্যায় এবং পাপাচরণ ! ছি ছি ! ভাবতে গিয়ে সমস্ত মন যেন ক্লেদাক্ত হয়ে ওঠে। নিজের সমস্ত শিক্ষাদীক্ষার ওপরে ঘৃণা জন্মায় ! তিনি তখন মনে মনে বিবেচনা করে দেখেন যে আর সেখানে থাকা তাঁর উচিত নয়। তাতে সুরমারও মহিমা যেমন অক্ষুণ্ণ থাকবে, তাঁরও তেমনি !

কিন্তু সুরমাকে ছেড়ে যাবার কথা যতই চিন্তা করেন, যতই ভাবেন যে আর তাকে দেখতে পাবেন না, ততই যেন তিনি অধৈর্য হয়ে পড়েন। মনে মনে আবার স্বীকার করেন, না, সুরমাকে চোখে না দেখে তিনি কিছুতেই থাকতে পারবেন না।

এমনিভাবে দুজনের দিন কাটতে থাকে। সুরমাও কত আকাশ-পাতাল ভাবে ! এক-একদিন চিন্তা করতে করতে গভীর রাত্রে হঠাৎ তার মস্তিষ্ক উত্তেজিত হয়ে ওঠে ! কিসের সঙ্কোচ ! কিসের লজ্জা ! সে ত কোন অন্যায় করেনি কারুর কাছে ! স্ত্রী, পুত্র, স্বামী, সংসার, সমাজ, আত্মীয়স্বজন সকলকেই ত সমানভাবে দেখে এসেছে। সকলের জন্যেই ত সে নিঃশেষে দান করেছে নিজেকে। কারুর ত কোন অভাব, কোন দাবি সে অপূর্ণ রাখেনি ! তবে ভয় কাকে ? লজ্জা কাকে ? সকলকে সব এমন ভাবে দিতে পেরেছে বলেই ত আজ সবাই তার এত প্রশংসা করে—সবাই তার খ্যাতিতে এমন মুখর ! তার অন্তর নিংড়ে শেষ যেটুকু দেয় ছিল, তাও ত সে উজাড় করে দিয়েছে। কর্তব্য পালনে কোথাও সে এতটুকু ত্রুটি হতে দেয়নি। তবে কিসের লজ্জা—কিসের সঙ্কোচ ! হরিবিলাসবাবু যদি তাকে ভালবেসেই থাকেন—যদি তার জন্যে তিনি এত দিন তপস্যা ক'রে থাকেন—যদি এমন বিরাট, এমন মহানুভব চরিত্র তিনি লাভ ক'রে থাকেন শুধু তারই সঙ্গ পাবার লোভে, তাকে চোখে দেখার জন্যে, তাতে অন্যায় কি আছে ! মানুষ একজনকে এমনভাবে ভালবাসতে পারে এটাই ত সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার !

এই সব চিন্তা করতে করতে হরিবিলাসবাবুর মুখের কথাগুলি যেন তার কানে এসে বাজতে থাকে, 'দীর্ঘ আঠারো বছর ধরে শুধু তিলে তিলে পলে পলে যাকে পাবার জন্যে তপস্যা করেছি।'—সুরমা আর ভাবতে পারে না। তার সমস্ত অন্তর তখন চীৎকার ক'রে বলে ওঠে, এর মধ্যে কোথাও এতটুকু কালিমা নেই, কোথাও এতটুকু অন্যায় নেই, বরং এই ভালবাসার সে কোন স্বীকৃতি দেয়নি বলে ঈশ্বরের কাছে সে অপরাধী হয়েছে ! সমাজে সংসারে প্রত্যেকের প্রতি যেমন তার কর্তব্য আছে, তেমনি কি নেই হরিবিলাসবাবুর প্রতি ? তার মন দৃঢ়স্বরে বলে ওঠে, নিশ্চয়ই ! তাঁর এই সুবিরাট ভালবাসার বিনিময়ে কি কিছু দেবার নেই তাঁকে। লজ্জা,

সমাজের ভয়, পাপ কোথায়? হরিবিলাসবাবুকে ঘৃণা করায়, না তাকে ভালবাসায়! এমনি ভাবে একদিন হরিবিলাসবাবুর প্রতি তার কর্তব্যের কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তাঁর মুখের কথাগুলি আবার একে একে গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত তার মনের দুয়ারে এসে যেন হাতুড়ির ঘা মারতে লাগল, সুরমা ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসলো।

তার স্বামীর ঘুম ভেঙ্গে যায়। তাড়াতাড়ি সুরমার একটা হাত ধরে বলেন, কি হয়েছে, তুমি ঘুমোতে পারছো না কেন—শরীরটা কি খারাপ?

সুরমা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস চেপে নিয়ে বলে, কি জানি, কিছুতেই ঘুম আসছে না চোখে।

তার স্বামীর কণ্ঠে এবার স্নেহ উথলে পড়ে। বলেন, আমি একটু বাতাস করছি মাথায়, তুমি ঘুমোবার চেষ্টা করো।

সুরমা বিছানা থেকে নেমে কুঁজো থেকে ঢকঢক ক'রে এক গেলাস জল গড়িয়ে বেশ ক'রে মাথায় মুখে চোখে দিয়ে এসে আবার শুয়ে পড়ে, কিন্তু তবু ঘুম আসে না। চোখে।

রাত দেড়টা। সারা পল্লীগ্রাম যেন অন্ধকারে স্তব্ধ। হরিবিলাসবাবু চুপ করে একটা চেয়ারে বসে আছেন। তাঁর সামনে একটা কেরোসিনের টেবিল-ল্যাম্প টিপটিপ ক'রে জ্বলছে—আর একটা অর্ধসমাপ্ত লেখার ওপর তাঁর কলমটা পড়ে আছে। যেন লেখাতে তাঁর মন নেই, এ জগৎ থেকে তিনি কোন্ দূর লোকে চলে গিয়েছেন—তাঁর কপালে কতগুলি গভীর রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। স্কুলের বার্ষিক রিপোর্ট! সেক্রেটারীর লেখবার কথা কিন্তু ফি-বারেই তাঁকে লিখে দিতে হয়। এ কাজটা অবশ্য তাঁর কাছে অতি সহজ! এতে চিন্তার কোন কারণ থাকতে পারে না! তবু এই গভীর রাত্রে তাঁর মত জ্ঞানী, গুণী, বিদ্বান, বুদ্ধিমান সর্বত্যাগী দেশপ্রেমিক কিসের চিন্তায় মগ্ন, তা একমাত্র বুঝি ঈশ্বরই জানেন!

সুরমা ঘুমোচ্ছিল। হঠাৎ যেন একটা দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠলো। তার স্বামী গিয়েছেন জমিদারীর কাজে—মেয়েটা ও ছেলেটা অগাধে নিদ্রা যাচ্ছে। বিছানা থেকে নেমে সে জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়াল। খোলা জানলা দিয়ে যতদূর দেখা যায়—শুধু পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকার—ঘন, গাঢ়, জমাট! কিন্তু মাটির দিকে চোখ পড়তেই হঠাৎ সুরমা শঙ্কিত হয়ে উঠলো। হরিবিলাসবাবুর জানলা থেকে একটা ক্ষীণ আলোর রশ্মি এসে

পড়েছে বাইরে। তবে কি তিনি এখনো জেগে আছেন? ঘুমোননি! ক'দিন ধরেই ত তাঁর শরীর খারাপ যাচ্ছে। হয়ত শরীর আরো খারাপ হয়ে পড়েছে। কে জানে? সঙ্গে সঙ্গে তার সমস্ত মন যেন একসঙ্গে কেমন করে উঠলো। সে আর ঘরে স্থির থাকতে পারলে না। পা টিপে টিপে নীচে নেমে এলো এবং নিঃশব্দে তাঁর ঘরের উন্মুক্ত দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। তখনো হরিবিলাসবাবু তেমনি নিস্তব্ধ হয়ে বসেছিলেন, যেন এ জগতের মানুষ তিনি নন—সকল সুখ-দুঃখের অতীত কোন্ অজ্ঞাত লোকের চিন্তায় মগ্ন।

সুরমা আর চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলে না। একেবারে ঘরের মধ্যে ঢুকে ধীরে ধীরে তাঁর চেয়ারের কাছে এগিয়ে গিয়ে বললে, তুমি কি আমায় স্থির হতে দেবে না? কেন তুমি এমন ক'রে চিন্তা করো—কি চিন্তা করো!

হরিবিলাসবাবু সুরমার মুখ থেকে এই প্রথম শুনলেন 'তুমি'। াই সেই শব্দটি কানে যাওয়া মাত্র তাঁর সর্বশরীর যেন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে বিস্মিত ও সচকিত হয়ে তিনি পিছন ফিরলেন। তারপর চেয়ারের হাতলের ওপর থেকে সুরমার হাতটা সরিয়ে দিতে দিতে বললেন, ছি সুরমা—এত রাত্তিরে—এমন করে আমার কাছে আসতে নেই—তুমি শিগগির ঘরে চলে যাও—লক্ষ্মীটি—

ছেলেমানুষের মত সুরমা বললে, না যাবো না—বলো আগে তুমি কেন আমায় এমন ক'রে কষ্ট দাও? তুমি দিনরাত যে কি ব্যথা বুকে বহন করছো তা কি আমি বুঝতে পারি না, ভাবো?

তা ভেবে ত আমার কোন লাভ নেই!

তোমার লাভ নেই কিন্তু আমার ত আছে। এই বলে মুহূর্ত-কয়েক চুপ ক'রে থেকে সে আবার বললে, কেন তুমি আমার জন্যে সমস্ত ছেড়ে এখানে এলে? আর যদি এলেই, তবে কেন আমায় এমন ক'রে জাগালে। তোমার কি চোখ নেই—তুমি কি দেখতে পাও না যে আমি কি ছিলুম আর কি হয়েছি। তোমার চিন্তায়, তোমার ধ্যানে, তোমার কাজে—তোমার সকল রকম কল্পনায় যে আমি দিনরাত ডুবে আছি, সে কি তুমি বুঝতে পারো না?

হরিবিলাসবাবু এর অর্থ ঠিক বুঝতে না পেরে তার মুখের দিকে নীরবে তাকিয়ে রইলেন। সুরমা আবার বলতে শুরু করলে, তুমিই ত আমায় এ সংসার থেকে টেনে এনে এমন এক জায়গায় রেখেছো যেখানকার আকাশে বাতাসে নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে কেবল তুমি, তোমার আদর্শ, তোমার স্মৃতি, তোমার গায়ের গন্ধ! আর কি চাও তুমি, বলো আর কি চাও—যা ছিল আমার সব ত দিয়েছি—তাতেও যদি তোমার

আশা না মিটে থাকে ত বলো তোমার আরো কি চাই—ওগো তোমার পায়ে পড়ি—এই বলে তার পায়ের ওপর আছড়ে পড়ে সুরমা ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

হরিবিলাসবাবু পাষাণের মত নীরব ও নিশ্চল হয়ে বসেছিলেন।

সুরমা আবার বললে, আমার অদেয় আর কি আছে তোমাকে বলো—

এইবার হরিবিলাসবাবু ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। কম্পিতকণ্ঠে বললেন, আমি আর কিছু চাই না, তুমি শুধু ঘরে যাও, যদি কেউ তোমাকে এই অবস্থায় দেখে ফেলে?

ফেলুক তাতে আমার কোন মান-অপমান নেই—আমার জন্যে তুমি অনেক সহ্য করেছো—বলতে বলতে সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

এইবার তার দু'টি হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে হরিবিলাসবাবু ধীরে ধীরে তার মুখটি উঁচু করে তুলে ধরলেন, তারপর চোখের জল মুছিয়ে দিতে দিতে বললেন, রমা, একটা কথা বলবো, বিশ্বাস করবে?

বিশ্বাস? তুমি কি জানো না যে তোমার কথা আমার কাছে বেদবাক্যের সমান!

একদিন মনে হতো তোমার দেহটাই বুঝি আমার কাম্য, তা না পেলে আমি পাগল হয়ে যাবো। কিন্তু সুরমা আজ তুমি আমার সে ভুল ভেঙ্গে দিলে।—আমার মনে আর কোন ক্ষোভ নেই। আমার সমস্ত চাওয়া-পাওয়া সার্থক হয়েছে। এখন আমি বুঝতে পেরেছি যে আমি যা চেয়েছিলুম তার চেয়ে অনেক বেশী তুমি আমায় দিয়েছো দূরে থেকে।

মোহাচ্ছন্নের মত সুরমা তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে অস্ফুটস্বরে বললে, বেশী দিয়েছি—সত্যি!

হরিবিলাসবাবু বললেন, হাঁ। এই নাম, এই যশ, প্রতিপত্তি, পাণ্ডিত্য সবই ত তুমি দিয়েছ—তোমার জন্যই ত আমি সব পেয়েছি। তা না হ'লে আজ আমি কোথায় থাকতুম, আর কে-ই বা জানতো আমার নাম! আমি এতদিন তা ভাল করে বুঝতে পারিনি—আজ আমার সকল ভ্রম দূর হলো তোমায় এমনভাবে কাছে পেয়ে। তুমি আমায় কি দিয়েছো জানো না!···লক্ষ্মীটি এইবার তুমি ঘরে চলে যাও···

সুরমা স্বপ্নাবিষ্টের মত হরিবিলাসবাবুর মুখের দিকে চেয়েছিল।

হরিবিলাসবাবু দুটি হাত জোড় ক'রে বললেন, রমা, আর দেরি করো না—যদি কেউ এই অবস্থায় তোমায় দেখতে পায় তাহ'লে তোমার কি হবে একবার ভেবে দেখেছো কি?

সুরমা যেন সহসা শিউরে উঠলো। তারপর ঈষৎ হেসে বললে, কলঙ্কিনী বলবে

—অপবাদ দেবে? তা দিক্! তোমার জন্যে আজ আমি সমস্ত মাথায় তুলে নিতে প্রস্তুত।

ছি ছি রমা—তোমার মুখে একথা শোভা পায় না। তুমি কি জানো না যে তোমার কলঙ্ক আমি কোনদিন সহ্য করতে পারবো না! লক্ষ্মীটি—ঘরে যাও—এই বলে হরিবিলাসবাবু এমনভাবে তার মুখের দিকে তাকালেন যে সে আর সেখানে বসে থাকতে পারলে না। দ্রুতপদে বেরিয়ে গেল।

বাকী রাতটুকু কোথা দিয়ে যে কেটে গেল, হরিবিলাসবাবু তা বুঝতেই পারলেন না। তিনি ঠিক তেমনিভাবে সেই চেয়ারটায় বসে রইলেন।

রঙ খেলা

চুপি-চুপি রঙ এনে লুকিয়ে রাখে অজিত।

কাল ফাগুয়া। লছমী এলে তাকে মাখিয়ে দেবে—একেবারে অতর্কিতে। তার পরের অবস্থাটা অজিত আর ভাবতে পারে না। বিকশিত গোলাপের দলগুলির মত তার মন যেন আজ কোন ভর সইতে পারে না—চিন্তাব লঘু স্পর্শেই বুঝি ঝরে পড়ে যায়।

আবার কল্পনায় লাগে রঙ। মনেব আকাশে ভিড় করে আসে রঙিন মেঘেরা! অজিতেব চোখের সামনে দেখতে দেখতে ফুটে ওঠে লছমীর সেই আঁটসাঁট সুপুষ্ট দেহ, আর তার ভাঁজে ভাঁজে জড়ানো একটা খাটো শাড়ি, তারি দেওয়া রঙ লেগে লাল হয়ে আছে—যেন কালো পাহাড়ের বুকে গুচ্ছ গুচ্ছ পলাশ ফুল ফুটেছে।

অজিতেব মন এইবার চলে যায় আরো কোথায়—কোন্ সুদূরে। ভ্রমরের ছোঁয়া লেগে প্রথম কেঁপে-ওঠা ফুলেব কেশরের মত তার বুকের শিরায় উপশিরায় যেন কিসেব একটা শিহবণ জাগে। কল্পনায় সে আবার দেখে, সেই রঙিন শাড়িটা পবে দাঁড়িয়ে আছে লছমী, তার মুখে চোখে অপরূপ সলজ্জভাব! সে ভাবে, সে যখন তাকে রঙ মাখিয়ে দেবে তখন হযত খিলখিল করে হেসে উঠে লছমী তাব হাতের রঙটা কেড়ে নিতে এসে বলবে, এইসা মাত্ কবো—মুঝে তুম্ বঙ্ মাত্ লাগাও বাবুজী। আব তখন অজিতও তার কথায় কান না দিয়ে আরো এক ঝলক বঙ তাব বুকের ওপর ছুঁড়ে মেবে পালিয়ে যাবে বাগানেব দিকে—যেখানে অশোক-পলাশ গাছগুলো ফুলে ফুলে লাল হয়ে মাটির ওপব ঝুঁকে আছে। তাবপর সেই দিকে আঙুল দেখিয়ে লছমীকে বলবে—আমার অনুরাগের রঙে তোমাব সর্বাঙ্গ আজ ওই রকম রঙিন হয়ে উঠুক।

লছমী তখন তার পিছু পিছু ছুটে এসে হয়ত তার-ই হাতের রং কেড়ে নিযে তাকেই লাগাতে আসবে। অজিত কিন্তু তাতে রাজী হবে না। বলবে, আমার রঙ আমি তোমায় কিছুতেই দেবো না। আজ আমি চাই তোমার হাত থেকে, তোমাব রঙ।

তখন সে একটু থেমে, তার টোল-খাওয়া গালে হাসি টেনে এনে হয়ত বলবে, সাচ্? সত্যি! তারপর অজিতের মুখের দিকে চেয়ে ছোট্ট করে বলবে, তুমি রঙ না দিলে আমি কোথায় পাব রঙ! এইবার অজিত কৃত্রিম অভিমান কণ্ঠে এনে

বলবে, আজকের দিনে তোমার মনের কোণে যদি আমায় দেবার মত কোন রঙ না থাকে ত দিয়ো না।

লছমী তখন তার আঁচলের প্রান্ত থেকে একমুঠি শুকনো আবির বার করে তাকে মাখিয়ে দিতে দিতে বলবে, বাবুজী, তুমি যে রোগা মানুষ, বেশি রঙ তোমার শরীরে সহ্য হবে না।

অজিত বলবে, আজ আমি সম্পূর্ণ সুস্থ, আজ আমি তোমার কোন বাধা, কোন শাসন শুনব না।

প্রথমটা মিষ্টি কথায় তাকে নিবৃত্ত করতে লছমী চেষ্টা করবে, কিন্তু যখন সে কিছুতেই রাজী হবে না, তখন রঙে তার সর্বাঙ্গ ভরিয়ে দিয়ে তারপর হয়ত আস্তে আস্তে নিজের আঁচলের প্রান্ত দিয়ে তাকে মুছিয়ে দিতে যাবে।

অজিত কিন্তু কিছুতেই সে রঙ মুছতে দেবে না। বলবে, তোমার রঙ আজ আমার সারা দেহ-মনে ভরে থাক।

লছমী এইবার অনুনয় করে বলবে, মাইজী দেখতে পেলে কি মনে করবে!

অজিত তার হাতটা তখন চেপে ধরে বলবে, আজ শুধু মাইজীকে কেন, সারা পৃথিবীকে আমি দেখাবো তোমার রঙ লছমী।

ছিঃ কি পাগলামি কর। বলতে বলতে তার গলাটা হয়ত একটু কেঁপে উঠবে। কিন্তু অজিতের কণ্ঠে তখন উৎসাহের আগুন জ্বলে উঠছে। সে বলবে, পাগলামি নয় লছমী, আজ আমি সকলের সামনে বলব যে, তোমায় ভালবাসি।

ছিঃ ছিঃ ছিঃ, ওকথা বলতে নেই। বলতে বলতে লছমী হয়ত ছুটে পালাবে বাড়ির মধ্যে—

তার পরের অবস্থাটা অজিত যেন আর কল্পনা করতে পারে না। কিসের একটা আবেশে যেন তার সারা দেহ ঝিমিয়ে আসে।

একটু পরে তার সে আচ্ছন্ন ভাবটা আবার কেটে যায়, সে আবার চিন্তামগ্ন হয়।

এবার সে নিজেকে দেখে একাকী বাগানের মধ্যে পায়চারি করতে। তারপর হঠাৎ এক সময় আবার নিজেই ঘরের দিকে এগিয়ে যায় যেন।

কিন্তু ঘরের কাছে গিয়ে সে চমকে ওঠে, দেখে লছমী চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে তার খাটের একটা বাজু ধরে।

অজিতও কিছুক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর পা টিপে টিপে তার পিছনে গিয়ে তার বাঁ হাতটিকে নিজের হাতের মধ্যে টেনে নেবার জন্যে যেমন তাকে ছোঁয়, অমনি তার সর্বাঙ্গে যেন কাঁটা দিয়ে উঠে। সে স্পর্শে অজিতের বুকেও এক অননুভূত

শিহরণ জাগে। এবার তার চোখের সঙ্গে লছমীর চোখের মিলন হতেই সে ঘাড়টি একটু বেঁকিয়ে দৃষ্টি নত করে নেয়।

সহসা অজিতের বক্ষের মাঝে আবার কিসের এক ঝড় ওঠে। নিমেষে যেন তার হাতটা জোরে চেপে ধরে বলে, লছমী, তুমি আমার জীবনের এই চরম লগ্নটিকে ব্যর্থ করে দিয়ো না। চেয়ে দেখ, সারা প্রকৃতি আজ মেতে উঠেছে তোমার রঙে, পলাশ-শিমুলের বুকে লেগেছে তোমার অনুরাগ, আমলকীর বনে মলয় পবন তোমারই জন্যে হয়েছে উতলা।

বিহ্বল দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে লছমী। অজিতের এসব কথার অর্থ সে সম্যক উপলব্ধি করতে না পারলেও তার মূলগত ভাবটি যেন বুঝতে পারে! তাই যেন যা বলতে চায় তা সে বলতে পারে না। কিসের একটা আবেগে তার গলাটা কেঁপে কেঁপে ওঠে। অবশেষে একসময়ে কি মনে ক'রে সে বলে ফেলে, বাবুজী, আমি যে তোমার বাড়ীর চাকরানী—

এইবার অজিতের রাগ হয়। সে তার মুখের কথাটা কেড়ে নিয়ে বলে, ছিঃ, ও কথা বলে আমায় তুমি অপমান করো না।

অপমান? সহসা লছমী তার মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে অজিতের চোখের ওপর তার ডাগর দু'টি চোখ মেলে ধরে। তারপর ধীর ও অকম্পিতস্বরে বলে, আমি তোমার বাড়ীতে নোকরী করি, আর তার জন্যে তুমি আমায় পাঁচটাকা মাইনে দাও মাসে, ভুলে যেয়ো না বাবুজী।

অজিত একটু চুপ করে থেকে বলে, আর কিছু কি তোমায় দিইনি আমি?

লছমী ধীরে ধীরে তার দৃষ্টি নত করে নিয়ে বলে, কি দিয়েছ? আজ পাঁচমাস তোমার কাজ করছি—পাঁচটা পয়সাও ত কোনদিন বকশিশ দাওনি।

অজিত বলে, কিন্তু তুমি ত কোন দিন তা চাওনি?

যে বকশিশ চেয়ে নিতে হয়, তা আমি চাইনে বাবুজী।

অজিতের কণ্ঠে এবার অধীরতা প্রকাশ পায়। সে বলে, তাহলে আজ অযাচিত-ভাবে যে বকশিশ তোমার হাতে তুলে দিচ্ছি তা কি তুমি নেবে না লছমী?

লছমীর চোখ-মুখ হঠাৎ যেন উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। সে দু'হাত দিয়ে সজোরে অজিতের হাতটা চেপে ধরে অস্পষ্ট স্বরে বলে, বাবুজী, এ কি সত্যি?

অজিত তার হাতে আর একটু চাপ দিয়ে বলে, এত বড় সত্যি জীবনে আর কখনো বলিনি লছমী!

আনমনে এমনি সব কত কি ভাবছিল অজিত, কিন্তু সহসা পিসিমার তীব্র কণ্ঠস্বরে সব যেন ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। ভেতর থেকে তিনি বলে উঠলেন,—হ্যাঁরে অজু, এখনো তুই বারান্দায় বসে রয়েছিল—কখন্ সন্ধ্যা হয়ে গেছে, ঠাণ্ডা লাগবে যে—ভেতরে আয়।

অজিত বললে, আমি শাল মুড়ি দিয়ে বসে আছি পিসীমা, ঠাণ্ডা লাগবে কেমন করে?

পিসীমা বললেন, ক'টা দিন একটু ভাল আছিস, ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছিলি—তা বুঝি আর সহ্য হচ্ছে না?

অজিত বললে, আমি ভাল হয়ে গেছি। আচ্ছা দেখে নিয়ো আর আমার জ্বর হবে না!

আহা! মা কালী যেন তাই করেন! বাড়ি ফিরে আমি জোড়া পাঁঠা বলি দেব। বলতে বলতে তিনি আবার নিজের কাজে চলে গেলেন।

একটা ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে অজিত শুয়েছিল বারান্দায়। সামনের যে রাস্তাটা মাঠের ওপর দিয়ে এঁকে বেঁকে দূরে পাহাড়ের কোণে গিয়ে মিশেছে, সে তাকিয়েছিল সেই দিকে। কিছুক্ষণ আগে লছমী চলে গেছে সেই পথ দিয়ে। প্রতিদিন সন্ধ্যার আগেই সে আলোটা তার ঘরে জ্বালিয়ে রেখে চলে যায়, নিজের বাড়ী—মাঠটার ওপারে কোন্ এক অজানা গাঁয়ে। রোজই এমনি তার চোখের সামনে দিয়ে সে চলে যায়, কিন্তু সেদিন হঠাৎ কেন তার মনে লছমীর চিন্তা এমন-ভাবে পেয়ে বসল তা কে জানে!

সেদিন ছিল শুক্লা চতুর্দশী। পূর্ণিমার আগের দিন। তখনি জ্যোৎস্নায় ভরে গেছে চারিদিক। মাদলের শব্দ দূর থেকে ভেসে এসে সেই নির্জন প্রান্তরের বুকে যেন কিসের এক মধুর সুর ভরে তুলছিল। সেদিকে চেয়ে চেয়ে অজিতের মনে কেবলি জাগছিল লছমীর কথা! সেই প্রথম দিন থেকে আজ পর্যন্ত তার প্রতিটি কথা, প্রতিটি ব্যবহার, তার চোখের সামনে যেন একসঙ্গে ভেসে উঠছিল।

এক বুড়ি পিসিমার সঙ্গে অজিত এসেছিল হাওয়া বদলাতে বিহারের এই স্বাস্থ্যকর পল্লীতে। প্লুরিসিতে এক বছর ভোগবার পর ছ'মাস ধরে ঘুসঘুসে জ্বর আর ছাড়ে না। তার সঙ্গে অল্প অল্প কাশিও ছিল। ডাক্তারেরা গম্ভীর মুখে বলেছিল, রোগটা খারাপ, বায়ু পরিবর্তন করলে যদি কিছু হয়! তাই এই পিসীর সঙ্গে অজিত এসেছিল এখানে। কিন্তু তাকে সেবা করবার লোক খুঁজে খুঁজে পিসী হয়রান! টাকা বেশি, কম—সব রকম দিয়ে দেখেছেন। কিন্তু কেউই এই খারাপ ব্যাধির

পরিচর্যা করতে রাজী হয় না। একদিন দু'দিন কাজ করে লোক পালিয়ে যায়।

বেচারী পিসিমা একা হিমসিম খেয়ে যান! না পারেন সম্মমত রোগীকে ওষুধ-পথ্য খাওয়াতে, না পারেন তার ঘর-দোর পরিচ্ছন্ন রাখতে। তাই কয়েকদিন এইভাবে কাটবার পরই সেখান থেকে অন্যত্র চলে যাবার কথা তিনি চিন্তা করতে লাগলেন।

এমন সময় ঈশ্বরের আশীর্বাদের মত কোথা থেকে এসে পড়লো লছমী! বলিষ্ঠ একহারা চেহারা—যেন পাথর দিয়ে তৈরি।

অজিতের ঘরে নিয়ে গিয়ে পিসীমা তাকে কি কি কাজ করতে হবে সব বুঝিয়ে দিলেন। অজিত চাদর মুড়ি দিয়ে বিছানায় শুয়েছিল, তার রুগ্ন মুখের দিকে চেয়ে মেয়েটি বললে, কেত্‌না মাহিনা দেগা?

পিসিমা বললেন, তুই কত নিবি বল্ না?

মেয়েটি একটু মুচকি হেসে বললে, তুমি কত দেবে বল?

পিসিমা একটু থেমে ঢোক গিলে বললেন, পাঁচ টাকা!

আশ্চর্য! মেয়েটি এক কথায় রাজী হয়ে গেল। অথচ এর আগে দশ টাকা পর্যন্ত কত লোককে তিনি দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু লোক পাননি! আড়ালে ডেকে অজিত পিসিমাকে বললে, কাজটা তুমি ভাল করলে না, যদি এত কম মাইনে বলে ছেড়ে দেয়।

পিসিমা বললেন, বেশি মাইনে দিয়েও ত দেখেছি—লোক থাকেনি। তবে যদি একান্ত তেমন দেখি ত তখন বাড়িয়ে দিলেই হবে!

কি আশ্চর্য! একদিন, দু'দিন করতে করতে একমাস দু'মাস যখন কেটে গেল, তখনো সে কোন বেশি মাইনের কথা উত্থাপন করলে না, উপরন্তু যে-সব কাজ তার করবার কথা নয়, তাও সে করে দিতে লাগল।

যত সে কাজ বেশি করে তত কিন্তু অজিত মনে মনে একটা অস্বস্তি অনুভব করে। কেমন যেন নিজেকে তার কাছে অপরাধী বলে মনে হয়। অজিত রোজই ভাবে তাকে নিষেধ করবে কিন্তু বলতে গিয়েও পারে না। কি ভেবে যেন তার সব কথা আটকে যায়। শেষে একদিন বৈকালে অজিতকে যখন ধরে ধরে ইজিচেয়ারে বসিয়ে দিয়ে সে চলে যাচ্ছিল, তখন অজিত তাকে কাছে ডাকলে।

লছমী তার পাশে এসে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলে, কেন?

অজিত একটু থেমে বললে, আচ্ছা, তুমি যে আমার এত সেবা করো, কিন্তু আমার কি রোগ সেটা জানো?

লছমী বললে, না।

অজিত সঙ্গে সঙ্গে চুপ্ করে গেল। বলবে কি বলবে না—এই নিয়ে তার মনের মধ্যে সহসা একটা তুমুল দ্বন্দ্ব চলে। তাই একটু পরেই সে আবার তাকে বললে, আমার কথা তোমার বিশ্বাস হবে তো?

লছমী এর কোন জবাব দেবার আগেই অজিত আবার বলতে শুরু করলে এবং রোগের বিষয় একটি কথাও গোপন করলে না।

লছমী তার মুখের দিকে চেয়ে শুনছিল। তার কথা শেষ হতে অজিত দেখলে পাথরের মূর্তির মত সে শুধু নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার সেই স্তব্ধ ও নীরব মুখের দিকে তাকিয়ে অজিতও যেন আর কিছু বলতে পারলে না, তেমনিভাবে চুপ করে রইল। তারা যেন এক নিঃসীম নিস্তব্ধতার উপকূলে দু'জন দাঁড়িয়ে আছে।

চিত্রার্পিতের মত অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে এক সময় লছমী সেখান থেকে চলে গেল, অজিতকে যেন দেখতেই পেলে না।

সে চলে যেতে অজিত একটা গভীর নিঃশ্বাস ত্যাগ করলে। যেন এইমাত্র একটা বিরাট কর্তব্য সে সম্পন্ন করে বাঁচল। লছমীর ভাব-ভঙ্গি দেখে তখন অজিতের মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছিল যে কাল থেকে সে আর তার কাজ করতে আসবে না।

কিন্তু পরের দিন ভোরে যথারীতি আবার তাকে কাজ করতে আসতে দেখে অজিত রীতিমত বিস্মিত হল। তাছাড়া সে লক্ষ্য করলে সেদিন থেকে তার প্রতি লছমীর সেবা-যত্নটা যেন আরও বেড়ে গেছে।

সে সম্বন্ধে আর অজিত তাকে কোন প্রশ্ন করলে না। তবে একদিন দুপুরে সে যখন তার বিছানাটা বদল করে দিচ্ছিল তখন অজিতের মনে ভারি কৌতূহল হ'ল। সে তাকে জিজ্ঞেস করলে, আচ্ছা লছমী, তোমার ভয় করে না আমার কাছে আসতে, আমার সেবা করতে?

লছমী বললে, কেন?

অজিত বললে, আমার খারাপ রোগের কথা শুনে?

লছমী তখন তার মুখের ওপর গভীর দৃষ্টি মেলে শুধু ধীরে ধীরে বললে, ওকথা আর কোনদিন আমার সামনে তুমি মুখে এনো না বাবুজী!

অজিত বললে, কেন লছমী?

লছমী এর কোন জবাব না দিয়ে চুপ করে রইল। অজিত একটু থেমে আবার বললে, কেন লছমী?

তার মুখ থেকে এর জবাব শোনবার জন্যে সে যেন অধীর হয়ে ওঠে।

লছমীর চোখের কোণে এবার দু'ফোঁটা জল টল টল করে উঠল। সে ছোট্ট করে বললে, জানি না।

আবার পিসিমা ডাকলেন, হ্যাঁরে, এখনও বাইরে বসে বসে কি করছিস—দেখতে পারছিস না—কত রাত হয়ে গেছে?

এই যে যাচ্ছি পিসিমা, বলে অজিত যেন চমকে উঠল। তার সমস্ত কল্পনা যেন নিমেষে কোথায় মিলিয়ে গেল। শালটা তখন ভাল ক'রে গায়ে জড়াতে জড়াতে সে ঘরের ভেতরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল।

পরদিন সকালে ঘুম ভেঙ্গে উঠে লছমীকে না দেখতে পেয়ে অজিতের মনটা খারাপ হয়ে গেল। অন্য দিন তার ডাকে সে নিদ্রা ত্যাগ করে, কিন্তু আজ এত বেলা হয়ে গেল, এখনও পর্যন্ত লছমীর দেখা নেই কেন? আগে ঘরে-বাইরে চারিদিকে সে তাকে খুঁজে দেখলে, তারপর পিসীমাকে গিয়ে জিগ্যেস করলে, লছমী কোথায়। পিসিমা যখন বললেন, সে আসেনি, তখন অজিতের মনে যেন ভীষণ ব্যথা লাগল? ইতিপূর্বে কোনদিন ত সে কামাই করেনি কাজে। তবে আজ এল না কেন? বেলা যত বাড়ে, তত উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তাও যেন বাড়ে অজিতের। সে পথের দিকে ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

আজ হোলি, আজ সে নিশ্চয়ই আসবে! হয়ত কোন কারণে একটু দেরি হ'তে পারে। এমনি করে সে মনে মনে তার না আসার একটা কৈফিয়ৎ খোঁজে। চারিদিকে ঢোল মাদলের শব্দ! পথ দিয়ে রঙ মেখে কত স্ত্রী-পুরুষ চলে যায়। তাদের মুখে হাসি, চোখে কৌতুক দেখে অজিতের মন অস্থির হয়ে ওঠে। বারবার কেবল মনে পড়ে লছমীকে। এই বিদেশে, এই নির্জন বাসে সে-ই যে তার একমাত্র সাথী—ঘরে-বাইরে। তার রুগ্ন অসুস্থ জীবনে আজ কে রঙ ধরালো তা সে জানে না। শুধু এইটুকু জানে যে সেই বিদেশিনী রমণীর অনুপস্থিতির শূন্যতা যেন তার নিঃশ্বাসকে রুদ্ধ করে ধরে—প্রতিমুহূর্তকে বিষণ্ণতায় ভরিয়ে তোলে।

তাই পথের দিকে চেয়ে অজিতের চোখ ক্লান্ত হয় না, তার প্রতীক্ষারত আঁখিতে ঘুম নামে না, বিশ্রাম আসে না। সামনের যে আঁকা-বাঁকা পথটা ঢেউখেলানো মাঠের ওপর দিয়ে অদূরে পাহাড়ের বুকে গিয়ে মিশেছে, সেইদিকে চেয়ে নিঃশব্দে সে বসে থাকে। গাছের পাতা পড়লে চমকে ওঠে, বুঝি লছমীর পায়ের শব্দ মনে করে তাড়া-

তাড়ি পিছনে তাকায়। কিন্তু পরমুহূর্তে শূন্য ঘরের দিকে চেয়ে তার সমস্ত বুকটা যেন হাহাকার করে ওঠে।

হোলির দিন শেষ হয়ে আসে। সকাল ও বিকাল যখন যায় যায়, তখন সহসা অজিত যেন শিউরে উঠল। একটা ফুলন্ত গাছ থেকে সব ফুল ঝরে পড়ে যেতে দেখলে বুকের মধ্যেটা যেমন করে ওঠে তেমনি হ'ল তার অবস্থা। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে তখন উঠে দাঁড়াল। তারপর সামনের মাঠটার দিকে তাকিয়ে কতটা পথ মনে মনে একবার হিসাব করে নিয়ে চুপি চুপি রওনা হ'ল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণপ্রায়। চাঁদের আলোয় পথঘাট, গাছপালা, পাহাড়, নদী সব পরিপ্লাবিত করে পূর্ণিমার চাঁদ সামনের ছোট পাহাড়টার মাথার ওপর যেন স্তব্ধমুখে চেয়ে আছে। ধীরপদে অজিত গিয়ে পৌঁছল লছমীর ঘরের সামনে।

তাকে দেখে প্রথমটা যেন লছমী বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। তারপর ছুটে গিয়ে তার হাতটা চেপে ধরে ভয়ব্যাকুলকণ্ঠে বললে, বাবুজী, তুমি এ কি করলে? এতটা পথ কেন হেঁটে এলে? তুমি যে এখনও ভাল করে সুস্থ হওনি।

অজিতের নাক মুখ দিয়ে তখন দ্রুত নিঃশ্বাস পড়ছে, সর্বদেহ ক্লান্তিতে ভেঙে আসছে। তাই লছমীর হাতটা চেপে ধরে সেইখানে আগে সে বসে পড়ল। তারপর অতি কষ্টে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, তুমি আজ যাওনি কেন, তাই ত আমি এলুম!

লছমী ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, বাবুজী, কি অন্যায় যে তুমি করেছ এতটা পথ এসে, তা বলবার নয়।

অজিতের মুখ দিয়ে যেন কথা বেরুচ্ছিল না, তবু বললে, অন্যায় আমার না তোমার?

লছমী একটু চুপ করে থেকে শুষ্ককণ্ঠে উত্তর দিলে, এখন বুঝতে পারছি যে অন্যায়টা আমার। আমি যদি যেতুম তা'হলে ত আর তোমাকে কষ্ট করে এতটা পথ আসতে হ'ত না। তারপর একটু থেমে লছমী অজিতের মুখের ওপর তার দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বললে, আমি কি ইচ্ছা করে যাইনি তুমি মনে করো?

অজিত ক্লান্তস্বরে বললে, আজ ফাগুয়ার দিন, আমি কত আশা করে—

আর বলতে দিলে না। লছমী তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললে, ফাগুয়ার দিন বলেই ত বাড়ি থেকে বেরোইনি বাবুজী। তারপর ম্লান চোখে তার মুখের দিকে

তাকিয়ে বললে, রাস্তায় বেরুলে পাছে কেউ রঙ দিয়ে কাপড় নষ্ট করে দেয়, এই ভয়ে ঘর থেকে আজ একেবারে বার হইনি, আমার যে একখানার বেশী শাড়ি নেই—

এই কথাটা অজিতের বুকে যেন একটা নিদারুণ আঘাত হানলে। আগেই চুপি চুপি সে তার জামার পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিয়েছিল রঙ বার করে লছমীকে মাখাবে বলে, কিন্তু আর পারলে না। তার হাতের রঙ হাতের মুঠির মধ্যে যেন কালি হয়ে গেল। শুধু অজিত ঘাড় উঁচু করে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল, যেন কি সে বলতে চায় কিন্তু পারছে না—অন্তরে কিসের একটা সংগ্রাম চলেছে। তার মুখের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে লছমীও যেন সেই না-বলা কথাটির প্রতীক্ষা করছিল। সহসা বুকটা দু'হাতে অতি কষ্টে চেপে অজিত শুধু 'লছমী' বলে ডেকেই তার কোলের ওপর লুটিয়ে পড়ল।

লছমী তাড়াতাড়ি তার মাথাটা উঁচু করে তুলে ধরতে গিয়ে দেখলে, অজিতের গাল বেয়ে ঝলকে ঝলকে রক্ত পড়ছে, তার জামার সমস্ত বুকটা তাতে লাল হয়ে উঠেছে। সঙ্গে সঙ্গে নিজের দিকে তাকিয়েও সে চমকে উঠল। তার বুকের কাপড়-টাতে অজিত যেন হোলির রঙ ঢেলে দিয়েছে—রক্তে লাল টকটক করছে !

চেঞ্জার

শশধরবাবুর পায়ের বিরাম নেই! কেবল ঘুরছেন টো-টো করে। ভোরবেলা সেই যে মর্নিংওয়াক করতে বেরোন মোটা লাঠি হাতে ক'রে, সেই থেকে শুরু হয় তাঁর ঘোরা, তারপর কতবার আসেন, আর কতবার যে যান তার ঠিক-ঠিকানা নেই! তবে প্রত্যেকবারই কিছু না কিছু খাদ্য-সামগ্রী হাতে নিয়ে বাড়ী ঢোকেন। কখনও একটা পাকা পেঁপে, কখনও গোটা-দুই ডিম, কখনও একটা মুরগীর ছানা, কখনও বা কিছু [illegible]—এ ছাড়া ভালোমন্দ দ্রব্য যখন যেটা পান, হাতছাড়া করেন না।

কিন্তু স্বামীর এই বার বার বাজার করাটা মনোরমা একেবারে পছন্দ করেন না। তাই শশধরবাবুকে বাড়ী ঢুকতে দেখলেই তিনি গজ গজ করতে থাকেন,—পেট ছাড়া দুনিয়ায় আর কি কিছু বিধাতা তোমায় দেননি?

বলা বাহুল্য, এই মনোরমার স্বাস্থ্যের জন্যই তিনি এখানে 'চেঞ্জ'-এ এসেছেন এবং তাঁকে-ই ভাল জিনিস খাওয়াবার জন্যে শশধরবাবু সর্বদা এইভাবে ব্যস্ত থাকেন। তাই গলার স্বরকে বিকৃত করে শশধরবাবু স্ত্রীর কথার জবাব দেন, বলি তোমার জন্যেই ত যত হাঙ্গামা! তা না হ'লে আমাদের আর কি, যাহোক খেয়েই চলে যেতো!

ঝাঁঝালো কণ্ঠে মনোরমা উত্তর দেন, আমার জন্যে কে তোমায় এই হাঙ্গামা করতে মাথার দিব্যি দিয়েছিল—রোজই ত বারণ করি।

শশধরবাবু বলেন, এক কাঁড়ি টাকা খরচ ক'রে তোমায় যে এখানে আনলুম সে কি শুধু হাওয়া খেয়ে থাকবার জন্যে? তারপর গলার স্বরটা একটু নামিয়ে আবার বলেন, তাও শালা এমন জায়গা যে, পয়সা দিয়েও ভালোমন্দ কিছু পাবার উপায় নেই!

বাস্তবিক—বাজার বলতে এখানে কিছু নেই! শুধু পাহাড়, নদী, শাল-মহুয়ার জঙ্গল চারিধারে! সিনেমা, রেস্টুরেন্ট, দোকান, বাজার-হাট ত দূরের কথা—একটা পাকা রাস্তা নেই, এমন কি কোন রকমের যানবাহন পর্যন্ত নেই! অবশ্য একদিক দিয়ে ভালো, সেই জন্যে এখানকার জল-হাওয়া এখনো ভালো আছে, কারণ সাধারণ চেঞ্জার-বাবুদের কাছে এর কোন আকর্ষণ নেই। শুধু স্বাস্থ্যের বাতিক আছে যাদের শশধর-বাবুর মত, তারাই খুঁজে খুঁজে আসে এখানে! আর তাদেরই ভিড় প্রতি বছর যা হয় তাতে জিনিসপত্রের দাম রীতিমত বেড়ে যায়।

স্টেশনের পাশে যে ছোট্ট বাগানটা তার গাছের তলায় প্রতিদিন চাষীরা কিছু কিছু তরিতরকারী নিয়ে আসে বেচতে। শশধরবাবু আগে থাকতে গিয়ে রাস্তায় এইসব চাষীদের ধরেন, তারপর যার কাছে যেটা ভালো জিনিস দেখেন আগেভাগে সেটা কিনে নেন। তখন যদি অপর কোন বাবুকে ইংরিজীতে 'ড্যামচীপ্' বলতে শোনেন ত তাঁর গা রাগে জ্বলে ওঠে। তিনি একটু চোখ-টিপে নীচু গলায় বলেন, ওদের সামনে একথাটা উচ্চারণ না করলে চলে না মশায়? জানেন, পাঁচদিন আগেও এই লাউটা চার পয়সায় বিক্রী হয়েছে!

বলেন কি! আমার কাছ থেকে যে দু'আনা নিলে! ব'লে চেঞ্জার ভদ্রলোকটি চেঁচিয়ে উঠলেন, এই আমাকে নতুন আদ্‌মী পেয়ে ঠকাতা হ্যায়! আমি চার পয়সার বেশী নাহি দেগা! জুয়াচুরি পায়া হ্যায়?

শশধরবাবু বললেন, ওদের দোষ কি? আপনিই ত দাম বাড়িয়ে দিচ্ছেন!

ভদ্রলোকটি তখন একটি সিগারেট ধরাতে ধরাতে ইংরেজীতে বললেন, কত আর কমানো যায় বলুন ত, ও আমার কাছ থেকে চেয়েছিল চৌদ্দ পয়সা। কলকাতায় এর দাম দশ আনা, বার আনার কম কিছুতেই নয়।

শশধরবাবু বার-দুই কেশে গলাটা পরিষ্কার করতে করতে বললেন, সেই জন্যেই ত এত গাড়ী ভাড়া দিয়ে এইসব জায়গায় আসা। তা না হ'লে কার দায় পড়েছে মশায়! এ জায়গায় কি মানুষ আসে?

হেঁ হেঁ হেঁ, তা যা বলেছেন—বলতে বলতে ভদ্রলোকটি আর একজনের কাছে গিয়ে বললেন, এই ছোঁড়া, তোর কাঁচা পেঁপে দুটোর কত দাম নিবি রে?

নিকটেই একটা গাছের ডালে মাংস ঝুলছিল আর কতকগুলি লোক সেখানে ভিড় করে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল। শশধরবাবু গলাটা উঁচু ক'রে জিজ্ঞেস করলেন, কিরে, আজ কি কেটেছিস্ পাঁঠা—না পাঁঠি!

মাংসওলা ছুরি দিয়ে কাঠের ওপর মাংস চোপাতে চোপাতে বললে, ইয়ে বাবু-লোককো পুছিয়ে—

সামনেই যে বেঁটে লোকটি দাঁড়িয়েছিল লোলুপদৃষ্টিতে মাংসের দিকে চেয়ে, সে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, আমার সামনে কেটেছে মশাই,—ফাইন পাঁঠা, দেখছেন না কি রকম কচি!

শশধরবাবু একটু বিজ্ঞের হাসি হেসে বললেন, জানি, তবু ব্যাটাদের বিশ্বাস নেই। তারপর আবার উঁচু গলায় প্রশ্ন করলেন, কত ক'রে সের রে আজ?

দেড় রুপেয়া বাবুজী!

দূর ব্যাটা—রোজ বুঝি তোদের দাম বাড়ছে? এই ত রবিবার দিন তুই পাঁচসিকের বেচেছিলি? এখন বুঝি বাবুদের দেখে দাম বাড়িয়ে দিচ্ছিস? কেউ পাঁচসিকের বেশী দাম দেবে না—দেখি তুই কি করিস!

মাংসওলাটি করুণচক্ষে একবার সকলের মুখের দিকে তাকালে। তারপর বললে, গরীব আদমি—মর্ যায়েগা বাবু!

শশধরবাবু ধমক দিয়ে উঠলেন, তাই বলে বাবুদের নতুন পেয়ে গলা কাটবি নাকি?

একজন শশধরবাবুর কানের কাছে চুপি চুপি বললে, আসবার দিন হাতীবাগানের বাজারে তিন টাকা সের কিনে এসেছি মশায়—তাছাড়া সে যে কিসের মাংস তা কে জানে!

শশধরবাবু বললেন, তা জানি, কিন্তু এইভাবে যদি আপনারা প্রশ্রয় দেন, তাহ'লে দিন দিন এরা মাথায় চড়ে বসবে যে!

তা যা বলেছেন—ওরা বেশ জানে যে, এখন আমরা এদের হাতের মধ্যে এসে পড়েছি—যা ওরা বলবে তাই আমাদের মেনে নিতে হবে!

এই বলে তাঁর কথাটা উপস্থিত সকলেই যেন সমর্থন করলে।

শশধরবাবুর দিকে চেয়ে তখন মাংসওলাটা জিজ্ঞেস করলে, কেত্‌না দেগা আপ্‌কো বাবুজী?

শশধরবাবু বললেন, দেড়পোয়া দেও—আর দেখো, কেবল রান্‌ থেকে দেগা—হাড় যেন একেবারে না থাকে, বুঝলে?

মাংসওলা তাঁর মাংসটা থেকে যথাসম্ভব হাড় বাদ দিয়ে যখন দেড়পোয়া ওজন ক'রে দিলে তখন শশধরবাবু তার কাছে এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'মেটে' দিলি কৈ রে?

মাংসওলা বললে, ও ত আলাদা দামসে বিক্‌তা হায় বাবুজী!

—তা বললে কি চলে—আমাদের কলকাতায় মাংস কিনলেই তার সঙ্গে খানিকটা মেটে সকলকে 'ফাউ' দেয়—দে একটু কেটে।

অগত্যা মাংসওলাকে তাও দু' টুকরো কেটে দিতে হলো।

কিন্তু তাতেও তিনি খুশি হলেন না। বললেন, ও দু'টুকরো নিয়ে কি হবে? তার চেয়ে তুই ফিরিয়ে নে যা দিয়েছিস্।

অপ্রসন্নমুখে মাংসওলা আরও দু'টুকরো তখন শশধরবাবুর কাঁচা শালপাতার দোনার মধ্যে গুঁজে দিলে।

তখন চর্বির দিকে আঙুল দেখিয়ে শশধরবাবু বললেন, এটা কেয়া হায়—চর্বি?

মাংসওলা বললে, জী হাঁ।

শশধরবাবু বললেন, দে ত বাবা একটু চর্বি এতে—বেশী নয়, একটুখানি হলেই চলবে। বাস্-বাস্—ওতেই হবে—দেও আউর, থোড়া—

তখন পকেট থেকে দাম বার করে তার হাতে তিনি পাঁচসিকে হিসাবে সাড়ে সাত আনা পয়সা গুনে দিলেন। মাংসওলাটা হাত জোড় করে মিনতি করতে লাগল, সকলকেই সে দেড় টাকা সের বেচেছে। অবশেষে অনেক অনুনয়-বিনয়ের পর শশধরবাবু আট আনায় রফা করলেন, তবে এই সর্তে যে, টেংরী চারটেও তাঁকে ওই দামের মধ্যে দিতে হবে।

পয়সা দিয়ে যখন চলে আসছেন, তখন একজন বললে, আপনি ত বেশ 'বারগেন্' করলেন মশাই, আপনার বোধ হয় সের এক টাকা গিয়েই পড়লো। শশধরবাবুর ঠোঁটের কোণে একটু বাঁকা হাসি দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল। তিনি বললেন, পাগল হয়েছেন, এ বেটাদের ওজনে বিশ্বাস করতে আছে? হয়ত এর মধ্যে থেকে আধপোয়া মেরে দিয়েছে—

—এ্যাঁ, বলেন কি? এদের পেটে এত বুদ্ধি? দেখলে ত খুব সরল বলে মনে হয়!

শশধরবাবু চোখ দু'টো বড় করে বললেন, ডাকাত—ডাকাত—এদের একেবারে বিশ্বাস করবেন না। সারা বছর এরা আমাদের পথ চেয়ে বসে থাকে ছুরি শানিয়ে।

কিছুদূর এগিয়ে যেতেই একজন খাবারওলার সঙ্গে পথে দেখা হলো। সে ভারে ক'রে খাবার নিয়ে বিক্রী করতে যাচ্ছিল। শশধরবাবুকে দেখে বললে, বাবু, খাবার নেবেন?

শশধরবাবু প্রথমটা মুখ বিকৃত ক'রে বললেন, না না, যাও।

খাবারওলাটা দু'পা এগিয়ে গিয়ে তারপর থেমে বললে, খুব ভাল খাবার ছিল বাবু, অর্ডারী মাল।

অর্ডারী মাল! ভারি ত এখানের খাবার তার আবার অর্ডারী মাল! বলে একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন, দেখি, কি খাবার নামাও দেখি!

খাবারওলা ভারটা নামিয়ে তাঁর সামনে খুলে ধরলে। শশধরবাবু তখন একটা খাবারের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বললেন, ওটা কি হে?

উয়ো পেঁড়া হায় বাবুজী।

ভাল জিনিস? দেখি, কি রকম একটু খেয়ে?

একটা পেঁড়া থেকে আধখানা ভেঙে সে শশধরবাবুর হাতে দিতেই তিনি টপ

করে গালে ফেলে দিলেন। তারপর খাবারটা ভাল ক'রে গিলে ফেলবার আগেই বললেন, না, অতি বাজে জিনিস! ওটা কি হে! বলে আর একটা খাবারের দিকে আঙুল দেখালেন।

খাবারওলা বললে, ও ছানার মুড়কি!

—তাই এত চিনি দিয়েছিস্! ছানার মুড়কি না চিনির মুড়কি? ওতে কি ছানা আছে?

দেখুন না বাবু খেয়ে। বলে গোটা চারেক ছানার মুড়কি তাঁর হাতে দিল।

এইভাবে শশধরবাবু তার কাছে যত রকমের খাবার ছিল, আগে একটু একটু করে খেয়ে দেখলেন এবং সব চেয়ে বড় কথা, সবগুলো খাবারই যে তার খারাপ একথা জানিয়ে দিয়ে শেষে এক ছটাক সন্দেশ কিনে নিয়ে বাসায় ফিরলেন।

মনোরমা রান্নাঘরে রাঁধছিলেন। তাঁর কাছে গিয়ে তিনি খাবারটা দিয়ে বললেন, এটা কেবল তোমার জন্যে এনেছি। এত উৎকৃষ্ট সন্দেশ কলকাতায় দশগুণ দাম দিলেও কেউ দেবে না।

মনোরমা বললেন, সে কি, ছেলেদের না দিয়ে আমি খাব কিগো?

শশধরবাবু বললেন, ছেলেরা ত সব জিনিস খাচ্ছে—তোমার শরীরটা সারাতেই ত এখানে আসা—কাজেই ভাল খাবার একটু আধটু আলাদা না খেলে শরীর ভাল হবে কি করে? হ্যাঁ, আর একটা কথা—এই মাংসের মধ্যে যেটুকু মেটে আছে, আলাদা রেঁধো তোমার জন্যে। বড্ড উপকারী অথচ সহজেই হজম হয়। লিভার এক্সট্র্যাক্ট খাওয়ার চেয়ে এ অনেক ভালো।

শশধরবাবু এমনি ক'রে একটু-আধটু ভাল জিনিস রোজই সংগ্রহ করে আনেন স্ত্রীর জন্যে। একটি পাকা পেঁপে, একটু ঘরে-তোলা মাখন, দুটো পাকা আতা প্রভৃতি কোথা থেকে খুঁজে খুঁজে যে সংগ্রহ করেন তা অন্য চেঞ্জাররা ভেবেই পায় না। শশধরবাবু বলেন, মশায় এর জন্যে পরিশ্রম করতে হয়—শুধু ঘরে শুয়ে খবরের কাগজ পড়লে কে আপনার মুখে ওসব তুলে দেবে?

সত্যি, মনোরমার জন্যে ভাল ঘি খুঁজে খুঁজে তিনি হয়রান হয়ে যান। দূরে দূরে যে দু'একটা দোকান আছে সেখানে গিয়ে হাতে ঘষে ঘষে পরীক্ষা করেন আর শুঁকতে শুঁকতে বলেন, এর চেয়ে আরো ভাল ঘি নেই শেঠজী?

শেঠজী বলে, আছে একটু দেহাতি ঘি কিন্তু তার দাম পড়বে সাড়ে ছ'টাকা।

দেখি কি ঘি—দামের জন্যে এসে যাবে না—মোট কথা আমি খাঁটি জিনিস চাই।

শেঠজী একটা কালো রংয়ের ভাঁড় বার করে তার থেকে একটু ঘি আঙুলে করে নিয়ে এসে শশধরবাবুর হাতের ওপর লাগিয়ে দিলে। বার কতক শুঁকে মুখ বিকৃত করে তিনি বললেন, এ সব ঘি আমাদের চলে না। মহুয়ার তেল খাবার জন্যে কি পয়সা খরচ করে এখানে এসেছি? আমরা কলকাতার লোক, আমাদের চোখে ধুলো দেবে তোমরা? ভাল জিনিস আমরা চোখে দেখলেই চিনতে পারি। বলতে বলতে তিনি পল্লীর দিকে হাঁটতে শুরু করলেন। মাঠের মধ্যে নেমে, আলের ওপর দিয়ে চলতে চলতে তিনি কিছুক্ষণ পরেই একটা বড় পল্লীর নিকটে গিয়ে হাজির হলেন।

এক জায়গায় অনেকগুলো মেটেবাড়ী জড়াজড়ি করে আছে, তিনি দূর থেকেই তা দেখতে পেয়েছিলেন। একটা দুটো বাড়ী ছেড়ে এগিয়ে যেতেই সামনে একটি বধূকে দেখে তিনি থমকে দাঁড়ালেন! সে পাঁচ ছ'টি গরুকে একটি উঠানে বেঁধে খাবার দিচ্ছিল! কি বলিষ্ঠ তার ভঙ্গী—দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেন ফেটে পড়ছে স্বাস্থ্যে—রূপোর মোটা মোটা অলঙ্কার দিয়েও যেন বেঁধে রাখা যায় না!

অলক্ষ্যে শশধরবাবুর নাক দিয়ে গভীর নিঃশ্বাস পড়লো! এর পাশে মনোরমার চেহারাটা সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চোখের সামনে ভেসে ওঠে। মনোরমার জীর্ণ-শীর্ণ দেহ, তাতে সোনার অলঙ্কারগুলো যেন তাকে বিদ্রূপ করে! শশধরবাবুর মনে হলো অলঙ্কার বা গাত্রবর্ণ কিছু নয়, নারীর আসল রূপ তার স্বাস্থ্যে। তাই যেমন করে হোক মনোরমার স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করবার দৃঢ় সঙ্কল্প মনে আঁটতে আঁটতে তিনি সেই বধূটির দিকে এগিয়ে গেলেন এবং বললেন, তোমাদের বাড়ীতে ঘি পাওয়া যাবে?

বধূটি কোন কথা বললে না, শুধু বাড়ীর মধ্যে গিয়ে তার শাশুড়ীকে পাঠিয়ে দিলে। সেই বৃদ্ধাটি এসে শশধরবাবুকে বললে, ঘি কোথায় পাবো বাবুজী, সামান্য যা একটু-আধটু হয়, তা ওই বউ খায়, আর তার ছেলেমেয়েরা খায়।

শশধরবাবু বললেন, আমার স্ত্রীর শরীর খুব খারাপ, ডাক্তার একটু ভাল ঘি খেতে বলেছে, তাই—দাম তুমি যা চাইবে আমি দিতে রাজী আছি।

বুড়ীটা এইবার একটু থেমে বললে, দাম নিয়ে কি করবো বাবু—বাজারে ত ভাল ঘি সাড়ে ছ' টাকা সেরের কম মেলে না।

শশধরবাবু বললেন, আমি তাই দেবো—যতটুকু তোমার ঘরে আছে যদি দাও—

বুড়ী বললে, আমি ত জানি না—দেখি বৌকে জিজ্ঞেস করে—ও-ই সব তৈরী করে হাতে ক'রে। বলতে বলতে সে বাড়ীর ভেতর চলে গেল। তারপর একটু পরে

আধ সের ঘি একটা ভাঁড়ে করে এনে শশধরবাবুকে দিয়ে পয়সা গুনে নিলে।

শশধরবাবু তখন বাড়ীর মধ্যে একটা ছোট্ট ঘানি দেখতে পেয়ে বললেন, তোমরা সরষের তেলও বিক্রী করো নাকি, ঘানি দেখছি যে?

বুড়ী বললে, না বাবুজী, কি করে বিক্রী করবো--ক্ষেতের যা সরষে হয়, তা-ই ঘরে খাবার জন্যে বউ একটু তৈরী করে। আমাদেরই খেতে কুলোয় না।

শশধরবাবু সেদিন আর কিছু বললেন না। পরের দিন একটা বোতল হাতে করে এসে বুড়ীর হাতে টাকা গুঁজে দিয়ে বললেন, একটু সরষের তেল আমায় বেচতে হবে বুড়ী—আমার স্ত্রীকে ডাক্তার খাঁটি তেল খেতে বলেছে—তোমাদের দেশে এলুম তোমরা যদি না একটু সাহায্য করো—

বুড়ী আবার আগের দিনের মত সুর টেনে বললে, আমি ত বলতে পারবো না, দেখি যদি বৌ রাজী হয়। এই বলে শিশিটা তাঁর হাত থেকে নিয়ে ভিতরে চলে গেল এবং একটু পরে এক বোতল তেল এনে দিলে।

এমনি করে আবার কয়েক দিনের মধ্যেই শশধরবাবু টাকার লোভ দেখিয়ে তাদের কাছ থেকে—ঘি, তেল, ঢেঁকিছাঁটা চাল এবং গৃহপালিত মুরগীর ডিম কিনতে শুরু করলেন। এত টাকা বুড়ী বা তার বৌ কোন দিন চোখে দেখেনি। ক্ষেতের জিনিস চাষ ক'রে, নিজেরা তৈরী ক'রে কোন রকমে সংসার চালাতো। তাই টাকা পেয়ে তাদের আর আনন্দ ধরে না। হাটে গিয়ে কত কাপড়, চাদর, কত রঙচঙে জিনিস কেনে।

এদিকে কিন্তু বজরা ও ভুট্টা সিদ্ধ করে খেয়ে তাদের দিন কাটতে থাকে।

বিশুদ্ধ খাদ্যের স্বাদই আলাদা! খেতে বসে তার সুগন্ধ নাকে এলেই যেন শরীর সুস্থ হয়ে ওঠে। ঢেঁকিছাঁটা চালের গরম ভাত, সেই গৃহজাত গব্য ঘৃত সহকারে গালে ফেলে শশধরবাবু বলেন, আঃ, কতকাল পরে এমন ঘি মুখে পড়লো, আর তেলেরই বা কি ঝাঁজ! ভাতে পোড়াতে কাঁচা তেল মেখে খেতে খেতে তিনি গৃহিণীকে বললেন, নির্ভয়ে খাও—এ তেল-ঘি খেলে কোন অসুখ হবে না—এ আমি জোর করে বলতে পারি!

বাস্তবিক শশধরবাবুর কথা হাতে হাতে ফললো। প্রতি সপ্তাহেই মনোরমার ওজন গড়ে দু' পাউণ্ড করে বেড়ে চলে। বেড়িয়ে ফেরবার পথে স্টেশনের ওজন করার যন্ত্রে শশধরবাবু তাঁর স্ত্রীকে নিয়মিত ওজন করতেন এবং পকেট থেকে ছোট্ট

একটা ডায়েরী বুক বার ক'রে তাতে নোট করতেন।

দেখতে দেখতে তিন মাস কেটে গেল। মনোরমার চেহারা যেন কে ভেঙ্গে নতুন করে তৈরী করলে। স্বাস্থ্যে, রূপে, সামর্থ্যে ঝলমল করতে থাকে তাঁর শরীর। তিন মাসেই এত পরিবর্তন! আরো এক মাসে না জানি কি হবে! স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে আনন্দে শশধরবাবুর বুক ফুলে ওঠে।

হঠাৎ একদিন ভোরে উঠে মনোরমার সদ্য ঘুমভাঙ্গা মুখের দিকে তাকিয়ে যেন শশধরবাবুর চোখের পলক আর পড়ে না। মনোরমা এবার তার প্রথম যৌবনের চেহারাকেও যেন হার মানিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে চাষীদের সেই বধূটির কথা তাঁর মনে পড়ে যায়। কিন্তু মনোরমার রং ফর্সা বলে তার চেয়েও অনেক ভাল দেখাচ্ছিল। শশধরবাবুর মনে হলো একবার চাষী বৌয়ের পাশে মনোরমাকে দাঁড় করিয়ে তুলনা করে দেখবেন—কে বেশী সুন্দরী!

অনেকদিন আর শশধরবাবু সেখান থেকে তেল-ঘি প্রভৃতি আনতে নিজে যান নি। অনেকখানি পথ বলে মনোরমা চাকরকে পাঠাতেন। বিশ্বাসী চাকর নিয়মিত খাদ্যদ্রব্যগুলি সেখান থেকে বহন করে আনতো।

তাই সেদিন যখন শশধরবাবু স্ত্রীকে বললেন, চলো আজ তোমাকে সেই চাষীদের বাড়ীটা দেখিয়ে আনি, তখন মনোরমা আপত্তি জানিয়ে বললে, বাবা সে অনেক দূর, আমি যেতে পারবো না।

শশধরবাবু একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, চেঞ্জ তোমার কেমন লেগেছে এ থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যাবে।

—আর আমার প্রমাণের দরকার নেই। যেতে ইচ্ছে হয় তুমি একলাই যাও সেখানে, আমি স্টেশন থেকে বেড়িয়ে ফিরে আসবো।

অগত্যা শশধরবাবু একলাই গেলেন। সেখানে গিয়ে তিনি যখন পৌছলেন, তখন সবে ভোর হচ্ছে—দূরে পাহাড়ের মাথাগুলোয় যেন আলোর টোপর ঝলমল করছে। সামনের ঢেউ-খেলানো মাঠ, শাল-মহুয়ার জঙ্গল, ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত চাষীদের কুটীর সব যেন তাঁর চোখে সেদিন এক নতুন রূপ নিয়ে দেখা দিল। শশধরবাবু গুন্ গুন্ করে গান ধরলেন 'আমার পরাণ যাহা চায় তুমি তাই তুমি তাই গো'। এইভাবে উৎফুল্ল মনে এগিয়ে গিয়ে তিনি সেই চাষীর বাড়ীর সামনে হাজির হলেন। কিন্তু কোথাও কাউকে দেখতে না পেয়ে বাড়ীর মধ্যে ঢুকেই তিনি একেবারে চমকে উঠলেন। একি! সেই বলিষ্ঠ স্বাস্থ্যবতী বধূটির এ কি চেহারা হয়েছে! সামনের দাওয়ায় যে ছোট ঘানিটা ছিল, প্রাণপণ শক্তিতে ঘুরে ঘুরে সেটা থেকে সে তেল বার করছে। জীর্ণ-

[illegible] কঙ্কালসার দেহ—ঠিক যেমন মনোরঞ্জনের ছিল! গরুর বদলে ঘানি টানতে টানতে হাঁ করে মধ্যে মধ্যে সে দম নিচ্ছিল।

কেমন করে বৌটার এত খারাপ চেহারা হয়ে গেল, শশধরবাবু তাই ভাবছেন, এমন সময় ভেতর থেকে বুড়ী বেরিয়ে এসে বললে, মাইজী ভাল হয়েছে ত বাবুজী?

শশধরবাবু বললেন, হ্যাঁ হয়েছে।

ভেজাল জিনিস আমার কাছে পাবেন না, দেখছেন ত আমার বৌ নিজে তৈরী করছে।

বলে বুড়ী তখন উজ্জ্বল মুখে প্রশ্ন করলে, তেল কেমন খাচ্ছেন?

একটু চুপ করে থেকে তিনি বললেন, ভাল-ই।

বুড়ী তখন বললে, একদিন মাইজীকে বেড়াতে নিয়ে আসবেন বাবু এদিকে, দেখবো—বলতে বলতে সে সহসা কণ্ঠস্বর একেবারে খাদে নামিয়ে নিয়ে এলো, আচ্ছা বাবুজী, আমার বৌটাকে একটা ওষুধ দিতে পারেন—আপনার কাছে কিছু আছে?

বিস্মিতকণ্ঠে শশধরবাবু প্রশ্ন করলেন, আমি ত ডাক্তার নই—তা ছাড়া তোমার বৌয়ের অসুখ কি হয়েছে তা আমি কি ক'রে জানবো?

বুড়ী সুর টেনে টেনে বললে, কি জানি বাবু কি হয়েছে! রোজই তার 'বুখার' হয়—সামান্য জ্বর আর গা থেকে যায় না। তার উপর কাশি আছে এবং আজ কদিন হলো একটু একটু রক্তও কাশির সঙ্গে উঠছে। কিছু খেতে চায় না—আর খেলে হজমও হয় না।

শশধরবাবু চুপ করে থেকে বললেন, ডাক্তার কি বললে?

বুড়ী কপালে একটা ঘা মেরে বললে, ডাক্তার! ডাক্তার কোথায় আমাদের দেশে বাবুজী! তাই ত বলছিলাম, আপনি মাইজীকে যে ওষুধ খাইয়ে ভাল করলেন তাই যদি একটু দেন—

শশধরবাবু সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে বললেন, এখানে কি ডাক্তার একেবারেই নেই?

বুড়ী বললে, দশ ক্রোশ দূরে একটা শহরে আছে।

শশধরবাবু বললেন, কোনরকমে একবার তাকে দেখাও। বলতে বলতে তিনি তৎক্ষণাৎ বাইরে বেরিয়ে এলেন।

বাসায় ফিরে অনেকক্ষণ পর্যন্ত শশধরবাবু কারো সঙ্গে কথা কইলেন না। চুপচাপ বাগানে বসে রইলেন। তারপর চাকরকে ডেকে বললেন, দেখ, ও-বাড়ী থেকে আর কোনদিন তেল-ঘি কিংবা চাল কিনে আনবি না।

চাকর প্রশ্ন করলে, কোথা থেকে তাহ'লে আনবো ?

সে আমি কাল সকালে ঠিক করবো 'খন। বলে তিনি আবার কি যেন চিন্তা করতে থাকেন।

এদিকে শশধরবাবুর চাকরের জন্যে অপেক্ষা করে করে শেষে একদিন হঠাৎ তেল-ঘি নিয়ে বুড়ী নিজেই বাড়ী খুঁজে খুঁজে এসে উপস্থিত হলো।

শশধরবাবু তাকে দেখে বিরক্ত হলেন। বললেন, কে তোমায় এ সব আনতে বলেছিল ?

বুড়ী বললে, কেউ বলেনি বাবুজী, তবে তোমার চাকর গেল না দেখে আমি নিজেই নিয়ে এলুম, ভাবলুম, হয়ত চাকরের অসুখ করে থাকতে পারে। ওঃ কত লোককে জিজ্ঞেস করেছি, কেউ বলতে পারে না আপনার বাড়ী—শেষে আপনার বাগানের মালীর নাম বলতে একজন বাড়ী দেখিয়ে দিলে।

শশধরবাবু একটু থেমে শেষে দৃঢ়স্বরে বললেন, না, তোমার তেল-ঘি আর আমাদের দরকার নেই। তুমি ফিরিয়ে নিয়ে যাও।

বুড়ী যেন এবার ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। বললে, এর চেয়ে খাঁটি জিনিস কে দেবে এখানে বাবুজী যে আমায় ফিরিয়ে দিচ্ছ ?

শশধরবাবু একটুখানি কি যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, সে জন্যে নয়—আমি আর তোমার কাছ থেকে নেবো না।

বুড়ী তখন নরম সুরে বললে, আচ্ছা, আজ যেটা এনেছি এটা নাও ত—আর না হয় না নিয়ো! কাল বৌয়ের জন্যে একটা পূজো মানত করেছি তাই পয়সার বড় দরকার, আমি নিজেই ছুটে এসেছি।

শশধরবাবু কঠিনভাবে উত্তর দিলেন, একবার বলে দিয়েছি, তোমার জিনিস নেবো না, আবার বারে বারে বকাচ্ছো কেন—যাও! বলে তিনি বাড়ীর ভেতরে ঢুকে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

অগত্যা বুড়ী সেই তেল ও ঘিয়ের ভাঁড় হাতে ক'রে অপর লোকের বাড়ী বেচতে গেল।

কিছুক্ষণ পরে একটি ছোট্ট মেয়ে ছুটতে ছুটতে এসে শশধরবাবুকে বললে, কাকাবাবু একটা বুড়ী তেল ও ঘি বিক্রী করতে এসেছে—সে আপনার নাম করছে, আপনি নাকি তার কাছ থেকে কেনেন, তাই বাবা জিজ্ঞেস করতে পাঠালেন বুড়ির জিনিস কি খাঁটি—আমরা নিতে পারি ?

শশধরবাবু কি বলবেন তাই ভাবতে লাগলেন।

তাঁকে অনেকক্ষণ মৌন থাকতে দেখে মেয়েটি ব্যস্তস্বরে বললে, বলুন না শিগ্‌গির, বাবা যে দেরি হ'লে আমায় বকবে!

না, ওর জিনিস খাঁটি নয়—তোর বাবাকে নিতে বারণ করিস্। বলে শশধরবাবু নীরবে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস যেন তাঁর বুকের মধ্যে গোপন করে নিলেন।

মেয়েটি যেমন ছুটে এসেছিল তেমনি ছুটে চলে গেল।

শশধরবাবু তখনো কিন্তু সেখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

বৃষ্টি এলো

আকাশের দিকে চেয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলা ও হা-হুতাশ করা শেষ হয়ে গিয়েছে। নির্দয়, নিষ্ঠুর প্রকৃতিকে দু'বেলা অভিসম্পাত দিয়ে দিয়েও শহরের লোক ক্লান্ত! চৈত্র গিয়েছে, বৈশাখ গিয়েছে, জ্যৈষ্ঠেরও মাঝামাঝি হতে চললো তবু একফোঁটা জল নেই আকাশে। তাপের মাত্রা বেড়েই চলে দিন দিন! একশো ছয়-সাত-আট-দশ! শহরের রাস্তাগুলোতে দুপুরের দিকে যেন পিচ ফোটে টগবগ করে! কংক্রিটের বড় বড় ইমারতগুলোর দেওয়াল থেকে একটা আগুনের ঝাঁজ বেরোয়! সকলের মুখে শুধু এক কথা, 'বাপ্ কি গরম! আর পারি না!'

এমন সময় হঠাৎ একদিন বিকেলে আকাশখানা কালো ক'রে বৃষ্টি নামলো! রিমঝিম্···রিমঝিম্···ঝমাঝম্···ঝমাঝম্···ঝমাঝম্···

সঙ্গে সঙ্গে ফট্‌ফট্ ফটাফট্ শব্দে গৃহস্থদের বাড়ীর জানলা দরজা সব একসঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল। ছোট বড় অট্টালিকা—একতলা, দোতলা থেকে চারতলা, পাঁচতলা, ছ'তলা···কেউ বাদ গেল না। যে বৃষ্টির জন্যে এতদিন লোকের সাধ্য-সাধনার অন্ত ছিল না, তাকে পেয়ে কিন্তু লোক ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকলো। ঘরে ঘরে জলে উঠলো আলো।

বাইরে কিন্তু বৃষ্টির ধারা সমানে বর্ষণ করে চলে।

পদাতিকরা যে যেদিকে পারল ছুটে পালাল। রাস্তার ধারের দোকানগুলো পর্যন্ত ঝাঁপ বন্ধ করে দিলে। রিক্সাগুলো পর্দা মুড়ি দিয়ে ছুটলো, ট্রাম-বাস সব শার্সি খড়খড়ি বন্ধ অবস্থায় দৌড়োতে লাগল।

ঝমাঝম্···ঝমাঝম্ করতে করতে বাদলের ধারা যেন নৃত্যে উন্মত্ত হয়ে ওঠে! ভেসে যায় রাস্তা, ভেসে যায় ফুটপাত। অট্টালিকার দেওয়াল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে প্রবলবেগে জল।

আমি মেসের তিনতলার ঘরের জানলায় দাঁড়িয়ে চেয়েছিলুম বড় রাস্তার দিকে। কতদিন পরে বর্ষা এসেছে, দু'চোখ ভরে দেখছিলুম তার রূপ। চিত্তরঞ্জন এভিন্যুর চওড়া রাস্তাটার অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায় সেখান থেকে। বৃষ্টির ধারা নয়, যেন মুক্তার বর্ষণ! সেই কঠিন সিমেণ্টের পথের ওপর আছড়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা যেন শত-খণ্ডে টুকরো টুকরো হয়ে রেণুগুলোকে ছড়িয়ে দেয় চারিদিকে। অদ্ভুতরঙের ঘোলাটে বৃষ্টি! কখনো বা ধূমেল অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না—কখনো বা তার

কলকাতার বাড়ী-ঘর পথঘাট সব অবলুপ্ত হয়ে যায়। তারই মধ্যে কখনো হঠাৎ ছুটে আসে একটা বড় মোটর গাড়ি হেড লাইট জালিয়ে, তারই আলোতে ঝকমকিয়ে ওঠে চারিদিক জরির পর্দার মত। সঙ্গে সঙ্গে চলন্ত গাড়ির জলকাটার সেই বিচিত্র শব্দ মনের মধ্যে একটা অদ্ভুত রাগিণীর সৃষ্টি ক'রে, আবার তখনই কোথায় যেন মিলিয়ে যায়।

হঠাৎ পাশের বাড়ির দোতলা থেকে ক্ষান্ত পিসীর কণ্ঠস্বর তীব্র হয়ে ওঠে—ওরে ও পটুলি পোড়ারমুখি ছাদ থেকে গুলগুলো তুলে এনেছিস্ ত, না এখনো বসে বসে ঘুঁটি খেলছিস্—যেটি না বলবো সে আর এ বাড়ীর কারো মনে পড়বে না। ধিংগী মেয়ে, দিনরাত কেবল খেলা আর খেলা! আজ আসুক তোর বাপ আপিস থেকে! এদিকে কয়লা ফুরিয়েছে বলবার উপায় নেই। তাহ'লেই সে মুখ ঝামটা দেবে আমায়। বলবে, গুল দিয়ে চালাতে পারো না। এই গুলের অভাবে কত লোকের উনুনে আগুন পর্যন্ত পড়ে না, রান্না বন্ধ, আর তোমরা সব নবাব হয়েছো! বলে গজ গজ করতে করতে বুড়ী যেন তার মনের সকল ঝাল ঝাড়তে থাকে সেই বারো বছরের খেলুন্তী মেয়েটার ওপর!

ক্ষান্তপিসীর কথা কানে আসতেই আমি তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে সেদিকের জানালাটা বন্ধ করে দিলুম। আঃ, জ্বালালে দেখছি—নিশ্চিন্ত হয়ে যদি একটু বর্ষাটা উপভোগ করবার উপায় আছে!

বলতে বলতে যেমন বিছানায় এসে বসেছি, অমনি অমল এসে ঘরে ঢুকলো। মেয়েদের মত তার মাথায় বড় বড় চুল, তাতে তেল মাখে না বলে একেই রুক্ষ—তায় কবিতার মিল খুঁজে না পেয়ে অনবরত বাঁ হাতটা চুলের মধ্যে গুঁজে গুঁজে তাকে যেন বিপর্যস্ত করে তুলেছে। একটা রঙিন প্যাড ও সোনার কলম হাতে করে এসে ঘরে ঢুকেই সে বললে, ঘোষদা, তোমার ঘরটা মাইরি বেশ নির্জন, এইখানে বসে একটু লিখবো?

বললুম, কেন তোমার ঘরে কি হলো? সে থাকে দোতলায়।

কি আর হবে! আমার ঘরে হরিশদা গান ধরেছেন হারমোনিয়ম-এ—'নাচো নাচো পিয়ারে মন্‌কি মোর্'। ওর মধ্যে বসে তুমি কবিতা লেখার কথা ভাবতে পারো!

বললুম, না, অসম্ভব! তবে এখন লেখবার কি দরকার—পরে লিখলেই ত হয়?

এবার অমল যেন আমায় মারতে উঠলো। বারে—এখন লিখবো না কবিতা! কতদিন পরে মেঘদূত এলো প্রিয়ার বার্তা নিয়ে—এখন তুমি আমায় চুপ করে

থাকতে বলছো, নেহাত বেরসিক দেখছি তুমি। বলেই সে [illegible] দিলে, শোনো, দেখি কেমন আরম্ভটা করেছি। আবেগে তার গলা থর থর করে কাঁপতে থাকে—

আমার আকাশে বৃষ্টি নেমেছে আজ

তোমার চোখের কাজল-অশ্রু সম—

বাঃ বেশ হয়েছে। ভারি সুন্দর 'আইডিয়া'। বলে আরো খানিকটা শুনে অমলের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম। মনে করেছিলুম, চুপি চুপি চিলে কোঠায় উঠে বর্ষার রূপ দেখবো। কিন্তু তা আর হলো না। যেমন সিঁড়ির কাছে গিয়েছি, অমনি পাশের ঘর থেকে একসঙ্গে দু'তিনজন চেঁচিয়ে উঠলো, এই যে, ঘোষদা এসে গেছে—আমরা তোমার ঘরে এখনি যাবো ভাবছিলুম।

বললুম, কেন, কি সংবাদ ?

ঝমাঝম্—ঝমাঝম্ শব্দে বৃষ্টির ধারা যেন তখন আছড়ে পড়ছিল বন্ধ জানালার কবাটগুলোর ওপর !

সেই ঘরটা ছিল সবচেয়ে বড়, তাতে ছ'টা সিট্। বিজনের তক্তাপোশের ওপর সবসময় একটা সতরঞ্চি বিছানো থাকতো, সেখানে গিয়ে বসতেই কোণের সিট্ থেকে অখিলেশ বলে উঠলো, কেন আবার জিজ্ঞেস করছেন ?

রমানাথ তার পাশের সিটে চিৎ হয়ে শুয়ে মাথার কাছে রঙিন টেবিল-লাইটটা জ্বালিয়ে 'সঞ্চয়িতা' পড়ছিল চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে। 'এমন দিনে তারে বলা যায়, এমন ঘন ঘোর বরিষায়'—

এইবার পরমানন্দবাবু এক চিল্‌তে কাগজ আমার সামনে ধরে বললেন, আজ ফীস্ট্ হবে মেসে—খিচুড়ি আর চপ্—সকলকে সেইজন্যে আট আনা করে চাঁদা দিতে হবে।

মেসের সবচেয়ে পেটরোগা লোক হলেন পুলিনবাবু। মাসের মধ্যে অর্ধেক দিন চিঁড়ে ভিজিয়ে লেবু ও দই দিয়ে খেয়ে তবে অফিসে যান। যেমন রোগা একহারা কঞ্চির মত চেহারা, তেমনি খিট্‌খিটে মেজাজ। তিনি সুটকেশ খুলে একটা গরম গায়ের কাপড় বার ক'রে গায়ে ও গলায় বেশ ক'রে জড়াতে জড়াতে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। তারপর একগাল হেসে বললেন, এমন বর্ষাটা পুরো 'এনজয়' করতে হলে কেবল চপ্ হলে চলবে না—তার সঙ্গে ইলিশ মাছ চাই। অন্তত দু'খানা ক'রে ভাজা—বেশী নয়, কি বলো হে ! বলেই তিনি সর্বাগ্রে পরমানন্দবাবুর মুখের দিকে তাকালেন।

বলা বাহুল্য মেসের খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে এই পরমানন্দবাবুর উৎসাহ-ই

দেখা যায় বরাবর সবচেয়ে বেশী। সূক্ষ্ম ভোজনরসিক বা ভোজনবিলাসী বলে নয়, বরং ঠিক তার বিপরীত, অর্থাৎ ঔদরিকই বলা যেতে পারে। ভাল-মন্দ খাওয়ার সুযোগ তিনি সর্বদাই খুঁজে বেড়ান। কাজেই সঙ্গে সঙ্গে তিনি পুলিনবাবুর সেই প্রস্তাবটা সমর্থন করলেন পুরোপুরি! তবে তার জন্যে যখন আবার এক্সট্রা কিছু দেওয়ার কথা উঠলো, তখন রমানাথ বলে ফেললে, তার চেয়ে চপটা ড্রপ করুন—খিচুড়ির সঙ্গে ইলিশ মাছ ভাজা, এর চেয়ে আর্টিস্টিক আর কি হতে পারে!

দি আইডিয়া! তখনই ডাক পড়ল রাঁধুনীর। একসঙ্গে দু'তিনজন চেঁচিয়ে উঠলো, ঠাকুর ঠাকুর বলে।

কিন্তু ঠাকুরের সাড়া-শব্দ নেই। শুধু বৃষ্টির শব্দ ঝম্‌ঝম্—ঝম্‌ঝম্! মেসের ওপর নীচ সব ঘরে তারই সংগীত ভরা।

লুঙ্গির ওপর স্যাণ্ডো গেঞ্জি চড়িয়ে সুরেশ ভিজতে গিয়েছিল নীচের তলায়। হ্যাঁচ্-চো হ্যাঁচ্-চো করে হাঁচতে হাঁচতে সে ওপরে উঠে এসে বললে, এমন বর্ষায় কি ঠাকুরকে ডাকলেই দর্শন পাওয়া যায়? অনেক তপস্যা করতে হয়। দেখো গে, সে এখন অন্নপূর্ণার মন্দিরে মাথা খুঁড়ছে।

অন্নপূর্ণা মেসের ঝি। সত্যি সেই উৎকলবাসী পাচকটি তখন তার সিঁড়ির তলার ঘরে বসে বসে অন্নপূর্ণার হাতে সাজা পান 'গুণ্ডি' সহযোগে চিবুচ্ছিল আর কি যেন তন্ময় হয়ে বলছিল। বাবুদের ডাক তার কানে এসে পৌছয়নি তখনো। শেষে বার-বেল-ভাঁজা মোটা গলায় সুরেশ হাঁক পাড়তে, ঠাকুরের টনক নড়ল।

ঠাকুর ছুটতে ছুটতে ওপরে আসতেই সুরেশ একটা 'ফ্লাস্ক' ও চার আনা পয়সা তার হাতে দিয়ে বললে, বাজার থেকে আসবার সময় আমার জন্য এক কাপ কফি এনো। বৃষ্টিতে ভিজে সর্দি লেগে গিয়েছে।

সুরেশের ঘরের অপর সিটে আগাগোড়া চাদর মুড়ি দিয়ে থার্ড ইয়ারের ছাত্র কমলাক্ষ এতক্ষণ ঘুমুচ্ছিল। কফির নাম কানে যেতেই যেন তার ঘুম ছুটে গেল। তাড়াতাড়ি চাদরটা মুখ থেকে সরিয়ে নিয়ে সে বলে উঠলো, সুরেশদা, মাইরি আমার জন্যেও একটু কফি আনতে দিয়ো—আর এক প্যাকেট সিগারেট—উড্‌বাইন। ওই বাঁ দিকের পকেটে মানিব্যাগ আছে। তা থেকে একটা টাকা নিয়ে ঠাকুরকে দাও না ভাই।

বর্ষার ছোঁয়াচ কার মনে কিভাবে লাগে তা কে জানে!

সামনের বাড়ীর স্কুলেপড়া মেয়েটা জানলার পাশে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে হাঁ করে চেয়েছিল সুরেশের বারবেলভাঁজা জলসিক্ত দেহটার দিকে। হঠাৎ তার মা ঘরে ঢুকে

বলে উঠলেন, ওমা বিমলি তুই এখানে! আমি যে ওপর-নীচ তোকে খুঁজে খুঁজে মরছি। তা এখানে অমন করে দাঁড়িয়ে কি করছিস লা?

খপ্ করে মায়ের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বিমলা বললে, দেখো না, জানালাটা দিয়ে কি রকম জলের ছাট আসছে, তাই বন্ধ করে দেবো মনে করছি!

বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে মা বলে উঠলেন, মনে করছি! এতে আবার মনে করবার আছে কি? অতবড় মেয়ের যদি এতটুকু কাণ্ডজ্ঞান থাকে! বলতে বলতে তিনি নিজেই ছুটে গিয়ে জানালাটা বন্ধ করে দিলেন। আর সেই অবসরে বিমলা দ্রুত ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেল।

বর্ষার সেই সুরেলা আব্‌হাওয়ায় বে-সুরো আওয়াজ মারছিল কেবল অন্নপূর্ণা। জলে ভিজতে ভিজতে যত সে কাজ করে, তত যেন তার মুখের ঝাঁজও বেড়ে চলে—ভিজে কাপড় পরে মানুষ কতক্ষণ কাজ করতে পারে—বাবুদের কাছে কাপড় চেয়ে চেয়ে আমার মুখ ব্যথা হয়ে গেছে—আমিও ত মানুষ! এভাবে আর আমি কাজ করতে পারবো না! এই ত সবে বর্ষার শুরু—মুখপোড়া বৃষ্টি এখন তিন মাস জ্বালাবে। বাবুদের আর কি—ঘরে বসে বসে ফরমাজ করবে আর ভালমন্দ খাবে।—ওদিকে যোগাড় দিয়ে মরবে যত ঝি-চাকর বর্ষায়।

এইভাবে যখন ঝি গজগজ করছে তখন গাড়ু হাতে করে শ্যামবাবু সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামছিলেন, এক কলি গান ভাঁজতে ভাঁজতে—'বঁধুয়া নিদ নাহি আঁখিপাতে, তুমিও একাকী, আমিও একাকী আজি এ বাদল রাতে।'

তাঁর গলা পেয়ে অন্নপূর্ণা একেবারে চুপ করে গেল, কেন তা কে জানে!

আমি আবার নিজের ঘরে গিয়ে দাঁড়ালাম সেই জানালাটার ধারে। শূন্য ঘর! কবি তার কবিতা শেষ করে চলে গিয়েছে। নিজের ঘরে গিয়ে হয়ত সে এতক্ষণে সকলকে তা আবৃত্তি ক'রে শোনাচ্ছে।

আমার চোখের সামনে তেমনি দেখা যাচ্ছে চিত্তরঞ্জন এভিন্যুর সেই প্রশস্ত সড়কটা। রিমঝিম…ঝমাঝম্…ঝমঝম্ শব্দে তখনো বৃষ্টি পড়েই চলেছে সমান বেগে। রাস্তায় লোকজন নেই। দু'পাশের দোকানগুলোর সামনে ঝাঁপ ফেলা। বড় বড় অট্টালিকার ওপর-নীচের ঘরগুলোও তেমনি কপাট বন্ধ। বৃষ্টির হাত থেকে সবাই যেন নিজেকে প্রাণপণে বাঁচাতে ব্যস্ত। বোরখা-মুড়ি দিয়ে হয়ত কদাচিৎ একটা রিক্সা বা হুস করে কোন মোটরগাড়ী ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে।

আমার কিন্তু চোখের পলক পড়ে না। চেয়ে থাকি সেইদিকে তেমনিভাবে এক দৃষ্টে—নববর্ষার সুরের ছোঁয়াচ বুঝি লেগেছে তখন আমার মনে। ভাবছি মহাকবি

কালিদাসের মেঘদূতের শ্লোক। এমন সময় হঠাৎ দেখি একটা ঠেলাগাড়ি—তাতে বোঝাই লোহার সিক। একটা হিন্দুস্থানী যুবক সেটা ঠেলতে ঠেলতে চলেছে, জলে তার সর্বাঙ্গ ভিজে। শুধু তার পরনে ছোট একটা কাপড়, তার দেহের কোথাও আর কোন আবরণ নেই। তার পেশীবহুল দেহটা যেন বৃষ্টির জলে ধুয়ে আরো সতেজ ও সবল বলে মনে হচ্ছে। বর্ষার ছোঁয়াচ বুঝি সত্যি লেগেছে তারই মনে। তাই হাতে যেমন গাড়ি ঠেলছে, মুখে তেমনি গান ধরেছে দুর্বোধ্য সুরে। তার গানের ভাষা কিছু বুঝি না। তবে এইটুকু মাত্র আমার কানে আসছিল—'আরে শ্যামসখি চলে যমুনায়'—অন্তরের সমস্ত আবেগ সমস্ত সুর যেন নিঃশেষে সে ঢেলে দিয়েছিল গানের সেই বাণীতে। বৃষ্টির জল তার মাথা দিয়ে, মুখ দিয়ে, গা দিয়ে, সর্বাঙ্গ দিয়ে যেন ঝরে ঝরে পড়ছিল সংগীতের ধারা হয়ে। রমঝম—রমঝম—ঝমঝম্।

বৃষ্টির সেই সুরের সঙ্গে তার কণ্ঠের সুর যেন কোথায় একটা মিল খুঁজে চলেছে।

একটু পরে দেখি একটা হিন্দুস্থানী ঘাগরাপরা যুবতীকে। সে সামনের গলিটা থেকে বেরিয়ে এলো। কিছুক্ষণ আগেই সে আমাদের গলিতে হেঁকে গিয়েছিল—'মাটি চাইগো—মাটি' বলে। মাটির ঝুড়িটা তখনো তার মাথায় রয়েছে। সে তেমনি সেটাকে মাথায় নিয়ে চলছিল তার পাশে পাশে। ঠেলাওলার গান শুনে সে হাসছিল উচ্ছ্বসিত হাসি। তার মুখে, চোখে, দেহের রেখায় রেখায় সে হাসি যেন উপচে পড়ছে বৃষ্টির জলের মত। রমঝম রমঝম ঝমঝম্ শব্দের সঙ্গে তাদের সে গান ও হাসি মিলে-মিশে গিয়ে যে ঐকতানের সৃষ্টি করছিল—তার তুলনা বুঝি মেলে না এ পৃথিবীর কোথাও।

তারা দু'জনে চলেছে—চলেছে—চলেছে। কোথায় চলেছে! কোন্ সৌন্দর্যের অমরাপুরীতে—কে জানে! শুধু তারা চলেছে—যেন অনন্তকালের দু'টি নর ও নারী!

আমার চোখের সামনে থেকে নিমেষে যেন অন্তর্হিত হলো সেই বাড়ীঘর, সেই রাস্তা, অট্টালিকা, শহর, সভ্যতা। সব যেন মিলিয়ে গেল সেই বৃষ্টিধারার শীকরকণায় আবৃত এক অদ্ভুত অস্পষ্ট সোনালী কুহেলিকায়; আর সেই গানের অনুরণন ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে তখনও বাজতে লাগল শুধু আমার কানে নয় আমার মনে—'আরে শ্যামসখি চলে যমুনায়।'

যমুনা কখনো চোখে দেখিনি, বৃন্দাবন কোথায় জানি না, কিন্তু সেই পরম ক্ষণটিতে কে যেন আমায় সব ভুলিয়ে দিলে। মনে হলো আমার চোখের সামনে ওই ত বইছে যমুনা, ওই ত তার শ্যামল বংশীবট, ওই ত তার বালুময় বেলাভূমি ধরে চলেছে, ঝড় জল বৃষ্টি সব তুচ্ছ করে অভিসারিকা শ্রীরাধা!

খাবার দিয়ে উঠতে পারে না রামশরণ! খরিদ্দারের ভিড় জমে যায় দোকানের সামনে। রাবণের চিতার মত উনুন সব সময় জ্বলে দাউ দাউ করে, তবু চার-পাঁচ জন হালোয়াই হিমসিম খেয়ে যায়।

পিছন ফিরে কচুরীর ঝুড়িটা নিয়ে সামনের বড় পেতলের পরাতটার ওপর ঢেলে দিয়েই রামশরণ বলে, আপ্‌কো কেতনা? ছে আনা? হাঁ, লিজিয়ে বাবুজী।

আপ্‌কো? আর একজনের দিকে ফিরে তেমনি ধরাগলায় প্রশ্ন করে।

এগারো আনা। তারপর কেউ বলে ওঠে, তিন আনা, কেউ পাঁচ আনা, কেউ চোদ্দ আনা, কেউ বা এক টাকা—

নিমেষে নিঃশেষ হয়ে যায় সব। শূন্য থালাটার দিকে তাকিয়ে রামশরণ তখন বলে, জেরা ঠাহ্‌রিয়ে বাবুজী, আভি দে রহা—

একজন দুজন ওরই মধ্যে থেকে রাগ করে ওঠে, আর কতক্ষণ দাঁড়াবো? বাঁ হাতে শালপাতার ঠোঙাটা ধরে ডান হাতে খাবার ভর্তি করতে করতে রামশরণ বলে, আচ্ছা চীজ মিলনেকে লিয়ে জেরা ঠহ্‌রনা চাহিয়ে বাবুজী! হামারা হিঁয়া কোই বাসি চীজ নেহি রহ্‌তি। একদম্ হাতে গরম।

এক টাকার কচুরী নিয়ে খরিদ্দার বলে, একটা 'ফাউ' দাও লালা!

খাবারের ঠোঙাটা তার হাতে দিতে দিতে রামশরণ বলে, হামারা হিঁয়া খাঁটি চীজ, খাঁটি দাম—কাঁহাসে বেশী দেগা বাবুজী—যো চোরী করতা ওহি দেগা……

চেঙারি হাতে নিয়ে মুখ চুন করে চলে যায় খরিদ্দারটি।

সত্যি এ অঞ্চলে এত ভালো খাবার আর কেউ করে না। তাছাড়া অন্য দোকানের তুলনায় খাবারের সাইজও আবার নাকি বড়। তাই অনেক দোকান ফেলে, অনেক গলি ছেড়ে, ছুটে আসে লোক রামশরণের কাছে।

রামশরণের দোকানটা এ অঞ্চলে ঘণ্টাওলা দোকান নামে বিখ্যাত। কর্তারা আপিসে বেরিয়ে গেলে মেয়েরা চাকরকে ফরমাস করে, দেখ্, সেই ঘণ্টাওলা দোকান থেকে হিঙের কচুরী আর আলুর দম আনবি।

রামশরণের দোকানের সামনে ঝোলানো আছে একটা বড় সাইজের পেতলের ঘণ্টা। কেন, তা কে জানে। কেউ কোনদিন সেই ঘণ্টাটা যেমন বাজতে দেখেনি,

তেমনি শোনেওনি। তবু শুধু দিনের পর দিন ওটা ঝোলে ওইভাবে। এক-একদিন তার ছোট ছেলেটা যদি বাজাতে যেতো ত সে তাকে ধমক দিয়ে উঠতো, কেয়া, উয়ো খেল্‌নেকা চীজ হ্যায়?—

ছেলেটা ভয়ে সরে যেতো। সে বুঝতেই পারতো না যদি বাজাবে না কখনো তবে তার বাবা ওটা কেন ঝুলিয়ে রেখেছে ওইভাবে।

সামনের চৌকিটার ওপর বিরাট ভুঁড়ির মেদভার নিয়ে রামশরণ খাবার বিক্রী করতে করতে এক-একবার হুঙ্কার দিয়ে উঠতো, আরে-এ-লছমনওয়া?

মোটা গাঁট্টা-গোঁট্টা ছেলটা বাইরে থেকে ছুটে এসে বাপের সামনে দাঁড়াতো নিঃশব্দে। কেন না, সর্বদাই তার মুখ চলতো, পাছে বাপ জানতে পারলে প্রহার করে তাই সাড়া না দিয়ে সশরীরে এসে হাজির হতো। বাসি খাবার ভাঙা-চোরা যা থাকতো, বিশেষ ক'রে নরম নরম রসে-ভরা বাসি জিলিপী খেতে লছমন বড্ড ভালবাসে। কর্মচারীদের কাছ থেকে যখন-তখন সে একমুঠো চেয়ে নিয়ে আড়ালে গিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে খেতো।

লছমন বাপের সামনে এসে দাঁড়াতে খিঁচিয়ে উঠে রামশরণ। বলিষ্ঠ হিন্দী ভাষায় সে বলে, দেখতে পাচ্ছিস না শালপাতার দোনা ফুরিয়ে গেছে?

লছমন তাড়াতাড়ি এক আঁচলা শালপাতার তৈরী ঠোঙা ভেতর থেকে এনে বাপের হাতের পাশে ঝপ্‌ করে ফেলে দেয়।

দোকানে বসে খাবার জায়গা নেই, তবু খাবার খেয়ে কেউ জল চাইলে রামশরণ চেঁচিয়ে ওঠে, আরে লছমনওয়া, বাবুকো পানি পিলা দেও।

ছুটে এসে, ঘটি করে লছমন খরিদ্দারের হাতে জল ঢেলে দেয়।

এ ছাড়া ভিড় কমলে, বার কোমর ছাড়াবার দরকার হলে, তেমনিভাবে লছমনকে আবার সে হাঁক পাড়ে। ছেলেকে দোকানে বসিয়ে খালি গায়ে বিরাট ভুঁড়ি নিয়ে তখন রামশরণ ধীরে ধীরে নেমে আসে চৌকির ওপর থেকে। তারপর আশেপাশে পায়চারি করতে করতে ন' বছরের ছেলের নির্ভুল বেচা কেনা দেখে নিজেই মনে মনে বেশ একটু যেন আত্মপ্রসাদ লাভ করে।

পয়সাকড়ির ব্যাপারে রামশরণ নিজের ছেলেকে ছাড়া আর কোন কোন কর্মচারীকে বিশ্বাস করে না। তাই যতক্ষণ পারে নিজে চালায়, তারপর লছমনের ওপর ছেড়ে দেয়। বিশেষ ক'রে দুপুরের দিকে ঘণ্টা দুই লছমন একাই বেচাকেনা করে। রামশরণ এই সময়টা বাসায় গিয়ে খেয়েদেয়ে একটু গড়িয়ে নেয়।

ছোট হ'লে কি হবে বাপের শিক্ষার গুণে লছমন হিসাবনিকাশে ইতিমধ্যেই বেশ

ওস্তাদ হয়ে উঠেছে, তাকে ফাঁকি দেওয়া কঠিন।

দুপুরের দিকে খরিদ্দার আসে খুবই কম।

তবু একদিন এক বুড়ো এসে বললে, দেখি বারো আনার জিলিপী।

লছমন শালপাতার ঠোঙায় গুনে গুনে তুললে—রাম, দো, তিন…চৌব্বিশ।

বৃদ্ধটি বললে, দে বাবা একটা বেশি 'ফাউ'।

লছমন ঠোঙার মুখটা কাঠি দিয়ে আটকাতে আটকাতে বললে, হামরা হিঁয়া খাঁটি চীজ, খাঁটি দাম, বেশী কাঁহাসে মিলি বাবু? যো চোরী করেগা ওহি দে সক্‌তা—

এইভাবে বাপের মুখের বুলি সেও রূপ্‌চায়, হুবহু।

বাপ্‌রে, বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়, বলতে বলতে খাবারের ঠোঙা নিয়ে বুড়োটা অগত্যা চলে যায়।

এবার আসে একজন বিধবা ঝি, তিন বছরের একটা ছেলে কোলে নিয়ে। বলে, এ লালা, হামকো ছ'পয়সার আলুর দম দাওতো।

এক, দো, তিন…করতে করতে বারো পর্যন্ত গুনে সে ঠোঙাটা তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললে, লেও।

আর একটা বেশি দাও, ছ' পয়সার একসঙ্গে নিলুম। ব'লে ঝিটা অনুরোধ করে লছমনকে।

বেশী কাঁহাসে দেগা? হামরা হিঁয়া খাঁটি চীজ, খাঁটি দাম। ব'লে সে সঙ্গে সঙ্গে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলে।

দে বাবা, একটা ছোট দেখে আলু, আমার এই ছেলেটার হাতে।

গম্ভীরস্বরে লছমন বললে, নেহি হোগা—চৌদ্দ আনা আলুকা ভাও—ফিন্ ফাউ কাঁহাসে দেগা?

আচ্ছা তাহলে আর একটু আলুর দমের রস দাও।

আউর কুছভি নেহি মিলেগা, লেনা হয় ত লেও, নেহি ত—

ইত্যবসরে আর একজন খরিদ্দার এসে পড়তে তার দিকে ফিরে লছমন বলে, হাঁ, বলিয়ে বাবুজী?

সে খরিদ্দারকে বিদায় করতেই, একটি ন' দশ বছরের হিন্দুস্থানী মেয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে আগে একটা দুয়ানী তার হাতে দিয়ে বললে, এ লালা, হামকো চার পয়সেকে জিলেবী দেও, আউর চারঠো পয়সা ঘুমতি দেও—

শহরের বুকে হলেও দুপুরের নিস্তব্ধতা সেই গলিটার মধ্যে তখন এমন এক

অদ্ভুত মোহ সৃষ্টি করেছিল যে তার মধ্যে সহসা সেই মেয়েটির কণ্ঠস্বর যেন বেজে উঠলো বাঁশির মত।

এক, দো···লে। ব'লে ঠোঙাটা আগে তার হাতে দিলে—তারপর পয়সা।

মেয়েটি একআনিটা বাঁ হাতে মুঠির মধ্যে চেপে ধরে তারপর ঠোঙার দিকে চেয়ে বললে, এ লালা একঠো 'ফাউ' দেও, হাম চার পয়সাকে লিয়া।

নেহি হোগা চার পায়সেমে ফাউ! যাও ভাগো!

এ লালা, দেও একঠো, তানি ছোটিসে—বলে মেয়েটি কণ্ঠে একপ্রকার সুর টানলে।

কি জানি কি আবেদন ছিল তাতে; লছমনের মনটা হঠাৎ নরম হ'য়ে যায়। এদিক ওদিক চেয়ে, খপ্ ক'রে একটা জিলিপী তুলে নিয়ে তার হাতে দিয়ে সে বলে, যাও ভাগো, লেকিন্ কোইকো মাত্ বোল্না!

কথাটা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু তার বুকটা কেঁপে উঠলো। দেখে পাশের গলির দিকের জানলার ফাঁক দিয়ে তার বাপের দু'টি রক্তচক্ষু তার দিকে তাকিয়ে আছে।

মেয়েটা চলে যেতেই ছুটে এসে রামশরণ ছেলের কানটা একেবারে পাকড়ে ধরলে। তারপর কিল চড় ঘুসি যথেচ্ছভাবে চালাতে চালাতে বললে,—কাহে 'ফাউ' দিয়া বোল! বোল্ উল্লু! বোল্ শুয়ার-কি বাচ্ছা! হিন্দুস্থানী ভাষায় যত রকমের গালিগালাজ আছে তার কোনটাই বাদ রাখে না!

লছমন কি জবাব দেবে বুঝি ভেবে পায় না। শুধু ডুকরে ডুকরে, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে।

রামশরণ মারতে মারতে বলে, বোল্, আউর কভি দেগা?

নেহি, কভি নেহি! কাঁদতে কাঁদতে আকুল হয়ে উত্তর দেয় লছমন।

রামশরণ আবার ধমক দিয়ে বলে, বোল্, ও কৌন হ্যায় তেরা?

নেহি জানতা! তেমনি অশ্রুরুদ্ধস্বরে উত্তর দেয় লছমন।

ফিন্ ঝুট্ বোলতা? রামশরণ আবার মারে।

ঝুট্ নেহি, সাচ্ বাবুজী। ব'লে লছমন বাপের পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ে।

কিন্তু তবুও ছেলের সেই কথা বাপের কাছে মিথ্যা বলে মনে হয়—কেন, কে তার জবাব দেবে!

পুরনো দারোয়ানটাকে দেখতে
খোঁজ করতে। আপিসের
অনেকটা এগিয়ে গেলে
একটা পাকা ঘর

কুহু

কু-হু-উ···কু-হু-উ···

কোকিলের ডাক তো নয়, যেন কোন কিন্নর-বিনিন্দিত কণ্ঠ ···ামস্বরূপ রূপোর গমক সুধার তরঙ্গের মত সহসা আছড়ে এসে পড়লো পরমেশবাবু··· রেখে বুঝি দোতলার ঘরে—তেরোর একের একের ডি, বাঞ্ছারাম অক্রূর লেনের ···গেলো। ···বারে শেষ প্রান্তে জরাজীর্ণ, সাবেকী আমলের পাতলা ইঁট দিয়ে তৈরী যে ··· সর্বাঙ্গে নোনা ঝরছে, দেওয়ালগুলোর অস্থিতে পঞ্জরে দূর্বা না গজিয়ে মাথা চাড়া··· উঠেছে অশ্বত্থগাছ, যার শত শত শিকড় শিরা-উপশিরার মত প্রাণপণে আঁকড়ে ধ··· আছে বাড়িটাকে ধ্বংসের মুখ থেকে বাঁচাবার জন্যে, তাই দেখলে মনে হয় বুঝি ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কলকাতায় পা দেবার আগে ওটা তৈরী হয়েছিল—তারই মধ্যে কেমন করে যে সেই কোকিলের ডাক গিয়ে পৌছল তা গবেষণা-সাপেক্ষ সন্দেহ নেই। বিশেষ এই অসময়ে অর্থাৎ সকালে, দু'বাড়ির ছেলে-পড়ানো সেরে, সবে যখন এসে তিনি গায়ের জামাটা খুলে পুরনো ক্যালেণ্ডারের পেরেকটার ওপর ঝুলিয়ে তালপাখা দিয়ে হাওয়া না খেয়ে পিঠের শেষপ্রান্তস্থিত ঘামাচি চুলকোতে চুলকোতে ছোট মেয়েটাকে পাঠিয়েছিলেন খোঁজ করতে কলঘরটা নীচের ভাড়াটে-কর্তা খালি করে দিয়েছেন কিনা—কারণ লোকটা ভারি শুচিবায়ুগ্রস্ত, পাঁচবার মাটি দিয়ে হাত না ধুলে তার হাত পরিষ্কার হয় না—এবং যখন জিবের ওপর আঙুলটা ঘষতে ঘষতে একেবারে গলার মধ্যে চালিয়ে দিয়ে, ওয়াক্ ওয়াক্ শব্দে মুখ প্রক্ষালন করতে করতে গলার মসীকৃষ্ণ উপবীতটা দু'হাতের আঙুলের ফাঁকে তাঁতীর মত সুতোর টানা প'ড়েন দিতে দিতে মুখে 'গঙ্গা গোদাবরী চ' আবৃত্তি করতে করতে চৌবাচ্চা থেকে মগের পর মগ জল ঢেলে চলেন মাথায় এবং ওদিকে ঠিক সময়ে স্নান করতে না পেয়ে আপিসে লেট হয়ে যাবার আশঙ্কায় ঘড়ির দিকে তাকিয়ে মেয়ের আসাপথ চেয়ে উৎকণ্ঠিত হয়ে বসে থাকেন পরমেশবাবু, ঠিক তখন তাঁর সেই সুদুর্লভ ক্ষণিক অবকাশে যখন কোকিলের ঐ ডাক তাঁর কানে এসে আঘাত করলে না, একেবারে মর্মে গিয়ে বিঁধলো, তখন কণ্ঠে বিস্ময় ও অবিশ্বাসের সুর মিশিয়ে তিনি বলে উঠলেন, আ-মো-লো, এ যে দেখছি কোকিলের ডাক।—তা এখানে এ উৎপাত এলো কোথা থেকে?

সত্যি কথা বলতে কি, এই এক বাড়িতে ছাব্বিশ বছর কাটলো পরমেশবাবুর, কিন্তু কোকিলের ডাক ত দূরের কথা, কখনো একটা চড়ুই পাখীর কিচিরমিচিরও

অদ্ভুত মোহ সৃষ্টি করেছিল যে তার ১কের রাজত্ব, তাই ওখানে বুঝি অন্য কোন জীব উঠলো বাঁশির মত। ভুলে গিয়েছিলেন তিনি কোকিলের কথাটা। শীতের [illegible] এক, দো…নে। [illegible] আজো যে তেমনি ঋতু-ঋতুর উৎসব চলে প্রকৃতির প্রাঙ্গণ [illegible] [illegible]য়েছেন। ওই সঙ্কীর্ণ গলিটার দু'পাশে ছোটবড় বহু বাড়ি চেয়ে বলবে, এ [illegible] ওরই মত। শুধু অসূর্যম্পশ্য নয়, বিশুদ্ধ অক্সিজেন্'এর অভাবে নেহি হোগা। গলিটার গোলকধাঁধা পেরিয়ে আলো-বাতাসের সঙ্গে এক টুকরো এ [illegible] কিছু সবুজ ঘাস ও দু'চারটে গাছপালা দেখতে হলে অন্তত দশ মিনিটানলে। যে হেঁটে আসতে হয় পরমেশবাবু সেটা বিলক্ষণ জানেন। হাতের পাখাটা [illegible] আবার তিনি চিন্তা করতে থাকেন, তবে কি কোন বাড়িতে কেউ কোকিল [illegible]ছে! কিন্তু তাই বা কেমন ক'রে হয়। তাহ'লে ত আর কোনদিন এ ডাক তিনি কানে শুনতে পেতেন! একবারও কিন্তু এ কথাটা তাঁর মাথায় গেল না যে সেদিনই প্রথম ডাকল সেই কোকিল কুহু ক'রে!

অথচ এর জন্যে তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না। সওয়া ন'টায় বাসা থেকে বেরিয়ে তিন পয়সার সেকেণ্ড ক্লাস ট্রামে ঝুলতে ঝুলতে যখন তিনি আপিসের পিছনদিকের 'গো-ডাউন্'টার মধ্যে গিয়ে ঢোকেন এবং মালের আমদানি রপ্তানির হিসাব মিলোতে বসেন কানে কলম গুঁজে, তখন বেলা দশটা বাজলেও তাঁর ঘরে জ্বলে হাজার বাতির আলো। আবার ছুটির পরে একটা ছেলে পড়িয়ে যখন বাড়ি ফিরে আসেন তখনো রাত্তির আটটা বেজে যায়। তাঁর জীবনে দিনের আলো দেখার সৌভাগ্য কদাচিৎ ঘটে। আপিসে যেদিন ছুটি থাকে, উপরি-পাওনার লোভে সেদিনও তিনি মাল গুদামের চাবি খুলে হিসাবনিকাশ করতে ভোলেন না। তাই আজ এমন অসময়ে হঠাৎ কোকিলের ডাক কোথা থেকে এলো, এই নিয়ে যখন মনে তোলাপাড়া করতে লাগলেন, ছোট মেয়েটা ছুটে এসে বললে, বাবা শীগ্গির ওঠো—কলঘর থেকে এইমাত্র পুঁটির বাবা বেরুলেন।

নিমেষে কোকিলের চিন্তা যেন কোথায় উধাও হয়ে যায়, আর সেইসঙ্গে পরমেশবাবুর মনে পড়ে স্নান, আহার ও এতটা পথ গিয়ে ট্রাম ধরা, তারপর আপিসে পৌছতে পাঁচ মিনিট লেট্ হ'লে নতুন সাহেবের মুখবিকৃতি! কিন্তু এ সবের জন্যে দায়ী সেই নীচের তলার শুচিবায়ুগ্রস্ত লোকটি। কাজেই অন্তরের সমস্ত ক্রোধ তৎক্ষণাৎ তার ওপর গিয়ে বর্ষিত হয়। সত্যি, কলঘর থেকে যেদিন ওঁর বেরুতে বিলম্ব হয় সেই দিনই পরমেশবাবুর আপিসে লেট হয়ে যায়।…

সেদিন আপিসে তৃতীয় দফা চায়ের বেঁটে গ্লাসে [illegible]খনো দারোয়ানটাকে দেখতে পানের ডিবেটা বার করেই পরমেশবাবু গৃহিণীর ওপর [illegible] করছে। আপিসের আজ পান কম দিয়েছে, নইলে এর মধ্যে ফুরিয়ে গেল [illegible]

চায়ের গ্লাসটা মুখ থেকে নামিয়ে একসঙ্গে দু'টো পান [illegible] একটা [illegible] পুরে একটা বিড়ি না ধরালে নাকি নেশা জমে না, কাজে উৎসাহ [illegible] বাবুর। তাই তৎক্ষণাৎ তিনি কলম ফেলে উঠে গেলেন পান কিনতে। [illegible] দেখে বুঝি

পিছনের দরজাটা দিয়ে বড় গলিটায় নেমেই তিনি চমকে উঠলেন। [illegible]লো। পাতের এককোণে কাঠের বাক্সর ওপর পানের ডালা সাজিয়ে যে পানউলীটি আছে তার সামনে দাঁড়িয়ে পান চিবুতে চিবুতে হেসে হেসে চুপি চুপি কি কথা ব[illegible] ছিল অনুপম। তাঁদের আপিসের মধ্যে সবচেয়ে সচ্চরিত্র ও লেখাপড়া-জানা ছোকরা বলে তাকে মনে মনে ভারি শ্রদ্ধা করতেন পরমেশবাবু।

কি জানি কেন অনুপমও তাঁকে দেখামাত্র চট্ করে সেখান থেকে সরে গেল এবং অন্যপথে একেবারে আপিসের মধ্যে গিয়ে ঢুকে পড়লো। ওঃ, তাহ'লে দেখছি সবাই ডুবে ডুবে জল খায়, সবাই ধম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির! আমি ভেবেছিলুম বুঝি, চারটে পাশ করা একালের ছোকরা, ওর অন্তত কোন বার-দোষ নেই।

আপন মনে গজগজ করতে করতে পরমেশবাবু রাস্তাটা পার হয়ে সেই পানউলীর কাছে গিয়ে এক আনার পান কিনে, তার সঙ্গে গুণ্ডি, কিছু সুপুরি ও পানের বোঁটায় চুন চেয়ে নিয়ে আবার নিজের জায়গায় ফিরে এসে কাজে মন দিলেন।

পাঁচটা বাজার তখনো অনেক দেরি। টেবিলের ওপর স্তূপাকার কাগজপত্রের মধ্যে ঘাড় গুঁজে কাজ করে চলেছেন পরমেশবাবু; রেসের ঘোড়া ফিনিশ দেবার আগে যেমন দ্রুততম গতিতে ছোটে, তাঁর কলমও অনেকটা তেমনি ভাবেই চলছিল। তাঁর অ্যাসিস্ট্যাণ্ট তরুণ যুবক কমলাক্ষ অকারণে উসখুস করছিল যাতে পরমেশবাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। কিছুতেই যখন তা সম্ভব হলো না, তখন সে তাঁর টেবি-লের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো নিঃশব্দে। কলমটা থামিয়ে তার মুখের দিকে তাকাতে গিয়ে তার বেশভূষার পারিপাট্য দেখে তিনি ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন। গিলে-করা আদ্দির পাঞ্জাবির ভেতর থেকে জালি গেঞ্জি উঁকি মারছে, পরনে দিশি জরিপাড় ধুতি, পায়ে কালো সোয়েডের চকচকে জুতো।

বারকতক মাথার ঝাঁকড়া চুলের পিছন দিকে হাত ঘষে সঙ্কোচের সঙ্গে কমলাক্ষ বললে, স্যার, আজ একটু আগে ছুটি দিতে হবে!

ঝাঁঝালো কণ্ঠে তিনি উত্তর দিলেন, এখনো এত কাজ বাকি, বোম্বের ডেস্প্যাচ

আসে নি—সব জেনেশুনে আপনি যদি তাড়াতাড়ি চলে যেতে চান, তাহ'লে একা এসব আমি করবো কখন ?

অনুনয়ের সুরে এবার কমলাক্ষর কণ্ঠ করুণ হয়ে এলো। বললে, স্যার, কাল ফার্স্ট আওয়ারে এসে আমি সব ক'রে দেবো। এখন না বেরুলে সাড়ে পাঁচটার মেচেদা লোক্যালটা আর ধরতে পারবো না। তাতেও পৌঁছতে রাত্তির সাড়ে আটটা হয়ে যাবে।

শ্বশুরবাড়ি যাবেন বুঝি ?

সলজ্জকণ্ঠে উত্তর দিলে কমলাক্ষ, আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার।

তাহ'লেই হয়েছে ! কাল আপিস কামাই করবেন ত আবার ?

না স্যার, কাল আমি কিছুতেই কামাই করবো না। আপনাকে কথা দিচ্ছি। সেকেণ্ড ট্রেন নাগপুর প্যাসেঞ্জার সাড়ে ছ'টায় ছাড়ে মেচেদা থেকে। ওটা ধরবোই।

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে কমলাক্ষর দিকে তাকিয়ে এবার পরমেশবাবু প্রশ্ন করলেন, আজ শুক্রবার, আজ না গিয়ে কালকে গেলেই ত ভালো হ'তো, একেবারে রবিবারটা কাটিয়ে সোমবারে এসে কাজে লাগতেন। তাতে আমারও সুবিধে হতো কাজের। একটু ভেবে দেখুন। এমন কী জরুরী কাজ যে শুধু এই রাতটুকুর জন্যে এত ছুটোছুটি করে অর্থব্যয় ক'রে যেতেই হবে ! আর কুড়ি-বাইশ ঘণ্টা পরে গেলে চলে না ?

স্যার, আমি কথা দিচ্ছি কাল আসবোই। আজ আমায় যেতেই হবে, বড্ড দরকার ! আমতা আমতা করে জবাব দিলে কমলাক্ষ।

বড্ড দরকার যদি সত্যি থাকে তাহ'লে যান ! কলমটা তুলে নিয়ে তিনি আবার লিখতে শুরু করেন, একটু পরে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার স্ত্রী বুঝি ওখানে ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। বলেই সলজ্জ ভঙ্গীতে চট্ করে তাঁর সামনে থেকে চলে গেল কমলাক্ষ !

পাঁচটা বাজার ঘণ্টা পড়তেই, আপিস খালি করে যত কেরানীর দল বেরিয়ে গেল। কিন্তু পরমেশবাবুর ঘাড় তোলবার অবসর নেই। তখনো তাঁর কলম তেমনি দ্রুত ছুটে চলেছে। পৌনে ছ'টা নাগাদ কাগজপত্র গুছিয়ে রেখে তিনি হাঁক দিলেন, এ রামস্বরূপ—রামস্বরূপ···আরে কাঁহা গিয়া—ফটক বন্ধ্ করনে হোগা, হাম যা রহা।

কিন্তু, কোথায় রামস্বরূপ ? তার কোন পাত্তাই নেই।

ছ'টা যখন বেজে গেল ফিরিঙ্গী গির্জের ঘড়িতে, তখনো দারোয়ানটাকে দেখতে না পেয়ে একটা বিড়ি ধরিয়ে তিনি গেলেন তার ঘরে খোঁজ করতে। আপিসের পিছনে যে পথে কলঘর ও প্রস্রাবখানায় যেতে হয়—তা দিয়ে অনেকটা এগিয়ে গেলে তবে একেবারে শেষ প্রান্তে দেওয়ালের গা ঘেঁষে ছোট্ট ও নীচু একটা পাকা ঘর দারোয়ানের। তার সামনে একখানা দড়ির খাটিয়ার ওপর বসে বৃদ্ধ রামস্বরূপ রুপোর মোটা বালা ও মল পায়ে দেওয়া এক হিন্দুস্থানী যুবতীর মাথা হাঁটুর ওপর রেখে বুঝি উকুন বাছছিল। পরমেশবাবুকে দেখেই সে বৌটাকে সরিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

আজ এত্না জল্দি হো গিয়া বাবুজী? প্রশ্ন করলে।

বিড়ির টুকরোটা মুখ থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পরমেশবাবু উত্তর দিলেন, কমলাক্ষবাবু ছুটি নিয়ে আজ আগেই চলে গেছে, একা আর কতক্ষণ ভাল লাগে বলো পাঁড়েজী!

ইয়ে ত ঠিক বাত হ্যায় বাবুজী! একলা কোই কাম্‌মে মন্ চলতা নেহি। বলে পায়ের খড়মে খটাখট্ শব্দ করতে করতে চাবির থোলো হাতে এগিয়ে এসে রামস্বরূপ যখন পরমেশবাবুর গুদাম ঘরের দরজাটা টেনে ভারী তালাটায় চাবি ঘোরাতে লাগল তখন শুধু তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি ত এখানে একাই থাকতে বরাবর, ওই জেনানা তাহ'লে তোমার কে পাঁড়েজী?

দারোয়ানের পাকা গোঁফে ঢাকা ওষ্ঠপ্রান্তে যেন নিমেষে হাসির ছোঁয়াচ লাগল। চাবিটি কষে ঘুরিয়ে তালাটা টেনে দেখতে দেখতে শুধু জবাব দিলে, ও আমার একরকম ভাইঝি হয় বাবু!

বাসায় ফিরতেই দেখেন, ঠিকে ঝিটা দরজার পাশে বসে আছে। পরমেশবাবু প্রশ্ন করলেন, কি গো লক্ষ্মীর মা, তুমি আজ এত রাত্তির পর্যন্ত যে রয়েছো—ব্যাপার কি?

আমি আর আপনার বাড়িতে আজ থেকে কাজ করতে পারবুনি, তাই মাইনে লেবার তরে বসে আছি।

কেন গো, কি হলো তোমার আবার?

পরমেশবাবুর মুখের কথা মিলোবার আগেই রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলেন তাঁর স্ত্রী রাজবালা। চোখ টিপে, তাঁকে চাপা গলায় বললেন, সে অনেক কেলেঙ্কারি, বলবো'খন। তুমি এখন ওর টাকাটা হিসেব ক'রে আগে চুকিয়ে দাও। এ মাসের

এই চোদ্দ দিনে ওর মোট পাওনা হচ্ছে গিয়ে সাড়ে তিন টাকা।

পরমেশবাবু ঘরে ঢুকে জুতো জামা খুলে আগে এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল স্ত্রীর কাছে চেয়ে খেলেন। তারপর জামার পকেট থেকে দু'টাকার একখানা নোট নিয়ে বিছানায় কোণটা হাতড়াতে লাগলেন—হ্যাগো, এখানে যে সকালে দেড়টা খুচরো টাকা রেখে গিয়েছিলুম, কি হলো?

রাজবালা বললেন—ও, সেটা আমি নিয়েছি।

কেন? প্রশ্ন করলেন পরমেশবাবু।

একটা দরকারী জিনিস কিনেছি। বলতে বলতে স্বামীর কাছে এগিয়ে গিয়ে তিনি বললেন, আমার বরাবর সন্দেহ ছিল যে, মুখে যে সবসময় ধর্মের কথা আওড়ায় আর স্নান করতে গিয়ে পাঁচবার মাটি দিয়ে হাত পরিষ্কার করে সে লোক কখনো ভাল হতে পারে না।

কেন, কি হয়েছে শুনি? কি করলে ও তোমার?

আমার করবে? এতবড় আস্পর্ধা? ফোঁস করে উঠলেন রাজবালা। ওই লক্ষ্মীর মা যখন কলঘরে বাসন মাজছিল তখন নাকি তার আঁচলে একটা পাঁচটাকার নোট বেঁধে দিয়ে বলেছেন, তোর বাড়ি যাবো আজ রাত্রে—ব্রাহ্মণ-ভোজন করাস এই দিয়ে।

পরমেশবাবু বললেন, বল কি, এ যে বিশ্বাস হয় না!

রাজবালা বললেন, মিছে কথা বলে ওর লাভ কি? কৈ, তোমার নামে ত বলতে আসে নি। তাই নোটখানা তার মুখের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বেরিয়ে এসেছে—নীচের তলায় আর কাজ করবে না। আমাদের একার কাজের জন্যে ও আর এতটা পথ আসবে না। তাছাড়া মাইনে নীচে থেকেই তো বেশি পেতো। পোষাবে কেন আমাদের একার কাজে?

তখনো পরমেশবাবু যেন কথাটা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। বললেন, কিন্তু আমি ত ওঁকে অত্যন্ত শুদ্ধাচারী নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ বলে জানতুম।

হাঁ-হাঁ—ভিজে বেড়াল—সবাই নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ! জানি।

লক্ষ্মীর মা'র কানে বোধ হয় কথাটা গিয়েছিল! তাই সঙ্গে সঙ্গে সে বলে উঠলো, বামুন? ঝাড়ু মারি অমন বামুনের কপালে! আমি গরীব, লোকের বাড়ির এঁটো বাসন মেজে খাই বলে কি আমার মান-ইজ্জৎ নেই! আমারও পুরুষ আছে। সাড়ে সতেরো টাকা খরচ করে বামুন ডেকে মন্ত্র পড়ে তবে বিয়ে হয়েছে। আমাকে কি অন্তবাড়ির ঝিয়ের মত পেয়েছে, যে বাসন মাজছে, সে-ই রান্না করছে, আবার সে-ই

বাবুর মুখে পান তামাক জুগিয়ে তার গা-হাত-পা টিপে দিচ্ছে। কালে কালে আরো কত দেখতে হবে তা কে জানে। ছি, ঘেন্নায় মরে যাই!

আচ্ছা, তুই চুপ কর্। বাবু ঘরে রয়েছে তোর খেয়াল' নেই? এই নে তোর টাকা। বলে তাকে তখনই বিদায় ক'রে দিলেন রাজবালা।

ওপর-নীচের সব দরজাগুলো ভাল ক'রে পরীক্ষা ক'রে তবে পরমেশবাবু রাত্রে শুতে যান। এবং প্রতিদিনই তাঁর আগেই রাজবালা ছেলেমেয়েগুলোকে সরিয়ে তার মধ্যে একটু স্থান ক'রে নিয়ে শুয়ে পড়েন। কিন্তু আজ কি হলো কে জানে, হঠাৎ ঘরে ঢুকেই পরমেশবাবু দেখেন, রাজবালা দেওয়ালে ঝোলানো আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে মুখে বিলিতি ক্রীম ঘষছেন।

দরজাটায় খিল এঁটে দিয়ে এগিয়ে এসে বললেন, এ আবার কি?

রাজবালা নতুন শিশিটার মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে আরো একটু ক্রীম তুলে নিতে নিতে জবাব দিলেন, বললুম ত তখন একটা জিনিস কিনেছি!

তা তুমি যে এতদিন পরে আবার ক্রীম কিনতে যাবে মুখে মাখবার জন্যে তা কেমন ক'রে ধারণা করবো?

কেন, আমার কী এমন বয়েস হয়েছে যে একটু ক্রীম মাখলে লোকে নিন্দে করবে? তোমার মত আমার ত আর চুল পাকে নি?

আহা, আমি কি তাই বলেছি! তুমি ত কোনদিন এসব মাখো না, তাই বলছিলুম।

তুমি কোনদিন ইচ্ছে করে একটা কিনে দিয়ে দেখেছো, মাখি কি না মাখি? আজ সকাল থেকে কেমন একটা টানের হাওয়া দিচ্ছে—মুখের চামড়া যেন শুকিয়ে উঠছে, তাই ছেলেটাকে দিয়ে এটা কিনে আনিয়েছি। ভারি চমৎকার গন্ধ করেছে, না? বলে সমস্ত মুখটায় ভাল করে ঘষে রাজবালা স্বামীর নাকের কাছে আঙুলটা তুলে ধরতে, পরমেশবাবু একটা নিঃশ্বাস টেনে বললেন, সত্যি, ভারি চমৎকার গন্ধ ত!

মাখো না একটু! কতকাল ত তুমি এসব ছোঁও নি। বলে সোহাগে গদ্‌গদ হয়ে পরমেশবাবুর মুখে মাখিয়ে দিতে লাগলেন।

বিছানায় ছ'টা ছেলেমেয়ে ঘুমচ্ছিল। তারা কেউ যদি হঠাৎ চোখ খোলে এই সময়? বড় ছেলেটার ত প্রায় পনেরো বছর বয়স হলো। দেখতে পেলে কী মনে

করবে! তাই ভয়ে ভয়ে একবার সকলের মুখের ওপর চোখটা বুলিয়ে নিয়ে তিনি স্ত্রীকে বললেন, হয়েছে—হয়েছে—!

আহা, আর একটু বুঝি তর সইছে না! সব তাতে তোমার বাড়াবাড়ি। দেখ দিকিনি মুখের চেহারা একেবারে ফিরে গেল! সব সময় তুমি এমন নোংরা হয়ে থাকো যে কে বলবে তোমার বয়স এই ছেচল্লিশ! যেন পঞ্চাশ বছরের বুড়ো হয়ে গেছো বলে মনে হয়। আজ থেকে রোজ রাত্তিরে শোবার আগে এটা না মাখলে তোমায় বিছানায় শুতে দেবো না!

হুঁ। বলে শুধু মুচকি হাসলেন পরমেশবাবু।

হাসলে যে? বলতে বলতে স্বামীর কাঁধের ওপর মাথাটা রাখলেন রাজবালা, অকারণেই।

মুখে হুঁ ব'লে কথাটা উড়িয়ে দিলেন বটে পরমেশবাবু, আসলে কিন্তু মনে মনে তিনি চিন্তা করছিলেন, হঠাৎ আজ হলো কি গিন্নীর! এতকাল পরে আবার সোহাগ উথলে উঠলো কেন?

নিঃশব্দচারিণী

অবিনাশ চিনতে পারে কিনা কে জানে! কিন্তু এখনো চিত্রিতা ভোলে নি তাকে। ট্রামে, বাসে, সিনেমায়, ধর্মতলার মোড়ে কত বার দেখেছে। এমনও হয়েছে দু-এক দিন সে স্টেটবাস-এর ভিড়ে বসবার জায়গা না পেয়ে ঠিক তার সামনে, লেডিস্ সীট্-টার একেবারে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ভবানীপুর থেকে এসপ্লানেড পর্যন্ত চলে গেছে। মধ্যে মধ্যে হঠাৎ বাসের ঝাঁকানি সামলাতে না পেরে তার দেহের সঙ্গে ওর দেহের মৃদু স্পর্শও লেগেছে, তবু মুখ তুলে একবারও চিত্রিতার দিকে সে তাকায় নি কিংবা ইতিপূর্বে কোথাও তাকে দেখেছে কিনা—ভ্রূ কুঁচকে আড়চোখে চোরা-চাহনী হেনে, তা স্মরণ করবার চেষ্টাও করে নি।

অথচ সে যে সে-ই ব্যক্তি, যার সঙ্গে একদিন তার বিয়ের ঠিকঠাক হয়ে হঠাৎ ভেঙ্গে গিয়েছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ওরকম ঢ্যাঙা, বলিষ্ঠ, পাঞ্জাবী-মার্কা চেহারা বাঙ্গালী যুবকদের মধ্যে যেমন বিরল, তেমনি ওর ডানদিকের কপালের ওপ-রের সেই কাটা দাগটা ত ভুল হবার কথা নয়! কলেজের হয়ে দিল্লীতে ফুটবল ম্যাচ খেলতে গিয়ে শুধু শীল্ড-বিজয়ী হয় নি, তার সঙ্গে বিপক্ষ দলের হাত থেকে ওই স্মৃতি-টুকুও নিয়ে এসেছিল বুঝি অতিরিক্ত পুরস্কার। বিয়ের আগে কত জায়গায় সম্বন্ধ হয়েছিলো চিত্রিতার—কত যুবক বন্ধুদের সঙ্গে করে তাকে দেখে গিয়েছে, কত বাড়ির মেয়েরা এসেছিল, কত পিসেমশাই, মেসোমশাই, বাপ, খুড়ো, মামার দল—তাদের কারো কথাই আজ আর মনে নেই চিত্রিতার। দশ বছর হয়ে গেল তার বিয়ে হয়েছে—তার পূর্বের সব ঘটনা মনে রাখবার কি গরজ তার? তবু অবিনাশের কথাটা সে যে ভোলেনি, এখনো তার স্মৃতিতে যে জ্বলজ্বল করছে, তার বুঝি একটা বিশেষ কারণও আছে। সেটা পুরুষের পক্ষে অত্যন্ত লজ্জাকর বলেই সে মনে করে। পাঁচ হাজার টাকা সর্বসমেত দেনা-পাওনা ঠিক হয়ে যাবার পরও অবিনাশের বাবা আবার যখন কন্যার পিতার ঘাড় যথেষ্ট শক্ত মনে করে আরো কিছু ঋণের বোঝা চাপিয়ে দেবার প্রস্তাব করলেন, তখন বেঁকে দাঁড়ালেন চিত্রিতার বাবা।

মেয়েকে ডেকে বললেন, একটা রেডিও আর একটা সেলাইকল যে আমি এর ওপর অতিরিক্ত দিতে পারি না তা নয়, কিন্তু যে লোক এইভাবে কথার খেলাপ করতে পারেন, তাঁকে আমি ভদ্রলোক বলে মনে করি না। তাঁর সঙ্গে আমি কাজ করবো না স্থির করেছি! বলে এমন দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চাইলেন যেন চিত্রিতা বাপকে

ভুল না বোঝে। ভুল বোঝা দূরে থাক, চিত্রিতা সঙ্গে সঙ্গে বাবাকে জানিয়ে দিলে, এ অসম্ভব। আপনাকে আর আমি একটা টাকাও ঋণ করতে দেবো না। মেয়ের বাপ বলে ওঁরা যা হুকুম চালাবেন তাই মাথায় পেতে নিতে হবে। মেয়ের রূপ-গুণটা কিছু নয়, আবার তার সঙ্গে এত কিছু ঘুষ দিতে হবে। তুমি এখুনি এ বিয়ে ভেঙ্গে দাও বাবা, বলে সদর্পে নিজের পড়বার ঘরে ঢুকে লজিকের নোট-লেখা কলেজের খাতাটার পাতা ওল্টাতে লাগল। অবশ্য তখনো চিত্রিতার মনে এই ধারণা স্পষ্ট ছিলো যে অবিনাশের কানে একথা গেলে সে কিছুতেই তার পিতার এ দাবি সমর্থন করবে না। হয়ত কালই আবার লোক আসবে ওখান থেকে। কিন্তু তারপর একমাস কেটে গেল। তবুও যখন তাঁরা কোন সংবাদ দিলেন না, তখন ওর বাবা এই রমেনের সঙ্গে তার বিয়ে ঠিক করে ফেললেন এবং ওপক্ষের সঙ্গে যে দিনটার কথা স্থির হয়েছিল সেই দিনেই চিত্রিতার বিয়ে দিয়ে দিলেন।

অবশ্য বিয়ের আগে চিত্রিতা তার গায়ের ঝালটা বেশ ভালভাবে উদ্গার করেছিল বিটুদার কাছে, তার দাদার বন্ধু সে। অবিনাশের সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধটা সে-ই এনেছিল। চায়ের পেয়ালার সঙ্গে দু'খানা ক্রিমক্র্যাকার বিস্কুট তার সামনে টেবিলের ওপর রাখতে রাখতে সে বলেছিল, এই ত তোমার অবিনাশবাবুর কাল্চার—এ শিক্ষা-দীক্ষার বড়াই যেন তিনি আর কখনো না করেন। এতই যদি রেডিও শোনার শখ ত নিজের পয়সায় কিনলেই পারতেন। কন্যাদায়গ্রস্ত শ্বশুরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে যে পুরুষ তার শখ মেটাতে চায়, তাকে আমি স্ত্রীলোকেরও অধম বলে মনে করি। ভেবেছিলুম খেলোয়াড় পুরুষদের মনটা বুঝি বেশী উদার হয়! তার ওপরে আবার ভাল ছেলে বলে নাকি কলেজে খ্যাতি ছিল!

আমাকে শুনিয়ে কোন লাভ নেই ভাই, তাছাড়া ভেঙ্গেই ত দিয়েছেন তোমার বাবা এ বিয়ে।

জলে উঠল চিত্রিতার চোখ দুটো, বললে, আমি তোমাকে শোনাবার জন্যে এসব বলছি না—আমি চাই তুমি এই কথাগুলো নিজে অবিনাশবাবুর কানে তুলবে! উত্তেজনায় চিত্রিতার কণ্ঠস্বর আরো কেঁপে উঠলো—আর বলো যে কথাগুলো আমি তাকে শোনাবার জন্যে তোমায় দিব্যি দিয়ে বলে দিয়েছি।

অবশ্য বিটুদা এ কথাগুলো অবিনাশকে বলেছিলো কিনা চিত্রিতা তা জানে না। বিয়ের পরে আর কোনদিন তার সঙ্গে দেখা হয় নি।

তবে সেদিনের জ্বালা এখনো ভুলতে পারে নি চিত্রিতা, হয়ত ভুলেই যেতো, যদি না এইভাবে অহরহ অবিনাশ তার দৃষ্টিপথে এসে পড়তো। রাগটা আরো তার

বাড়ে যখন একেবারে অপরিচিতের মত তার কাছ থেকেও অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নেয় অবিনাশ। সবচেয়ে ক্রোধটা বেশী হয়েছিল সেদিন 'নিউ এম্পায়ার-এ' উদয়শঙ্করের নাচ দেখতে গিয়ে। ঠিক একেবারে তার পিছনের সীট্‌টায় বসেছিল সে, নাচ দেখতে দেখতে আশ্চর্য হয়ে গেছে চিত্রিতা—উদয়শঙ্করের যে ভঙ্গীটা দেখে সে করতালি দিয়ে উঠেছে, পিছন থেকে অস্ফুটস্বরে বাঃ বাঃ বলে গোপনে অবিনাশও ঠিক তাকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেছে। আরো অনেক জায়গায় তার সঙ্গে রুচির অদ্ভুত মিল লক্ষ্য করে বার বার আড়চোখে তার মুখের দিকে তাকিয়ে চিত্রিতা দেখবার চেষ্টা করেছে যে, সেও তার মত নাচ দেখার ফাঁকে ফাঁকে তাকে দেখছে কিনা।

রমেনের পাশেই বসেছিলো সে, তার হাতের উপর নিজের হাতটা রেখে। স্বামী সঙ্গে থাকলেও যতটা সমীহ করে পর-পুরুষের দিকে চাওয়া যেতে পারে শোভনতার সেই গণ্ডীটুকুও বুঝি সে রক্ষা করতে পারেনি। ঐখানেই পরে আবার বিলেতী দলের থিয়েটার দেখতে গিয়ে দেখেছে—অবিনাশ ঠিক বসে আছে, তাদেরই সারিতে।

সেদিন নিখিল ভারত ললিতকলা প্রদর্শনীতে ছবি দেখতে গিয়ে বারান্দার এককোণে যখন তারা স্বামী-স্ত্রীতে যামিনী গাঙ্গুলীর প্রকাণ্ড দেওয়াল-জোড়া ছবিটার সামনে নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো তখন হঠাৎ চিত্রিতা তার কানের কাছে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসের শব্দ শুনে পিছনে তাকাতেই দেখে অবিনাশ একটা মূল্যবান স্যুট পরে দর্শকদের সঙ্গে ঠিক তারই পাশে দাঁড়িয়ে। আশ্চর্য! কোথায় যেন তার রুচির সঙ্গে অবিনাশের রুচির একটা মিল রয়েছে, এটা সে অন্তরে অন্তরে অনুভব করে। তা না'হলে এই শ্রেণীর সাহিত্য- ও সংস্কৃতিগত যেসব অনুষ্ঠান সেখানে কেবল ঘুরে ফিরে তার সঙ্গেই বা দেখা হয়ে যায় কেন? কিন্তু কখনই সে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে না, এটাই অদ্ভুত লাগে চিত্রিতার। অথচ সে কুৎসিত হয়ে যায় নি, দশ বৎসর বিয়ে হয়েছে বটে কিন্তু তাতে যেন সৌন্দর্য আরো বেড়েছে তার দেহে। অনেকের মুখেই একথা বারবার শুনেছে চিত্রিতা।

এক-এক দিন চিত্রিতার মনে হতো, রমেনকে বলে যে, ওর সঙ্গে একবার তার বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক হয়েছিলো। কিন্তু কি মনে করে চুপ করে গিয়েছে, তাকে জানায় নি। হাজার হোক্ স্বামী ত! যদি কোন মিথ্যে সন্দেহ জাগে তার সম্বন্ধে?

কিন্তু কিছুকাল পরে পার্ক স্ট্রীটের নতুন ফ্ল্যাটে উঠে যেতে চিত্রিতার বুকের মধ্যেটা কেমন কেঁপে উঠলো। একি! ঠিক তার সামনে উল্টো দিকের ফ্ল্যাটে থাকে অবিনাশ। অনেক আগে থেকেই অবিনাশ নাকি ওখানে ভাড়া আছে। পুরনো একটা চাকরের কাছ থেকে সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে চিত্রিতা জিজ্ঞেস করে। আচ্ছা, ওঁর মেম-

সাহেবকে দেখছি না কেন? আর সব সময় ঘরের জানলাই বা বন্ধ থাকে কেন?

মেমসাহেব কাঁহাসে আয়েগী মাইজী, ও সাহেব ত অভিতক্ শাদী নেহি কিয়া।

বিয়ে করেন নি! হঠাৎ তার মনটা যেন কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। তাহ'লে এখানে আর কে কে আছে?

কেউ নেই। সাহেবের বুড়ো বাপ আর মা মধ্যে মধ্যে এসে কিছুদিন করে এখানে থাকেন—তারপর আবার চলে যান দেশে। পুরনো এক চাকর আছে, সে-ই রান্না করে, ঘরের সব কাজ করে।

যত দিন যায় তত যেন কৌতূহল বেড়ে চলে চিত্রিতার মনে। এক-একদিন এমনও ইচ্ছা হয় যে যেচে আলাপ করে তার সঙ্গে। আবার মনে ভাবে, ছিঃ, যে পুরুষ এত অপমান করেছে, তার কাছে হ্যাংলামি করতে যাবে কোন্ দুঃখে! তা ছাড়া কোনদিন যদি রমেন সেকথা জানতে পারে তা হ'লে বড় খারাপ দেখাবে।

এরপর থেকে কেন জানি না ফ্ল্যাটটার নানারকম দোষ-ত্রুটি দেখিয়ে চিত্রিতা স্বামীকে প্রায়ই বলতো অন্য কোথাও উঠে যেতে।

রমেন আশ্চর্য হয়ে যায় তার কথা শুনে—বলো কি, এতো ভাল ফ্ল্যাট কলকাতায় ক'টা আছে! জানো কতদিন ধরে চেষ্টা করে এটা যোগাড় করেছি। আর যদি একান্তই এ পাড়াটা তোমার ভাল না লাগে, তা হ'লেও অপেক্ষা করতে হবে—আজকাল ত আর যখন তখন টাকা ফেললেই বাড়ী মেলে না। সবুর করো, লোকজনকে বলে দেখি!

সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা করবার সময় এক-একদিন অবিনাশের সঙ্গে প্রায় সামনা-সামনি দেখা হয়ে যায় চিত্রিতার। তবু কিন্তু তার মুখের একটি রেখারও পরিবর্তন ঘটে না।

অন্তরে অন্তরে কোথায় যেন চিত্রিতা একটু পরাজয় অনুভব করে।

প্রত্যেক বছরই বিয়ের তারিখে চিত্রিতা ও রমেন তাদের কয়েকজন বিশিষ্ট বন্ধু-বান্ধবকে নিমন্ত্রণ করতো চায়ের পার্টিতে। বলাবাহুল্য এবারও তার ব্যতিক্রম হ'ল না। কিন্তু কি জানি কেন চিত্রিতা এবার রমেনকে বলে নিমন্ত্রণ করে পাঠালো অবিনাশকে। বললে, ভদ্রলোক বাঙালী, একই ফ্ল্যাটের প্রতিবেশী—এই সূত্রে একটু আলাপ করা যাবে, কি বলো?

রমেন বললে, নিশ্চয়ই, খুব ভালো কথা। সে তখনি এক টুকরো স্লিপ লিখে বেয়ারাকে দিয়ে পাঠিয়ে দিলে অবিনাশের ঘরে।

আশ্চর্য! সবাই নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এলো, শুধু অবিনাশ বাদে। রাগে জলতে

থাকে চিত্রিতা। কি রকম অভদ্র লোকটা বল তো—এতটুকু শোভনতাবোধ পর্যন্ত নেই? আচ্ছা, কোন কারণে যদি আসতে না পারিস ত জানাতে পারতিস ত অন্ততঃ সেকথা, স্লিপ দিয়ে চাকরের হাতে।

রমেন বললে, ভালই হয়েছে, ওই অসভ্যটার সঙ্গে পরিচয় হ'লে পরে তোমাকেই হয়ত ওকে খাতির করে আবার ঘরে বসতে দিতে হতো।

দু' তিন দিন পরে চিত্রিতা হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠলো। সকাল থেকে কেবল বড় বড় ডাক্তারেরা আসা-যাওয়া করে কেন ওই ফ্ল্যাটে?

চাকরের কাছে খবর নিয়ে জানলে, তাদের ওখানে যেদিন রাত্রে চায়ের নিমন্ত্রণ ছিল সেই দিন সন্ধ্যার পর সেজেগুজে ফুলের গুচ্ছ হাতে করে বেরুতে যাবে, হঠাৎ ঘুরে পড়ে গিয়ে সেই যে সাহেব অজ্ঞান হয়ে যান, এখনো পর্যন্ত কোন ডাক্তারেই তাঁর জ্ঞান আনতে পারছে না। আরো খবর পেলে যে দেশ থেকে তাঁর মা, বাপ, বোন সকলেই এসেছেন। সকলেই ছুটোছুটি করছে ডাক্তারের বাড়ী।

হাসপাতালে পাঠাচ্ছে না কেন? চিত্রিতার মুখ দিয়ে হঠাৎ কথাটা বেরিয়ে পড়ল।

চাকর বললে, না, ডাক্তারবাবুরা বলেছেন, ওঁকে যেন নাড়াচাড়া করা না হয়।

রাত্রেই রমেনকে পাঠালো চিত্রিতা তাঁর খবর নিতে। হাজার হোক প্রতিবেশী, তাছাড়া সেদিন অসুখ না করলে হয়ত ভদ্রলোক আসতেন নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে।

রমেন ফিরে আসতেই চিত্রিতা শুষ্ককণ্ঠে প্রশ্ন করলে, ব্যাপার কি, ডাক্তারেরা কি রোগ ধরতে পারছেন না?

রমেন বললে, হ্যাঁ, পেরেছেন। নিদারুণ মেন্ট্যাল শক পেয়েছে বলে তাঁদের ধারণা। বলে একটু থেমে সে আবার শুরু করলে, ওর বাপ-মাকে ত ডাক্তারেরা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব প্রশ্ন করছেন দেখলুম। তবে ওর বাবাকে ডেকে আমি আড়ালে জিজ্ঞেস করতে তিনি বললেন, কিসে যে কি হ'ল বুঝছি না। একটি মাত্র মেয়ের সঙ্গে ওর বিয়ের কথাবার্তা পাকা হয়ে ভেঙ্গে যায়। তারপর থেকে ও আর বিয়ে করে নি। যা সম্বন্ধ আসে সব নাকচ করে দেয়। অথচ সেই মেয়েটির সঙ্গে যে কোন গোপন প্রেম ছিলো তাও নয়। দেনাপাওনার ব্যাপারে তাদের সঙ্গে কি গোলমাল হয়ে বিয়েটা ভেঙ্গে গিয়েছিল। আগে নাকি বিয়ে করবে না স্থির করেছিল—সেই প্রথম বিয়ে করতে রাজী হয়েছিলো। মেয়েটিকে নিজে দেখে সে পছন্দও করেছিল। তারপর আর আমল দেয় নি। সে প্রায় দশবছর আগের কথা।

তা ডাক্তাররা সব শুনে কি বলছেন?

[illegible] বলছেন সেই মেয়েটাকে যদি কোন রকমে একবার খোঁজ করে আনতে [illegible]—তাহলে তাকে দেখে কি প্রতিক্রিয়া হয় বলা যায় না।

আর কোন কথা জিজ্ঞেস না করে নিস্তব্ধ হয়ে গেল চিত্রিতা। পরের দিন রমেন অফিসে গেলে ধীরে ধীরে সে অবিনাশের ঘরের দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকলো। তারপর পা টিপে টিপে তার বিছানার কাছে এগিয়ে স্থির দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

ঘরের মধ্যে সকলের মুখে চোখে একটা আতঙ্ক। যেন এই মুহূর্তে চরম সর্বনাশ হতে পারে। সবাই নিঃশব্দে রোগীর মুখের দিকে তাকিয়ে বসে আছে।

চিত্রিতা কখন সেখানে ঢুকেছে কেউ তা লক্ষ্য করে নি, কিংবা লক্ষ্য করে থাকলেও কেউ কোন কথা তাকে বলেনি, পাছে সেই স্তব্ধতা ভঙ্গ হয়, এই আশঙ্কায়।

আধ ঘণ্টা কেটে গেল। বিছানার ঠিক পাশে তেমনিভাবে অবিনাশের মুখের দিকে অপলক নেত্রে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে চিত্রিতা।

হঠাৎ রোগীর চোখের পাতা দুটো যেন কেঁপে উঠলো। তারপর ধীরে ধীরে একটু একটু করে অবিনাশ চোখ খুললো। কিন্তু সামনে তার শয্যার সবচেয়ে কাছে ও কে দাঁড়িয়ে?

দৃষ্টিটা তার ক্রমশঃ বিস্ফারিত হতে হতে চিত্রিতার সমস্ত মুখটাকে যেন সে গ্রাস করে ফেললে। তারপর মাত্র একবার শুধু মুহূর্তের জন্যে মাথাটা তোলবার চেষ্টা করতেই ঘাড়টা লট্‌কে ভেঙ্গে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে চিরকালের মত স্থির হয়ে গেল বুঝি তার চোখের তারা।

সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলো।

চিত্রিতা এতক্ষণ মোহাচ্ছন্নের মত দাঁড়িয়ে ছিল। এদের কান্নার শব্দে যেন হঠাৎ চমক ভাঙ্গল তার। একবার বিহ্বলভাবে চারিদিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সে যে কেন এসেছিল এবং কেনই বা এমন করে বেরিয়ে গেল—তা কেউ বুঝতেও পারল না।

প্রতিবেশী

রাত্রি সাড়ে বারোটার সময় অনিলার স্বামী মারা গেল। অনিলা মৃত স্বামীর বুকের ওপর আছড়ে পড়ে চীৎকার ক'রে উঠলো—"ওগো তুমি কার কাছে আমায় রেখে গেলে গো।"

পুরনো কলকাতার জীর্ণতম এক অন্ধগলির মধ্যে সদ্য বিধবার সেই আর্তরব যেন মাথা ঠুকে ঠুকে গৃহ থেকে গৃহান্তরে ফিরতে থাকে।

ঘুমন্ত শহরের এ অঞ্চলটা যেন পাইথনের লেজের মত। মোটর বা রিক্সার দূরাগত শব্দও গভীর নিশীথে এর বুকের ওপর চেপে-থাকা নৈঃশব্দ ভেদ করে ঢুকতে ভয় পায়। সরকারী গ্যাসের আলো আছে গলিটায় মাত্র দু'টো, ঢোকবার মুখেই ডাস্টবিনটার ঠিক পাশে যেটা, তার কাঁচ ভেঙে মরচে ধরে পড়ে আছে কতকাল তা কে জানে, আলোর বদলে খানিকটা বেশী অন্ধকার যেন জমাট বেঁধে থাকে তার মাথায়। আর গলির শেষ প্রান্তে যেটা, শেঠদের লোনাধরা পুরানো বাড়ীর দেওয়াল গুলো যেন হাত বাড়িয়ে ধরে আছে যে গ্যাসের মাথাটা, সেটা জ্বলে, তবে মরণোন্মুখ হাঁপানী রুগীর চোখের মত—আলোর চেয়ে অন্ধকারকে যেন আরো বেশী বীভৎস করে তোলে!

তবু এরই মধ্যে প্রতিদিন প্রতিরাত্রে মহাকালের যে ইতিহাস রচিত হয়ে চলেছে, তার কতটুকু খবর মানুষের গোচরে আসে!

অনিলার সেই বুক-ফাটা আর্তনাদ কানে যেতেই সামনের বাড়ীর চারতলার চিল-কুঠরীর ঘরে মিনুর ঠাকুরমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। তিনি নাতনী মিনুকে কোলে নিয়ে প্রায়ই বেড়াতে যেতেন অনিলাদের বাসায়। তাই হঠাৎ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তিনি চীৎকার করে উঠলেন, তারা ব্রহ্মময়ী মা, একি করলি। ছুঁড়ীটা দু'টো মাছ ভাত খাচ্ছিল তাও তোর মনে সইলো না! আহা বড্ড ভাল মেয়েটা! বলতে বলতে আকর্ণবিস্তৃত একটা হাই তুলে, মুখের কাছে হাতটা উঁচু ক'রে দুটো আঙ্গুলে তুড়ি মারতে মারতে হাই তোলা শেষ করলেন। তারপর আবার অনিলার জন্যে মুখে আরো কিছু সহানুভূতি প্রকাশ করে বলে উঠলেন, নিশ্চয় আর জন্মে কোন পাপ করেছিল তা নাহ'লে ছুঁড়ীর কপাল এভাবে পুড়বে কেন? কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর একটা তন্দ্রাজড়িত হাই উঠতে তিনি আবার স-রবে 'তারা ব্রহ্মময়ী মা' বলে বালিশে মুখটা গুঁজে চোখ বুজলেন এবং একটু পরেই তাঁর নাক আবার ঠিক পূর্বের মতই ডাকতে লাগল।

[illegible] পাশের বাড়ীর মিত্তির গিন্নীর ঘুম বোধ হয় সকলের আগেই ভেঙে গিয়েছিল। কিন্তু তিনি মুখে কোনরকম সাড়াশব্দ না ক'রে শুধু চুপচাপ মনে মনে হিসেব ক'রে দেখছিলেন, অনিলার যে আটগাছা সোনার চুড়ী বাঁধা রেখে তাকে দু'শো টাকা ধার দিয়েছিলেন তাতে তাঁর কতখানি আদায় হতে পারে! প্রথমেই তাঁর মনে হলো—অনিলার অবস্থা ত জানতে কারও বাকী নেই! স্বামীর জন্যে চিকিৎসা করতে গিয়ে তার যথাসর্বস্ব দেনায় বিকিয়ে গেছে! তাছাড়া আপনার বলতে যে এক দেওর আছে সেও থাকে শ্বশুরবাড়ীর দেশে—কালই হয়ত এসে অনিলাকে নিয়ে চলে যাবে সেখানে। তারও অবস্থা ভাল নয়। দেশে সামান্য যা ধানচাল আছে তাই নেড়েচেড়ে কোন রকমে চলে। অনিলাই বরং মধ্যে মধ্যে লুকিয়ে এই দেওরকে কিছু কিছু টাকা দিয়ে সাহায্য করতো।

যাক্ ওসব বাজে চিন্তা! মন থেকে জোর করে সে চিন্তা তাড়িয়ে মিত্তির গিন্নী আবার হিসেব করতে থাকেন—এক এক গাছা চুড়ি এক ভরির কম নয়—আর তিনি দিয়েছেন মোটে দু'শো টাকা—তাও সুদ ধরেছেন খুব চড়া। আট ভরি সোনার দাম অন্ততঃ আটশো টাকা ত হবে! মনটা বেশ পুলকিত হ'য়ে ওঠে। কিন্তু পর মুহূর্তেই মনে হয়, যদি এ সোনার মধ্যে কোন ভেজাল থাকে? এ তো তাঁর বাপের বাড়ীর স্যাকরা যামিনীর তৈরী নয় যে সোনা সম্বন্ধে একেবারে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়! আবার মনে হয় যামিনীর মত অত সাচ্চা সোনা না হ'লেও ক্ষতি কি—না হয় দাম কিছু কমবে! এবার কম দামটার হিসেব ধরে তিনি লাভ-লোকসান কষতে থাকেন। স্বামীকে লুকিয়ে তিনি এইভাবে তেজারতি কারবার করেন। কিন্তু একটু পরে আবার তাঁর কি মনে হ'লো, কিছুতেই যেন ঘুম আসতে চায় না চোখে! তিনি স্বামীর গায়ে একটা ঠেলা মেরে বললেন, শুনছো, ওগো—বাবা, তোমার কি ঘুম?

বিরক্তিপূর্ণকণ্ঠে এবার ভোলানাথবাবু বলে উঠলেন, কেন কি হয়েছে—আঃ একটু যদি তোমার জন্যে শান্তিতে ঘুমোবার উপায় আছে!

মিত্তির গিন্নী একটু থেমে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, না—কিচ্ছু না—এই বলছিলুম কি—অনিলার স্বামী মারা গেল।

মারা গেল, তা আমাকে ডাকছো কেন? আমি কি তাকে বাঁচাতে পারবো?

আহা, মেয়েটা বড্ড কাঁদছে—তাই বলছিলুম কি, একবার গেলে হতো না? হাজার হোক প্রতিবেশী ত! সেবার ছোট খোকার অসুখের সময় কি সেবাটাই না সে করেছিল!

ভোলানাথবাবু ঝেঁজে উঠলেন, যা ইচ্ছে হয় করো গে। মোদ্দা আমি নীচে গিয়ে

দরজা বন্ধ ক'রে আসতে পারবো না—তা আগেই বলে দিচ্ছি।

তবে থাক। ভোরের দিকে গেলেই হবে'খন। বলে মিত্তির গিন্নী শুধু সজোরে একটা নিশ্বাস ফেললেন। তারপর আবার চুপচাপ! কিন্তু কতক্ষণ? একটু পরেই আবার স্বামীর গা ঠেলে আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলেন মিত্তির গিন্নী, হ্যাগা, আজকাল সোনার দাম কত?

ভোলানাথবাবু এবার একেবারে খিঁচিয়ে উঠলেন, তোমার আক্কেল-বিবেচনা বলে কি কিছু নেই? এইরাত্রে সোনার দর জিজ্ঞেস না করলে চলছিল না?

তুমি জেগে রয়েছ বলেই জিজ্ঞেস করলুম! বলে তিনি স্বামীর দিক থেকে মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে পাশ ফিরলেন উল্টোদিকে।

অপর একটা বাড়ীতে দুইজায়ে ঘুম ভেঙ্গে ফিসফিস ক'রে কি বলাবলি করছিল। ছাদে ছাদে এদের সঙ্গে অনিলার গল্পগুজব চলতো! বড়জা বললে, তখন পঞ্চাশবার বারণ করেছিলুম অনিলাকে, দেখ যথাসর্বস্ব বিকিয়ে দিয়ে অমন ক'রে ছেলেমানুষী করিসনি, তোর সিঁদুরের জোর থাকে ত স্বামী আপনি বাঁচবে! গরীবের ঘরে কে ক'টা বড় ডাক্তার দেখাতে পারে, তা'বলে কি তাদের স্বামীরা কেউ অসুখ করলে বাঁচে না? তা ছুঁড়ী একেবারে দেমাকে ফেটে পড়ছে, বললে কিনা, কি হবে ভাই আমার গয়নাগাঁটি আর টাকাকড়ি, যদি উনিই না বাঁচেন। এই পর্যন্ত বলে একটু থেমে সে আবার মুখ খুললে, এখন মজা দেখো, গয়নাগাঁটি টাকাকড়ি কি হবে! সারাজীবন পড়ে রইলো, যাও ভাইয়ের দোরে লাথি-ঝাঁটা খেয়ে ঝি-গিরি করগে।

ছোটজায়ের স্বামী অধিকাংশ দিনই রাত্রে বাড়ী আসে না। সে সঙ্গে সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলে উঠলো, হবে না, স্বামী যেন আর কারো কখনো হয়নি, দিনরাত স্বামীকে নিয়ে ছুঁড়ীর কি আদিখ্যেতা! এই জুতোর ফিতে বেঁধে দিচ্ছে—আবার আপিসে যাবার সময় কত ঢং—যতক্ষণ গলির মধ্যে থেকে দেখা যায় ততক্ষণ ঠায় চেয়ে থাকবে জানালা দিয়ে রাস্তার দিকে! এত বাড়াবাড়ি কি সয়? ভগবান সহ্য করবেন কেন? তাই তাড়াতাড়ি কেড়ে নিলেন। কি বল দিদি?

বড়জা কণ্ঠে একরকমের সহানুভূতির সুর টেনে বললে, তা নয় আবার—যা রয় সয় তাই কর। ভগবানের কি চোখ নেই?

সুকুমার ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে। তরুণ যুবক। অনিলাকে বৌদিভাই বলে ডাকতো।

কলেজ-লাইব্রেরী থেকে উপন্যাস এনে চুপিচুপি তাকে পড়তে দিয়ে আসতো। অনিলার যেদিন স্বামীর সঙ্গে সিনেমায় যাবার ইচ্ছে হতো, আগে থাকতে তাকে দিয়ে টিকিট কিনিয়ে আনিয়ে রাখতো। সেদিন বেশী রাত পর্যন্ত পড়াশুনা করে সে সবে ঘুমিয়েছিল। তবু ঘুমটা ভাঙতে তার একটুও দেরি হলো না। অনিলার কণ্ঠস্বর কানে যাওয়ামাত্র সে ধড়মড় করে বিছানা থেকে নেমে যে-ই ঘরের খিল খুলতে গেল অমনি পাশের বিছানা থেকে তার মার তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর কানে গেল, খোকা কোথায় যাচ্ছিস রে ?

একটু ইতস্তত করে সে বলে উঠলো, মা, বিনোদবাবু মারা গেছেন।

গম্ভীরকণ্ঠে তিনি উত্তর দিলেন, তা জানি।

অনিলা তাঁর ছেলের সঙ্গে যে বেশী মেলামেশা করে তা তিনি কখনই পছন্দ করতেন না। তাই সে কণ্ঠস্বরে উৎসাহের চেয়ে তিরস্কারই যেন বেশী প্রকাশ পেলে।

তবু সুকুমার বলে উঠলো, ওদের কি হচ্ছে একবার দেখে আসিগে মা। এখুনি ফিরে আসবো

ছেলের কণ্ঠে অনুরোধের চেয়ে অনুনয় ফুটে ওঠে বেশী।

না, তুমি চুপ ক'রে শুয়ে থাকো, তোমায় মড়া ছুঁতে যেতে হবে না এতরাত্রে।

কণ্ঠে ঈষৎ প্রতিবাদের সুর এনে সুকুমার বলে, কিন্তু মা এইসব আমাদেরই ত দেখা দরকার—মড়া নিয়ে যাবার লোকজন ঠিক করতে হবে। ওঁদের বাড়ীতে ত অন্য কোন পুরুষ-মানুষ নেই।

তা জানি। কিন্তু তার জন্য তুমি ছাড়াও আরো ঢের লোক ওঁদের আছে। তুমি এখন শুয়ে থাকো। তাছাড়া এই দুপুর রাত্রে মড়া নিয়ে যেতে যাবে কে ? সব তাতে তোমার বাড়াবাড়ি।

ধমক খেয়ে সুকুমার আবার তার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লো। কিন্তু শুয়ে কিছুতেই তার চোখে ঘুম এলো না। অনিলার সেই সদ্য বিধবার মূর্তিটা কল্পনা করতে গিয়ে বারবার তার চোখে জল এসে পড়তে লাগল।

মালতী ছিল ওই বাড়ীর পাঁচটা ভাড়াটের মধ্যে একমাত্র অল্পবয়সী বিধবা। সে তাই অনিলা এবং তার সমবয়সী অন্যান্য বৌদের একেবারে দু'চক্ষে দেখতে পারতো না। কলতলায়, ছাদে বা কারো ঘরে জটলা পাকিয়ে যখন তারা সকলে হাসিমস্করা করতো তখন সে আড়াল থেকে শুনে মনে মনে জলতো আর তাদের গালাগাল দিতে

দিতে চলে যেতো। তার মনে হতো তার স্বামী নেই বলে বুঝি তার মনে কষ্ট দেবার জন্যেই তারা সকলে নিজেদের স্বামীর গল্পে মুখর হয়ে ওঠে! এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী অনিলাকেই সে দূরপরিহার করে চলতো। কিন্তু যেমন অনিলার বুকফাটা কান্না তার কানে গিয়ে পৌঁছল অমনি সে ছুটতে ছুটতে একেবারে নীচে নেমে এলো। তারপর যেসব মেয়ে-পুরুষ ভিড় ক'রে অনিলার ঘরের সামনে দাঁড়িয়েছিল তাদের ঠেলে ভিতরে ঢুকে একেবারে অনিলার কাছে গিয়ে তার মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে সান্ত্বনা দিতে লাগল।

অনিমা মালতীকে জড়িয়ে ধরে ডুকরে কেঁদে উঠলো, মালতীদি গো, আমার আজ কি দেখতে এলে গো—

মালতী ছলছল কণ্ঠে বললে, ছি ভাই, ওকথা বলতে নেই। যাঁর জিনিস তিনি নিয়েছেন, তুমি-আমি কেঁদে কি করতে পারি বলো?

অনিলা এর উত্তরে কোন কথা না বলে শুধু আরো জোরে কেঁদে উঠলো।

আঁচল দিয়ে তার চোখের জল মুছিয়ে দিতে দিতে মালতী বললে, তুই তবু ত প্রাণভরে সেবা করলি, স্বামীকে ভোগ করলি এতদিন—কিন্তু আমার কথাটা একবার ভেবে দেখ দিকিনি! এমন সহানুভূতিভরা কণ্ঠে ইতিপূর্বে আর কোনদিন মালতী তার সঙ্গে কথা বলেনি!

তাই প্রথমটা তার মুখ থেকে একথা শুনে চমকে উঠলেও অনিলা আবার মালতীর বুকের মধ্যেই মুখটা গুঁজে যেন সান্ত্বনা খোঁজবার চেষ্টা করে। আজ একমাত্র সে-ই যেন তার ব্যথার ব্যথী!

আদমখোর

সিমেণ্টের পাহাড় চলে গেছে মাইলের পর মাইল।

এর একদিকে ঘন বন ও দুর্ভেদ্য জঙ্গল—সেখানে বাঘ, ভাল্লুক, হায়না নেকড়ে প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর বাস! আর এক দিকে ছোট ছোট কুঁড়ে ঘরে থাকে এক শ্রেণীর মানুষ—যারা অশিক্ষিত, যারা নির্বোধ, যারা কম খেয়ে বেশী পরিশ্রম করে, অথচ যারা তার প্রতিবাদ করতে জানে না! জীর্ণ-শীর্ণ চেহারা, বুকের পাঁজর গোনা যায় —ছোট্ট একটুকরো লেংটি পরনে, সারা দেহে তাদের আর কোথাও কোন বস্ত্রের চিহ্ন নেই; শীত গ্রীষ্ম বর্ষা সেই পাতায় ঘেরা কুঁড়েগুলির মধ্যে বন্য জন্তুর মত তারা জীবন যাপন করে! তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ যা কিছু নির্ভর করে সেই উঁচু চিম্‌নীওয়ালা কলটার ওপর! সিমেণ্টের কল!

ভোর ছ'টায় কলের বাঁশী বেজে উঠলেই তারা ছোটে পাহাড়ের খাদে। গাঁইতি হাতুড়ির খটাখট্ পটাপট্ শব্দে পাহাড়ের বুক কেঁপে ওঠে। তারপর ঝন্‌ঝন্ খন্‌খন্ রব। মাথায় ঝুড়ি নিয়ে মেয়েপুরুষ সব গাড়ী বোঝাই করে ভাঙ্গা পাথরের টুকরোয়।

দুপুরে মাত্র একঘণ্টা ছুটি! ক্ষুধার্ত পশুর মত ক্লান্ত দেহটাকে টানতে টানতে তারা সেই চালা ঘরগুলোর মধ্যে গিয়ে ঢোকে। তারপর আবার যে-ই কলের বাঁশী বেজে ওঠে, আবার তারা ছোটে যে যার কর্মস্থলে! ছড়িহাতে সর্দার শাস্তি দেয় কারো এক মিনিট লেট্ হলে। তাদের কেউ পায় দু আনা রোজ কেউ দশ পয়সা! চানা চিবিয়ে পচাই খেতেই সব শেষ হয়ে যায়—ভাত খাবার মত পয়সা আর তাদের হাতে থাকে না! অধিকাংশ দিনই কাটে এমনি করে। তবু তারা কাজ করে যায় নিঃশব্দে।

সিমেণ্টের কলের চাকা ঘোরে অবিশ্রান্ত ঘরঘর শব্দে। নিস্তব্ধ পাহাড় আর মূক শ্রমিকমণ্ডলী, তারই মাঝে একমাত্র ক্ষুধার্ত সেই যন্ত্রদানব যেন পেটের জ্বালায় দিবারাত্র হুঙ্কার ছাড়ে। যত খায় তত যেন তার পেট ভরে না। তার এই অনন্ত ক্ষুধার যারা যোগাড় দেয় তাদেরও যে ক্ষুধা আছে একথা কেউ ভেবে দেখে না, তাই তাদের ক্ষুধা এক একদিন অসহ্য হয়ে ওঠে! তারা তখন সর্দারের কাছে গিয়ে হাত পাতে, বলে রোজ দু'পয়সা বাড়িয়ে না দিলে খালিপেটে আর কাজ করতে পারবে না।

সর্দার মালিকের কানে সেই কথা তুলতেই তিনি একমুখ সিগ্রেটের ধোঁয়া ছেড়ে 'প্যাণ্টের' পকেটে একটা হাত ঢুকিয়ে দিতে দিতে বলেন, আরে বোকা, পেট ভরা

থাকলে কেউ কখনো খাটতে আসে—যতক্ষণ ক্ষিদে ততক্ষণ কাজ! এই বলে হো হো করে নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে ওঠেন!

সর্দার বিফলমনোরথ হ'য়ে ফিরে আসে।

মালিক থাকেন শহরে--গাড়ী ঘোড়া, মোটর, দাসদাসী, অট্টালিকা, সুখ-ঐশ্বর্যের মধ্যে। বড় দিনের সময় এক একবার আসেন শিকার করতে, তখন পাহাড়ের এখানে ওখানে তাঁবু পড়ে, মদ মুরগীর সঙ্গে বাঈজীর নাচ গান ও হৈ-হুল্লোড় চলে। তাদের সুখাদ্যের গন্ধে পাহাড়ী কুলিদের রসনা যেন হঠাৎ সরস হয়ে ওঠে! তারা চলতে চলতে থমকে দাঁড়িয়ে ফ্যালফ্যাল ক'রে একবার সেই দিকে তাকায়। আবার পা চালিয়ে দেয়—সেই গতানুগতিক কর্মজীবনের দিকে!

এবার তাদের হাত যেন আর চলতে চায় না, কিসের চিন্তা মনটাকে উদ্‌ভ্রান্ত ক'রে তোলে! হাতের গাঁইতি ফেলে দিয়ে তারা তখন দল পাকায়। চেঁচিয়ে ওঠে, যদি পেটভরে দু'টো খেতে না পেলুম তবে কিসের জন্য করবো এই মজুরী? এর চেয়ে আবার চাষ-আবাদ করতে যাবো! নিজের জমি যখন ছিল তখন ত খাবার অভাব হয় নি কোন দিন?

সর্দার ক্ষেপে ওঠে! ঠিকাদার ছুটে আসে যমদূতের মত! কাজের ক্ষতি হলে মনিবের কাছে কি কৈফিয়ৎ দেবে? কঠিন হস্তে তারা শাসন করে। কুলিরা এক এক বার মুমূর্ষু জন্তুর মত শেষ কামড় দেবার চেষ্টা করে! কোন শাসনেই তারা আর ভয় পায় না। জরিমানা, প্রহার, অপমান—সব অম্লান বদনে সহ্য করে। বলে, পেট না ভরলে আর কাজ করবো না।

কল বন্ধ থাকলে সরকারী কাজের ক্ষতি! তাই পুলিশকে খবর দিতে মালিকের এক মুহূর্ত বিলম্ব হয় না। লাল পাগড়ীর রুলের গুঁতোয় তারা কুকুরের মত লেজ গুটিয়ে আবার গাঁইতি হাতে তুলে নেয়। যাদের মনে অভিমান তখনো পর্যন্ত ছাই চাপা আগুনের মত থাকে তাদের ওপর সর্দারের সমস্ত রাগটা গিয়ে পড়ে। কোনরকমে তাদের জব্দ করতে না পেরে শেষে গুণ্ডা লাগিয়ে তাদের কন্যা ও স্ত্রীকে ধরে নিয়ে গিয়ে তাদের ইজ্জৎ নষ্ট করে। কুলিরা এ আঘাত সহ্য করতে পারে না—শেষে সর্দারের পায়ে লুটিয়ে পড়ে ক্ষমা চায়।

মানুষ এরা শুধু নামে, পশুরও অধম হ'য়ে এরা বেঁচে থাকে! একটা পৈশাচিক উল্লাসে সর্দারের মুখ চোখ বীভৎস হয়ে ওঠে!

মালিক শিকারী! বছরে মাত্র কয়েকদিনের জন্যে আসেন স্ফূর্তি করতে। কুলিরা ছোটে তাঁকে খুশি করবার জন্যে। তারা জঙ্গলে ঢুকে মাচা বাঁধে, ঝোপড়া

তৈরী করে দেয়, তারপর অন্ধকার রাত্রে কেনেস্তারা টিন পিটিয়ে হৈ চৈ করতে করতে সমস্ত জঙ্গলটা ঘিরে 'বিট্' করে। মালিক দু'হাতে বন্দুকটা উঁচিয়ে টঙে উঠে বসে থাকেন শিকারের লোভে। শিকার পড়লে তার সমস্ত সুনামটুকু তাঁর। তখন বিট্ করতে গিয়ে অন্ধকার জঙ্গলের মধ্যে যেসব হতভাগ্যের হাত কাঁটায় ছেঁড়ে, পা ভাঙে গর্তের মধ্যে পড়ে, সাপের হাতে জীবন যায়—তাদের কথা কেউ জানতেও পারে না। ওদের জীবনের মূল্য কি? বরং মনিবের কাজে এই ভাবে জীবন উৎসর্গ করতে পেরে তারা যেন ধন্য হয়!

আবার অনেকে আছে যারা যায় পেটের দায়ে—শিকারের হাড়টুকু, নাড়ীভুঁড়ি-গুলো, মাংসের ছিটে-ফোঁটা পাবার জন্যে তারা লুব্ধ হয়ে ওঠে। কতদিন ভাল মাংস খেতে পায়নি! কল্পনায় তাদের জিবে জল ভরে আসে।

একদিন দু'দিন করতে করতে হয়ত সাত দিন কেটে যায় কিন্তু তবুও কোন শিকার মেলে না। বাঘের ডাক কানে আসে, হায়নার চীৎকারে বনভূমি প্রকম্পিত হয়, কিন্তু সব বৃথা! কাঁচা শিকারী, বন্দুকের গুলি লক্ষ্য বিদ্ধ করতে পারে না!

অথচ জিদ বেড়ে যায় মালিকের। এতগুলো লোকের সামনে অপমান? শিকার করতে তিনি জানেন না? জঙ্গলের মধ্যে তিনি স্থান খুঁজে খুঁজে বেড়ান—কোনখান দিয়ে বাঘ আসে সরু নদীটায় জল খেতে। অড়হর ক্ষেতের পাশে কোথায় বড় বড় নালাপথ, বাঘের থাবার দাগ, তার মলমূত্রের গন্ধ কোন দিকে?

কয়েকটা জায়গায় মাটির উঁচুনীচু দাগ দেখে শিকারী চমকে ওঠে। অমনি সেখানে মাচান্ বাঁধা হয়, বন্দুক হাতে শিকারী বসে যায়।

ওদিকে চারি পাশ থেকে চীৎকার করে জঙ্গল 'বিট্' করতে করতে জানোয়ার-গুলোকে তাড়িয়ে আনে সেইদিকে কুলির দল। কিন্তু এবারও সব আবার বৃথা হয়। কোন শিকার মালিক করতে পারেন না—সারা রাত জেগে মশার কামড় খেয়ে ফিরে আসেন। মালিক ড্যাম্, রাস্কেল, বাগার বলে কুলিদের গালাগাল দেন। তাঁর বিশ্বাস তারা ভাল ক'রে 'বিট্' করে না, নিশ্চয় ফাঁকি দেয়, তাই জন্তু-জানোয়ারগুলো সব পালিয়ে যায় পিছন দিকে। সামনে আসে না।

হাত জোড় করে কুলিরা মনিবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। বলে, আর এমনটা হবে না। কিন্তু সমস্ত দিনের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর সেই শীর্ণদেহ অনাহারী লোক-গুলোর পক্ষে চীৎকার করতে করতে পাহাড়ের সেই অসমতল পথে অন্ধকারে বন-জঙ্গল ভেদ করে কতক্ষণ মনিবের কাজ ঠিকভাবে করা সম্ভব! তবু তারা দেহে যতক্ষণ সামর্থ্যে কুলোয় করে। শেষে বেঁকে দাঁড়ায়, বলে কিছু খেতে না দিলে আমরা

আর এ কাজ করতে পারব না।

মালিক বললেন, শিকার না পড়লে খেতে দিতে পারব না—যত ব্যাটা চোর, ফাঁকিবাজ! কেবল "দেহি দেহি"। আমি কি এতই বোকা এটুকু বুঝি না? তারপর কতকটা যেন আপন মনেই বলেন, পেটভরা থাকলে কেউ কখনও কাজ করতে চায়? হা-হা-হা-হা-হা আমি কি এতই বোকা যে এই সহজ সত্যটার কিছুই জানি না। বাবা, পীরের কাছে মামদোবাজী, ওসব আমার কাছে চলবে না—ছোটলোক-গুলোর আস্পর্ধা যেন দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে!

এমনি সব কথা চিন্তা করতে করতে শেষে তিনি স্থির করলেন, জঙ্গলের মধ্যে একটা ছাগল বেঁধে রেখে দূর থেকে বাঘের আগমন প্রতীক্ষা করে বসে থাকবেন। তারপর ছাগলের লোভে যেই বাঘ আসবে অমনি গুলি ছুঁড়বেন।

কিন্তু এই কাজটিই বা করে কে? সেই দুর্ভেদ্য জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে ছাগলটাকে একটা গাছে কে বেঁধে আসছে! অস্বীকার করলে অনেকেই! তাদের পেটে ভাত নেই, মনে শান্তি নেই। ওরি মধ্যে একজন চুপিচুপি মালিককে ডেকে বললে, আমি করবো। কিন্তু বকশিশ দিবি কত?

মালিক ভদ্দরলোক। তাঁর মুখে সেই এক কথা। আগে শিকার পড়ুক—তারপর বকশিশ।

লোকটা চলে যায় পারবো না বলে। বাঘের জঙ্গলে ছাগল সঙ্গে করে ঢোকা ভয়ানক বিপদ্‌জনক! যে কোন মুহূর্তে বাঘ আক্রমণ করতে পারে। মনিবের তাঁবুর ভালমন্দ খাদ্যের গন্ধে তখন তার পেটের মধ্যে যেন আগুন জ্বলে ওঠে দ্বিগুণ বিক্রমে। তাকে চলে যেতে দেখে মালিক আবার বললেন, বকশিশ ত পাবিই, তার সঙ্গে ভাল খাওয়া দেবো!

লোকটা একবার থমকে দাঁড়ায়, তারপর আবার চলতে সুরু করে। বলে, কে জান দিতে যাবে? পারবো না।

কতকগুলো উলঙ্গ স্ত্রী-পুরুষ তাঁবুটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে দাঁড়িয়েছিল। তার মধ্যে থেকে একজন ছুটে এসে মালিককে বললে, আমি যাবো বাবু! কিন্তু ভালো খাওয়া দিবি ত?

মালিকের চোখে একটা হিংস্র উল্লাস নৃত্য করে উঠেই সহসা নিভে গেল। বললেন, কত খাবি? পেট ভরে দেবো মাংস!

হি-হি-হি, ঠিক দিবি ত! যুগযুগান্তের অনাহারী রসনা যেন লালাসিক্ত হয়ে ওঠে!

সঙ্গে সঙ্গে পিছন থেকে একটি স্ত্রীলোক ছুটে এসে তার পায়ে কেঁদে পড়ে বলে, তা হবে না, আমি তোকে যেতে দেবো না কিছুতেই ওই যমের মুখে। স্ত্রীলোকটি তার স্ত্রী।

মরদটা বলে, এর চেয়ে মৃত্যু ঢের ভালো—এই রকম ক'রে তিলে তিলে আর না খেয়ে মরতে পারি না!

জেনানাটা তখন বললে, তার চেয়ে কলে 'ওভারটাইম' খাটিগে চল্, সর্দার ডাকতে এসেছিল, নতুন কনট্রাক্ট এসেছে, কাজ এখন জোর চলবে ক'মাস!

মরদটার মুখে একটু ম্লানহাসি ফুটে উঠলো। সে বললে, 'ওভারটাইম' খাটবো কেমন ক'রে পেট যদি না ভরে ত?

জেনানাটা বললে, রোজ আগাম দেবে বলেছে।

মরদটা বললে, সে আরো ভয়ানক, একগুণ যেমন দেবে তার দশগুণ আদায় করে নেবে, তা নাহলে কেউ কি আগাম দিতে চায়!

জেনানাটা তখন স্বামীকে এই বুঝিয়ে নিরস্ত করলে যে এত লোক যখন এইভাবে কাজ করছে তখন সেও তা করতে পারবে না কেন? মরদটা তখন কলে চলে গেল।

এ অঞ্চলে সবাই কলে কাজ করতো না—অনেকেই ছিল বেকার বসে। কলে কাজ না থাকলে তারা এমনি হয়ে পড়ে বেকার। আবার কাজ এলে তাদেব কাছে খবর আসে, তারা ছোটে সিমেন্টের খাদে পাথর ভাঙতে। 'ফুরোনের' কাজ কখন আসে কখন যায়, তার ঠিক-ঠিকানা নেই।

মালিক পড়লো মুস্কিলে। তাঁর শিকার বুঝি আজও নষ্ট হয়!

অগত্যা তিনি নিজেই বেরুলেন লোকের সন্ধানে।

একটি লোককে অনেক বুঝিয়ে শুনিয়ে ও প্রচুর খাওয়ার লোভ দেখিয়ে শেষে তিনি রাজী করালেন। কিন্তু হায়, সে লোকটি ছাগল নিয়ে সেই যে বনের মধ্যে ঢুকলো, আর তার কোন 'পাত্তা' পাওয়া গেল না। সবাই বললে, সে মরেছে বাঘের হাতে।

পরদিন দিবালোকে অনেক লোক তাকে তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে এলো জঙ্গলের চারিধারে, কিন্তু তার কোন সন্ধানই মিললো না।

শিকারী আবার লোকের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। কিছুদূর গিয়ে একটা পাহাড়ী ঝরণার ধারে দেখে একটা ছোকরা শুয়ে আছে আর তার মা পাতায় করে জল এনে ছেলেকে খাওয়াচ্ছে। শিকারী থমকে দাঁড়ালো, তারপর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে, কেয়া হায়, বেমার হায় কুছ?

যেন বারুদে অগ্নিসংযোগ হলো। ছেলেটার মা দপ্ করে জলে উঠে বললে, বেমার হবে আমার ছেলের কেন, বেমার হোক দুশমনের। বলে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে যা বললে, তার ভাবার্থ হচ্ছে এই যে তার ছেলে কাজ করতে গিয়েছিল সিমেণ্টের কলে, কিন্তু এমন চামার তার মনিব যে ছেলেটাকে 'ওভারটাইম' খাটিয়ে খাটিয়ে তার দেহের সব রক্তটুকু শুষে নিয়েছে। এই পর্যন্ত বলে একটু দম নিয়ে আবার স্ত্রীলোকটি শুরু করলে, তাই আমার ছেলেকে আমি বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি, আর কাজ করতে দেবো না ওখানে। মানুষ নয় ওরা, পশু—আদমখোর। এই রকম সুন্দর স্বাস্থ্য ছিল আমার ছেলের—বলতে বলতে তার চোখ ফেটে জল গড়িয়ে পড়লো।

সিমেণ্টের কলের মালিকের কাছেই যে সে একথা বলছে তা জানতো না, আর মনিবও নিজের পরিচয় তার কাছে ব্যক্ত না ক'রে চুপ করে রইলেন। তিনি শুধু সেই ছেলেটির কাছে নিজের কার্যোদ্ধার করার কথাটা একবার পাড়লেন, কিন্তু তাতে কোন ফল হলো না দেখে আবার স্থানান্তরে চলে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে একটা লোক জোগাড় হলো। চোদ্দ-পনেরো বছরের ছেলে, যেন কষ্টিপাথরের খোদাই করা মূর্তি, কিন্তু বহুদিনের অনাহারে জৌলুসহীন ও নিষ্প্রাণ। মা-বাবাকে না বলে লুকিয়ে সে বাড়ী থেকে পালিয়ে এসেছে। শুধু আছে তার সারা দেহ ভরা ক্ষুধা! কতদিন ভালমন্দ খায়নি যেন। ভাল খাবারের লোভে বড়-লোকের প্রসাদ পাবার আগ্রহে তাই পালিয়ে এসেছে।

শিকারী তাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেল চুপিচুপি। অন্ধকার রাত। পাহাড় অরণ্য সব নিস্তব্ধ। শুধু একটানা ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক সেই নিবিড় অন্ধকারকে যেন ভয়াবহ করে তুলছিল। মাচার উপরে উঠে বসে তিনি হুকুম করলেন, সেই ছাগলটাকে দূরে একটা গাছে বেঁধে দিয়ে আসতে।

ছেলেটি এতটুকু দ্বিধা না করে তখনি চললো ছাগলটাকে বুকে করে নিয়ে, তার-পর সেটাকে সেখানে বেঁধে রেখে আবার ফিরে এলো মাচায় সগর্বে।

ছাগলটা চেঁচাতে লাগল প্রাণভয়ে, আর মালিক মনের আনন্দে বন্দুক উদ্যত করে বসে রইলেন মাচায় উৎকর্ণ হয়ে।

রাত গভীর থেকে গভীরতর হতে থাকে, কিন্তু তবু বাঘের কোন সাড়া পাওয়া যায় না। মালিক মনে মনে বিরক্ত হন। নিরুৎসাহে তাঁর সর্বাঙ্গ যেন ঝিমিয়ে পড়ে।

এই ভাবে বসে থাকতে থাকতে এক সময় সহসা তাঁর চোখ দুটো জলে উঠলো।

একটা কথা তাঁর মনে পড়ে গেল—যে বাঘ একবার মানুষের রক্তের স্বাদ পায় সে অন্য কিছু মুখে ছোঁয় না—এ যে আদমখোর!

সঙ্গে সঙ্গে শিকারীর বক্ষের স্পন্দন দ্রুততর হয়। শিকারের নেশায় তাঁর শিরায় উপশিরায় যেন রক্ত উৎক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। আড়চোখে একবার সেই সাঁওতাল ছেলেটার দিকে চেয়ে মালিক তখন বলেন, এই যা ত শিগগির, ছাগলটাকে বেশ কঠিনভাবে সেই গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বেঁধে দিয়ে আয় ত?

সরল সাঁওতাল ছেলেটি আর দ্বিরুক্তি না করে তখনি মাচা থেকে লাফিয়ে পড়লো। তারপর ছুটলো সেই অন্ধকার জঙ্গলে—পথ হাতড়াতে হাতড়াতে ছাগলের চীৎকার লক্ষ্য করে।

কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। শুধু নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে মালিক দৃঢ়হস্তে তাঁর বন্দুকটি ধরে বসে রইলেন।

ছেলেটি যেই গাছটার কাছাকাছি গিয়েছে অমনি একটা বিরাট বাঘ হুঙ্কার দিয়ে লাফিয়ে পড়লো তার ঘাড়ের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে দ্যুম্-দ্যুম্-দ্যুম্ করে তিনটি শব্দ হলো। শিকারীর বন্দুকের অব্যর্থ গুলি গিয়ে লাগল সেই বাঘটার মাথায়। শিকারীর বক্ষ উল্লাসে নৃত্য করে উঠলো।

পরের দিন দূরদূরান্ত থেকে লোক এলো সেই মৃত বাঘটাকে দেখতে। এত বড় রয়েল বেঙ্গল এ অঞ্চলে বড় একটা দেখা যায় না।

সবাই ধন্য ধন্য করলে শিকারীকে।

এবার সিমেন্টের কলে উৎসব শুরু হলো। ভোজ খেতে এলো কুলিরা সব। তারাও পেট ভরে খেয়ে যাবার সময় মালিকের জয়গান করতে করতে বাসায় ফিরে গেল!

কলহ

আজ তিনদিন হলো স্বামী-স্ত্রীতে কথা নেই। ভাইঝি রেখার মারফৎ পুলিন তার যখন যা প্রয়োজন, আনিয়ে নেয়। হাফপ্যাণ্টের মধ্যে হাফশার্টের তলাটা গুঁজতে গুঁজতে সে চেঁচিয়ে ওঠে, এই রেখা, আমার আর একপাটি মোজা কোথায় শিগ্‌গির দিয়ে যা।

ভাঁড়ার ঘরের পাশে যে কাঠের আলনাটায় জামাকাপড় স্তূপীকৃত হয়ে থাকে রান্নাঘর থেকে ছুটতে ছুটতে গিয়ে তার মধ্যে থেকে একপাটি মোজা খুঁজে বার ক'রে মিনতি তখনি রেখার হাতে দেয়। কিন্তু তবু মিনতির কাছ থেকে কোন সাড়া-শব্দ আসে না।

খাবার সময়ও তাই। মিনতি ভাতের থালাটা ভাল ক'রে সাজিয়ে রেখাকে দিয়ে পাঠিয়ে দেয়। আবার রেখাই, কাকীমার ইঙ্গিতে মধ্যে মধ্যে এসে জিজ্ঞেস করে, আর একটু ডাল নেবে ছোটকাকা কিংবা ডিমের ডালনা? পুলিন কিন্তু এই সুযোগটার সদ্ব্যবহার করতে ছাড়ে না। অর্থাৎ এমন জোর 'না' বলে প্রতিবাদটা জানায় যাতে গৃহিণীর কানে কথাটা ছাপিয়ে তার অর্থ পৌঁছতে দেরি না হয়!

তবু মিনতির অভিমান কমে না। তেমনি নীরব থাকে সে।

কারখানার ছোট্ট কোয়ার্টার। তার মধ্যে চলাফেরা করতে গেলেও বুঝি একজনের সঙ্গে আর একজনের গায়ে গা ঠেকে যায়। তা সত্ত্বেও তারা দু'জনে দু'জনের মধ্যে একটা বিপুল ব্যবধান রচনা ক'রে চলে।

এ রকম দ্বন্দ্ব মধ্যে মধ্যে হয় আবার নিজেরাই যে কেমন ক'রে কখন মিটিয়ে নেয় তা রেখার বুদ্ধির অগোচর! বারো-তেরো বছরের মেয়ে রেখা, শুধু হঠাৎ এক দিন স্কুল থেকে ফিরে দেখে, কাকাবাবু কারখানার তেলকালিমাখা খাকি প্যাণ্ট পরে উঠানের চারপাইটায় বসে জুতোমোজা পরেই চুমুক দিচ্ছেন চায়ের পেয়ালায় আর কাকীমা তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে বলছেন, আর একখানা লুচি নাও, সেই ফিরতে কত রাত হবে, কত ক্ষিদে পাবে হয়ত!

বাঁ হাতটা উঁচু করে রিস্টওয়াচটা একবার দেখে নিয়ে পুলিন বলে ওঠে, না, তোমার জন্যে দেখছি লেট্ হয়ে যাবে আজও। এই জন্যে আমি বাড়ীতে খেতে আসতে চাই না!

কারখানায় চার ঘণ্টা 'ওভারটাইম' খাটলে একদিনের পুরো মাইনে দেয়। তাই

মধ্যে যে একঘণ্টা জলখাবার ছুটি, সাইকেল চালিয়ে তিন মাইল পথ আসে পুলিন টিফিন করবার জন্যে।

মিনতি হাত ধোওয়ার জন্যে এক মগ জল চৌপাইটার কাছে রেখে তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে গিয়ে পান সাজতে বসে। তারপর পানের ওপর আঙুল দিয়ে চুনটা ঘষতে ঘষতে বলে, রেখা দেখতো রে সাইকেলের আলোতে তেল আছে কিনা, একটু নারকেল তেল ঢেলে দেতো মা!

কিন্তু পান সাজা শেষ হবার আগেই সাইকেলটা নিয়ে পুলিন দরজা খুলে বাগানে এসে পড়ে। তারপর বাগানের জাল দেওয়া ফটকটার ভেতর দিয়ে একটা চাকা গলিয়ে রাস্তায় পড়তে না পড়তে মিনতি ছুটে এসে পিছন থেকে পানের ছোট কৌটোটা তার হাতে গুঁজে দিতে দিতে বলে, বাবা, আর এক মিনিট দেরি করলে চলতো না—সব তাতে যেন তোমার বাড়াবাড়ি।

গজ গজ করতে করতে পানের কৌটোটা হাতে নিয়ে এক সঙ্গে দু'টো পান মুখে ঠেসে পুলিন সাইকেলে উঠে বসে।

যতক্ষণ সাইকেলটা দেখা যায় সেদিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে মিনতি। তারপর ফটকটা তার দিয়ে বেঁধে আবার ভিতরে চলে আসে।

এইরকমটাই দেখতে অভ্যস্ত ছিল রেখা। কিন্তু সেদিন পুলিন এক কাণ্ড করে বসলো। যেমন পানের কৌটাটা তার হাতে দিলে মিনতি, অমনি পুলিন সেটা নিয়ে ছুঁড়ে বাগানের মধ্যে ফেলে দিয়ে বললে, আমি ত বলেছি পান আর ছোঁব না—তবে আবার ন্যাকামো ক'রে দিতে এসেছো যে!

মিনতি একটু নাকে কেঁদে বললে, আমি কি সত্যি সত্যি তোমায় পান ছাড়ার কথা বলেছি?

ধমক দিয়ে উঠলো পুলিন, আবার কি ক'রে বলবে? ভদ্রলোকেরা কি পান খায় যে দিতে এসেছো?

মিনতি এর কোন জবাব না দিয়ে শুধু স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এতে দুঃখের চেয়ে আনন্দই তার বেশী! বাস্তবিক। একদিন নয়, দুদিন নয় আজ ছ'বছর তার বিয়ে হয়েছে—আর এই দীর্ঘদিন ধরে ক্রমাগত পুলিনের সঙ্গে এই নিয়ে তার কলহও চলে আসছে। স্বামীকে ভদ্র করার জন্যে তার চেষ্টার অন্ত নেই। কারখানায় কাজ করে বলেই, যেদিন হপ্তা পাবে সেদিন মদ খেয়ে রাত্রে বাড়ী না এসে কোন বাউরী পল্লীতে গিয়ে হল্লা করবে সারারাত! কিংবা কতকগুলো মূর্খ মিস্ত্রীর সঙ্গে সবসময় আড্ডা দেবে সে কেন? পান খেয়ে, বিড়ি টানতে টানতে সে যখন

কারখানার মিস্ত্রীদের সঙ্গে রাস্তা দিয়ে চলে যায় তখন কার সাধ্য বলে যে পুলিন ভদ্রসন্তান, দু'টো পাশ করে অন্য কোথাও চাকরি না পেয়ে শেষে কারখানায় ঢুকেছিল।

সত্যি, পুলিনকে স্বামী বলে পরিচয় দিতে তার যেন মাথা কাটা যায়। বিয়ের পর থেকে তাই বাপের বাড়ী যাওয়া মিনতি একরকম ছেড়েই দিয়েছে—যদিও কখনো যায় ত দু' একদিনের জন্যে, যাতে পুলিনের জন্যে সেখানে তার মাথা না হেঁট হয়। সাঁওতাল পরগণায় এমন স্বাস্থ্যকর জায়গায় থাকে বলে—তার বোন ভগ্নীপতিরা কত আসতে চায়—কিন্তু মিনতি কিছুতেই রাজি হয় না। পাছে তার স্বামীকে দেখে সকলে মনে মনে ঘেন্না করে! সবাই জানে তার স্বামী ভাল রোজগার করে—মিনতি বেশ সুখে আছে। তাই কেঁদে কেটে, না খেয়ে ঝগড়াবিবাদ ক'রে পুলিনের সব বদ্ অভ্যাসগুলো একে একে মিনতি ছাড়াবার জন্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠেছিল। পুলিনকে সে কত বোঝাতো। পুলিনও যে না বুঝতো তা নয়—তার গা ছুঁয়ে দিব্যি ক'রে কতদিন বলেছে, মাইরি আর কোন্ শালার-ব্যাটা শালা মদ ছোঁয়—আর নন্দদার সঙ্গে কোনদিন মিশবো না!

কিন্তু মুখের কথা মুখেই থেকে যায়। হপ্তা পাবার দিন নন্দদা ডাক দিলে সে আর 'না' বলতে পারতো না। তার সঙ্গে চলে যেতো বাউরী পাড়ার দিকে।

মিনতি জানতো যে হাজার হোক পুলিন ভদ্রসন্তান—আর দু'টো পাশও করেছে—বিবেক বলে একটা বস্তু তার মধ্যে আছে ত। তাই ক্রমাগত পুলিনের মনে ঘা দিতে দিতে একদিন সে সত্যি সাফল্যলাভ করলে। পুলিন হপ্তার টাকা পুরো নিয়ে বাসায় ফিরে এলো এবং মিনতির হাতে দিলে। তারপর থেকে নিজের মনের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে একে একে পুলিন—মদ ছাড়লে, বাউড়ী পাড়া ছাড়লে, নন্দদার সঙ্গ ছাড়লে, আবার কিছুদিনের পর বিড়ি ছাড়লে এবং সবশেষে পান খাওয়ার যে নেশাটা ছিল তাও ছেড়ে দিলে।

ভদ্র, শিক্ষিত সন্তান পুলিনকে দেখে মিনতি এবার আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। এবার পুলিন সত্যিকারের ভদ্র হয়েছে। সব রকমের আড্ডা ত্যাগ করে এখন সে লাইব্রেরী থেকে বই এনে অফিসের পর রীতিমত পড়াশুনা করে। খবরের কাগজ কলকাতা থেকে আনাতে লাগল এবং লেখাপড়া রাজনীতি প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করবার জন্যে চাটুজ্জ্যে বাবুর ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা আরম্ভ করলে। ওখানকার মধ্যে বিদ্বান ও সচ্চরিত্র বলে চাটুজ্জ্যে বাবুর ছেলেদের নাম ছিল সবচেয়ে বেশী।

ক্রমশ এঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়তে থাকে পুলিনের। এখন তার বাসায় ছুটির

দিনে ও অফিসের পর অন্যান্য দিন সন্ধ্যায় তাদের আড্ডা বসে। সেখানে সাহিত্য, রাজনীতি, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি নানা বিষয়ে আলোচনা চলে।

গর্বে এবার মিনতির বুক দশহাত হয়ে ওঠে। বাপের বাড়ীর সকলকে সে এখন নিমন্ত্রণ করে এখানে আসবার জন্যে।

ভগ্নীপতিকে লেখে, আসুন না একবার, এখানকার পাহাড়ে কি রকম পলাশ ফুল ফুটেছে দেখে যান।

আবার দাদাকে লেখে, তোমার অফিসের যা খাটুনি, হপ্তাখানেকের ছুটি নিয়ে এখানে কাটিয়ে যাও না—এখন এখানে অল্প অল্প শীত পড়েছে—জলহাওয়াও খুব ভাল। তবে তোমার বিলিতী ছবি দেখার সিনেমা এখানে নেই তা আগেই বলে দিচ্ছি, হিন্দী! বিশেষ করে 'তলোয়ার কা ধনী' কি 'খুনী খঞ্জর'—এই সব ছবিই এখানে দেখানো হয় বেশী!

বছর তিনেক কাটবার পর হঠাৎ আবার মিনতি স্বামীর সঙ্গে কান্নাকাটি ও কলহ শুরু করে দিল। এবার ঝগড়ার বিষয়বস্তু কিন্তু সম্পূর্ণ পৃথক্—অভাব ও অনটন।

পুলিন নন্দদার দল ছেড়ে দিয়েছে—তাছাড়া ওভারটাইমও আর সে খাটে না। ওদিকে ঘুষ-ঘাষ, চুরি বা সাধু বাংলায় যাকে বলে 'উপরি' তাও সব বন্ধ। মোটকথা এখন পুলিনের কোন অসাধু কাজ করতে প্রবৃত্তি হয় না, ফলে টাকা পয়সার অভাব সংসারে।

মিনতি বলে, কেবল ঘরে বসে বসে কতকগুলো লোকের সঙ্গে বড় বড় আলোচনা করলে কি পেট ভরবে। ওদের আর বাড়ীতে আমি আসতে দেবো না। ওদের জন্যেই তুমি 'ওভারটাইম' খাটতে যাও না, আমি কি বুঝি না?

পুলিন বলে, আরে, খাটতে চাইলে দিচ্ছে কে আমায়?

মিনতি বলে, কেন যে আগে দিতো?

পুলিন একটু চুপ করে থেকে বলে, নন্দদার সঙ্গে ত আর এখন আমি মিশি না, সেই আমাদের ডিপার্টমেণ্টের 'ইনচার্জ' কিনা! ওই লোকটা বড্ড নেশাখোর।

মিনতি ও প্রসঙ্গটা আর উত্থাপন করে না। চেপে যায়। অন্যরকমে পুলিনকে উৎসাহিত করার চেষ্টা করে। কিন্তু তাতেও কিছু ফল হয় না। পুলিন শুধু হপ্তায়

হপ্তায় মাইনের টাকাটা এনে মিনতির হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়। দেশে পুলিনের মা, ভাই, বোনের খরচের টাকা পাঠিয়ে যা থাকে তা দিয়ে মিনতি সচ্ছলে সংসার চালাতে পারে না। অভাব, অনটন, দারিদ্র্য ক্রমশ বেড়ে যায়। সমাজের কাছে পদে পদে যেন তাকে লাঞ্ছনা সইতে হয়। আগের মত এখন আর প্রতিবেশীদের বিয়ে, অন্নপ্রাশন, জন্মদিন প্রভৃতিতে বড় বড় উপহার দিয়ে নাম কিনতে ত পারেই না, উল্টে লোকজনের সঙ্গে সমস্ত সামাজিক ব্যাপারে মেলামেশা পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছে।

এদিকে অভাবের কথা পুলিনের কাছে তুলতে গেলেই সে বলে, দেশের আরো দশজন ভদ্রলোক যে রকম দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করছে আমাদেরও করতে হবে সেইরকম।

কথাটা মিনতির সম্পূর্ণ মনঃপূত হয় না। দীর্ঘদিন ধরে পুলিন তার মাহিনার তিন-গুণ চারগুণ উপার্জন করেছে এবং সে ইচ্ছামত তাই খরচ করে ওখানকার সমাজে নিজের মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত করে এসেছে। তাই সে কিছুতেই এখন মেনে নিতে পারে না পুলিনের সে যুক্তি। বরং, ভদ্রতার যে সংজ্ঞাকে এতদিন সে মনে মনে আঁকড়ে ছিল তাকে পাল্টাতে থাকে।

এইভাবে নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে অবশেষে একদিন মিনতি মন স্থির করে ফেললে! হঠাৎ ওদের বাসার সামনে রাস্তা দিয়ে সাইকেল চেপে নন্দকে যেতে দেখে সে তাকে ডাকলে বাড়ীর মধ্যে।

নন্দ একটু অবাক্ হয়েই সাইকেল থেকে নামল।

বাড়ীর ভিতরে আসতে মিনতি তাকে আদর-আপ্যায়ন করে বসিয়ে চা খাওয়ালে। তারপর একটু ইতস্তত করে বললে, আচ্ছা, আজকাল ত আর আপনি এদিকে আসেন না—

নন্দ একটু কুণ্ঠিত হয়ে বললে, আসি না, মানে পুলিনভাই আজকাল যেন আমায় এড়িয়ে চলতে চায়—সেটা কি আমার অপরাধ বৌঠান, বলুন?

না না—আপনার অপরাধ কি! পাগল নাকি! উনিই যেন কেমন এক ধরনের হয়ে যাচ্ছেন। আপনার মত হিতৈষী ওঁর আর কে আছে! আমি কি জানি না ভেবেছেন!

তারপর একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, সত্যিই, একটু আমোদ-আহ্লাদ না করলে মানুষ বাঁচে কি করে, আর খাটাখাটুনিই বা করে কি ক'রে···তাই বলি ···আস্তে আস্তে বললে, আপনি যদি একটু ওঁকে জোর করে টেনে নিয়ে যান্।

নন্দ বললে, আমাকে সেরকম বেইমান ভাববেন না বৌঠান—জিজ্ঞেস করবেন ওঁকে বাড়ী এলে—এখনো প্রত্যেক হপ্তার দিন, কত সাধাসাধি করি—বলি চল্ একটু আমোদ-আহ্লাদ করবি—নইলে এই কারখানার হাড়ভাঙ্গা কাজ করবি কি করে!

আঁচল থেকে দু'খানা দশটাকার নোট বার ক'রে তার হাতে গুঁজে দিয়ে মিনতি বললে, আপনি জোর করে ওঁকে ধরে নিয়ে যাবেন! এই নিন এইটে নিয়ে আজ আপনারা আমোদ করুন গে। তবে একটা কথা আপনাকে কিন্তু প্রতিজ্ঞা করতে হবে, আমার সঙ্গে যে আপনার এইসব আলোচনা হয়েছে—এ যেন কোনক্রমেই আপনার মুখ থেকে কারও কাছে প্রকাশ না পায়।

পাগল হয়েছেন বৌঠান, নন্দ যদি এরকম নেমকহারাম্ হতো তাহ'লে তাকে সবাই এত ভালবাসত না। বলতে বলতে নোট দু'খানা হাফপ্যান্টের পকেটে পুরে সাইকেল নিয়ে তখনি সে রাস্তায় বেরিয়ে এলো।

চুড়ি

গয়না বলতে এখন কেবলমাত্র দুগাছা জুবিলী চুড়ি আছে সুলতার হাতে, আর যা কিছু ছিল, সবই একে একে ঘুচেছে স্বামীর অসুখে। শুধু এয়োতির চিহ্ন বলে নয়, স্বামীর কাছ থেকে পাওয়া প্রেমের একমাত্র নিদর্শন, তার এই দীর্ঘ বারো বছরের দাম্পত্য জীবনের ওই সম্বলটুকু তাই প্রাণে ধরে দিতে পারেনি, অনেক কষ্টে ঠেকিয়ে রেখেছিল। কিন্তু ছ'মাস ধরে যমে-মানুষে টানাটানি করার পর যেদিন ডাক্তার সুশীলের জীবনের আশা ছেড়ে দিয়ে চলে গেল সেদিন আর সুলতা স্থির থাকতে পারলে না। তরতর করে নীচে নেমে এসে ভাড়াটেদের ছেলে তপনকে বললে, ভাই তপু, এখনি আমার একটা উপকার করতে হবে।

তপন কলেজের পড়া পড়ছিল। তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, বলুন বৌদি কি করতে হবে!

সুলতার শুধু কণ্ঠ নয়, সারাদেহ তখন থরথর করে কাঁপছিল। কোনরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে বললে, এখনি একবার ছুটে গিয়ে নলিনী ডাক্তারকে ডেকে আনতে হবে ভাই!

তপন বিস্মিতকণ্ঠে প্রশ্ন করলে, নলিনী ডাক্তার! সে যে অনেক টাকা ফি বৌদি!

তা জানি! বলে তার সামনে হাত থেকে সেই জুবিলী চুড়ি জোড়াটা টেনে খুলতে খুলতে বললে, এ দুটো বিক্রী করলে হয়ে যাবে, এতে তিন ভরি সোনা আছে!

তপনের মা রান্নাঘর থেকে সে কথাটা শুনতে পেয়ে একেবারে হাঁ হাঁ ক'রে ছুটে এলেন। বললেন, ওকি বৌমা, এ কি করছো—আজ না একাদশী, তুমি এয়িস্ত্রী মানুষ, আজ কি হাত থেকে সোনা খুলতে আছে?

আর এয়িস্ত্রী জ্যাঠাইমা! বলে উদ্গত অশ্রু কোনরকমে সংবরণ করে নিয়ে বললে, তা কি জানি না?

তপনের মা সবই জানতেন। তবু তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে বললেন, ঘরে এত বড় রুগী তার একটা কল্যাণ-অকল্যাণ আছে ত মা? লোকে কথায় বলে, 'যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ!'

সেইজন্যেই ত এই দুটো বিক্রী করে ডাক্তার আনতে পাঠাচ্ছি জ্যাঠাইমা!

সস্নেহ তিরস্কার করে তিনি বললেন, কিন্তু আমি বেঁচে থাকতে অকল্যাণ কিছুতেই হতে দেবো না মা—তুমি ওপরে যাও সুশীলের কাছে বসোগে, আমি খোকাকে পাঠাচ্ছি ডাক্তার ডাকতে। টাকা যা লাগে আমি দেবোখ'ন! তা বলে মেয়েমানুষ হয়ে আজকের দিনে তুমি গা থেকে গয়না খুলে দেবে তা আমি কিছুতেই চোখে দেখতে পারবো না!

এবার ডুকরে কেঁদে উঠলো সুলতা! আমার কি সাধ জ্যাঠাইমা এটা বিক্রী করার, তুমি ত সবই জানো!

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস চেপে নিয়ে জ্যাঠাইমা বললেন, জানি বলেই ত নিষেধ করছি মা!

কিন্তু জ্যাঠাইমা ও-ই যদি না বাঁচে তবে কি কাজে আসবে এদুটো আমার?

ছিঃ মা, এমন অলুক্ষুণে কথা মুখে আনতে নেই! ওর দেওয়া এইটুকু সোনাই তোমার জীবনে চিরকাল অমূল্য হয়ে থাকবে! এ কি নষ্ট করতে আছে!

এবার ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে সুলতা! সে ভাল করেই জানে যে ওই দুটো জুবিলী চুড়ির চেয়ে আর কিছু বড় সম্পদ তার কাছে নেই! তার স্বামীর নিজ-হাতে-পরিয়ে-দেওয়া ওই চুড়ি দুটো তার গর্বের বস্তু—প্রেমের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন! সুলতার স্পষ্ট মনে আছে—পঞ্চম বৎসরের বিবাহের তারিখে সুশীল গভীর রাত্রে তার হাত দুটো নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে তাকে পরিয়ে দিয়ে চমক লাগিয়ে দিয়েছিল।

সুশীল যা উপার্জন করতো তা কলকাতার শহরে বাড়ীভাড়া দিয়ে, দেশে ভাই-বোনদের লেখাপড়ার খরচা পাঠিয়ে এবং নিজেদের পেয়েদেয়ে আর বিশেষ কিছুই বাঁচতো না। তবু প্রত্যেক বছর বিবাহের তারিখটা আসবার আগেই সুশীল ভাবতো এবার একটা কিছু অলঙ্কার সে উপহার দেবে সুলতাকে! কিন্তু প্রত্যেকবারেই কোথা থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে এমন সব অভাব এসে পড়তো ঠিক সেই সময়টাতে যে, তার মনের বাসনা মনেই লোপ পেতো!

এদিকে সুলতার বন্ধুবান্ধবরা তাকে নিয়ে প্রায়ই রঙ্গ করতো। বলতো, তুই তো দেখি বরের কথা বলতে গিয়ে গড়িয়ে পড়িস; কিন্তু সুশীলবাবুর তরফ থেকে ত তেমন কোন কিছুই দেখতে পাই না! তারপর চোখমুখ ঘুরিয়ে কেউ কেউ বলতো, হ্যাঁ প্রেম বটে মালতীদের, আজ দশ বছর বিয়ে হয়েছে কিন্তু প্রতি বছর বিয়ের তারিখে একটা ক'রে গয়না দেয় তার স্বামী তাকে!

সুলতার রাগ হতো এসব শুনে। সে মুখটা বেঁকিয়ে বলতো, বেশ ভাই, আমার স্বামী না হয় আমায় ভালবাসে না, হয়েছে ত? তারপর একটু থেমে আবার বলতো,

সোনা দিয়ে যে প্রেম কিনতে হয় আমাদের তেমন ভালবাসা নয়?

বন্ধুরা এবার খিলখিল ক'রে হেসে উঠতো। সে হাসিতে সোহাগের চেয়ে যেন বিদ্রূপই প্রকাশ পেতো বেশী। তবু বিজয়িনীর মত ঘরে, চলে আসতে আসতে স্থলতার মনটা কেমন যেন হয়ে যেতো। এক-একদিন এমনি চিন্তা তার মনে আসতো, সত্যি এতদিন বিয়ে হয়েছে, এর মধ্যে কি একটা কিছু ছোটখাটো গয়না তাকে দিতে পারতো না তার স্বামী। তার চেয়েও যারা কম উপার্জন করে, তারা কেমন ক'রে দেয় তাদের স্ত্রীকে? তার বাসার আসেপাশে, যেসব সমবয়সী বৌদের সঙ্গে তার আলাপ-পরিচয়, সব সময় মেলামেশা করে, তাদের সকলের স্বামীই ত দেয়! স্থলতা ভাবে, তবে কি তার স্বামীর ভালবাসাটা কেবল মৌখিক?

এমনি সব কত কি চিন্তা করতে করতে এক একদিন অনেক রাত পর্যন্ত স্থলতার চোখে ঘুম আসতো না। কিন্তু তবু মুখ ফুটে সে কোনদিন সেকথা স্বামীর কাছে বলতে পারেনি! পাছে সে তাকে ছোট ভাবে, পাছে তার মনে কোন ব্যথা লাগে! তাছাড়া যে উপহার চেয়ে নিতে হয়, বা যে উপহারের কথা যেচে মনে করিয়ে দিতে হয় তা পাওয়ার মধ্যে গৌরবের চেয়ে অগৌরবই বেশী! অন্তত স্থলতা কোনদিন তেমন উপহার চায় না!

তাই যেদিন স্থশীলের কাছ থেকে ওই তিন ভরি ওজনের জুবিলী চুড়িটা উপহার পেয়েছিল সেদিন সত্যি সত্যি আনন্দে সে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিল। তবু অনুযোগের স্থরে সে স্বামীকে বলেছিল, কেন তুমি এত টাকা মিছিমিছি নষ্ট করতে গেলে, একে তোমার অভাব-অনটন!

স্থশীল তাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে ধীরে ধীরে জবাব দিয়েছিল, তোমার ভালবাসার তুলনায় এ তো অতি তুচ্ছ লতা!

জুবিলী চুড়ি স্থলতা ভারি পছন্দ করতো। সেইজন্য পরের দিন স্বামীর দেওয়া ওই উপহারটা সে বন্ধুবান্ধব সকলকে দেখাতে ভোলেনি! সত্যি অমন স্থন্দর ভারী, ডায়মণ্ডকাটা ঝকঝকে চুড়ি দুটো দেখে সকলেই সেদিন প্রশংসায় মুখরিত হয়ে উঠেছিল! আর বলেছিল, হাঁ, একটা জিনিসের মত জিনিস দিয়েছে বটে স্থশীলবাবু!

স্বামীর দেওয়া সেই একমাত্র গর্বের নিদর্শন বিক্রী করার কথা চিন্তা করতে আজ স্থলতার বুকে ব্যথা বাজে বৈকি! তাই ডুকরে কেঁদে উঠলো স্থলতা অমন ক'রে।

জ্যাঠাইমা তার চোখের জল আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিতে দিতে বললেন, প্রাণভরে ত সেবা করেছো মা—আবার কাঁদছো কেন? তোমার মত ক'জন মেয়ে এমন ভাগ্যবতী! তারপর গলার স্বর একটু নামিয়ে বললেন, আমার এতখানি বয়স হয়েছে

কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসাও এমন কখনো দেখিনি, আর এমন ক'রে স্বামীর সেবা করতেও কাউকে শুনিনি। পাড়ায় সবাই ধন্যি ধন্যি করছে! ওঃ তুমি যা দেখালে মা! বলতে বলতে সহসা বুকফাটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আকাশের দিকে হাত তুলে চেঁচিয়ে উঠলেন, একজন সব দেখছেন এ, পুরস্কার নিশ্চয়ই পাবে মা!

তপন ডাক্তার নিয়ে এলো যথাসময়ে! কিন্তু ডাক্তার যাবার সময় গম্ভীরমুখে বলে গেলেন, একেবারে শেষ করে আমায় ডাকলে কি করতে পারি! আজকের রাতটা বোধহয় কাটবে না।

সত্যি তা-ই হলো। কাটলো না সে রাত। রাত এগারোটার সময় সুশীলের জীবনপ্রদীপ আস্তে আস্তে নিভে গেল।

ঘরের মেঝেয় পাগলের মত আছড়ে পড়ে কাঁদতে থাকে সুলতা। মর্মান্তিক সে দৃশ্য! চোখে দেখা যায় না! তবু তার পরিচিত সব মেয়েরা ছুটে এসে তাকে ভিড় করে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল! সে শুধু কান্না নয়। সে যেন সুলতার মর্মভেদী হাহাকার!

যারা দাঁড়িয়ে দেখছিল চোখের জলে তাদেরও আঁচলের প্রান্ত ভিজে উঠলো!

তপনের দিকে চোখ পড়তে এক সময় সুলতার কান্না যেন দ্বিগুণ বেড়ে গেল। তবু ফোঁপাতে ফোঁপাতে মুখ তুলে তাকে একবার সে বললে, বড় শৌখিন ছিল ও ভাই—নূতন খাট-বিছানা ও গদির ওপর ফুলের শয্যা পেতে শুইয়ে, ভালো জড়িপাড় কাপড় পরিয়ে, নাগরা জুতো পায়ে দিয়ে ওকে আমি নিজে হাতে সাজিয়ে দেবো, তারপর তোমরা আমার সামনে থেকে ওকে নিয়ে যেয়ো। আমার যেন মনে হয় ও কোথাও বেড়াতে যাচ্ছে! বলতে বলতে কান্নায় আবার ভেঙ্গে পড়লো সুলতা।

জ্যাঠাইমা বললেন, তাই হবে মা! তুমি একটু বুক বাঁধো, ধৈর্য ধরো, তোমার যেমন ইচ্ছা ঠিক তেমনি হবে—তুমি নিজে হাতে করে সাজিয়ে ওকে পাঠিয়ে দিয়ো।

এই দুটো এবারে নিয়ে যাও ভাই! বলে কাঁদতে কাঁদতে উঠে বসে এক সময় যেমন জুবিলি চুড়িটা হাত থেকে খুলতে গেল অমনি ফট্ করে ভেঙ্গে দু'খানা হয়ে গেল! শিউরে উঠলো সুলতা! এ কি! এ তো খাঁটি সোনার তৈরী নয়! কালো ব্রোঞ্জের ওপর পাতলা সোনার পাত মোড়া! চুড়িটা থেকে সোনার একটা পাত ঝুলছে, আর তার ভেতর থেকে কালো রঙের ব্রোঞ্জ বেরিয়ে পড়েছে!

হাত দিয়ে আর সেটা খুলতে পারলে না সুলতা! তিন ভরি ওজনের খাঁটি

সোনার জিনিস বলে যাকে সে বিশ্বাস করেছে এতদিন এবং সগর্বে ঘোষণা করে এসেছে সকলের কাছে তা কি তবে সব মিথ্যা? তবে কি তার স্বামী তাকে ফাঁকি দিয়েছে? তার সঙ্গে প্রতারণা করেছে? এই কথাটা সকলে জেনে যাবে এই মুহূর্তে! স্বলতার জীবনের এই চরমক্ষণে এ কি হলো? এ কি আবিষ্কার করলে সে! ঈশ্বর তাকে এ কি পরীক্ষায় ফেললেন!

স্বামীর মৃত্যু, কান্না, শোক, বৈধব্য সব ভুলে গিয়ে তখন স্বলতা শুধু ফ্যালফ্যাল ক'রে সেই ভাঙ্গা চুড়ির ভেতরের কালো ব্রোঞ্জটার দিকে তাকিয়ে রইলো—পাথরের মূর্তির মত নিশ্চল ও নির্বাক হয়ে!

কাল-রাত্রি না ওই কালো ব্রোঞ্জ ভরা সোনার নকল জুবিলী—কোন্‌টা বেশী সত্য তার কাছে, কে তাকে বলে দেবে আজ!

বে-সুরো

"দাদার বিয়েতে আনন্দোচ্ছ্বাস", এই নামে একখানা পদ্য লিখে ভাইবোনেরা গিয়ে প্রশান্তকে ঘিরে ধরলো। সে তখন দাড়ি কামাচ্ছিল। অফিসে বেরুবার সময় রোজই তাড়াতাড়ি হয় কিন্তু সেদিন বোধহয় তার হাতে বিস্তর সময় ছিল তাই বেশ ধীর ও মন্থরগতিতে মুখে যেন ক্ষুরের স্পর্শসুখ অনুভব করছিল।

সহসা হাতটা থামিয়ে তাদের দিকে না তাকিয়েই প্রশান্ত প্রশ্ন করেন, কিরে, কি চাই?

তারা সেই কাগজটা তার দিকে তুলে ধরে বললে, তোমার বিয়েতে আমরা এই পদ্যটা ছাপাবো, তোমায় বারোটা টাকা দিতে হবে দাদা!

যা-যা, ওসব বাজে-খরচা হবে না। বলে প্রশান্ত এক কথায় রায় দিয়ে দিলে। দাদাকে সবাই মনে মনে ভয় করতো তবু সর্বকনিষ্ঠ দু'টি আব্দারের সুরে বললে, বা-রে আমরা বুঝি পদ্য ছাপাবো না? আমরা যে বরযাত্রী গিয়ে সেখানকার লোক-দের একখানা করে দেবো!

প্রশান্ত এইবার ভাইবোনেদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে, ছিঃ, এখন কি এই সব বাজে-খরচ করবার সময়? দেখছো না কি দিনকাল পড়েছে, লোকে না খেতে পেয়ে রাস্তায় ঘাটে পড়ে মরছে—এখন কি এই সব টাকা নষ্ট করতে আছে?

সর্বকনিষ্ঠ ভাইটি একটা চোখে হাত ঘষতে ঘষতে অশ্রুভারাক্রান্তস্বরে বললে, তবে তুমি এখন বিয়ে করছো কেন? সেদিন রবির দাদার বিয়ে হলো, কেন তারা তবে তিন রকমের পদ্য ছাপিয়েছিল, এ্যাঁ—না দাদা—তোমায় টাকা দিতেই হবে, এ্যাঁ—

এইবার প্রশান্ত ধমক দিয়ে উঠল—বলছি না, যাও শিগগির এখান থেকে।

সঙ্গে সঙ্গে সুড় সুড় করে সবাই চলে গেল অপমানিতের মত। শুধু ছোট ভাইটি যেতে যেতে ক্ষীণকণ্ঠে এর প্রতিবাদ জানিয়ে বললে, আমি কিছুতেই বরযাত্রী যাবো না—দেখে নিয়ো এ্যাঁ—

গোপনে একটা দীর্ঘনিশ্বাস চেপে নিয়ে প্রশান্ত তখন দাড়িতে আর একবার সাবান ঘষতে লাগল।

পর পর তিনখানা ট্রাম চোখের সামনে দিয়ে চলে গেল, প্রশান্ত কিছুতেই উঠতে

পারলে না, ঝুলতে ঝুলতে লোক চলেছে যেন বাদুড়ের মত—হাতলটা পর্যন্ত ধরবার জায়গা নেই। বিরক্তিতে প্রশান্তর কপালের রেখা কুঞ্চিত হয়ে উঠল। মনে মনে সে বললে, ব্যাটারা সব মরতে এসেছে এখানে, আর জায়গা নেই যেন সারা পৃথিবীতে! রোজই লোক বাড়ছে সহরে—ডবলেরও ওপর হয়ে গেছে তবু বিরাম নেই। দুর্ভিক্ষ হাহাকার বাড়ছে যত, তত লোক ছুটে আসছে এখানে—আমাদের জ্বালাতে!

এমন সময় পেছন থেকে তাদের অফিসের গাঙ্গুলীমশায় তার কাঁধে একটা হাত রাখলেন। চমকে উঠে ঘাড় ফেরাতেই তিনি বলে উঠলেন, সাবাস, এই ত চাই—লেখা পড়া শেখা সত্যি তোমার-ই সার্থক হয়েছে! সব খবর পেয়েছি। তোমার মত পাত্র যে ও-রকম গরীবের ঘরের মেয়েকে শুধু শাঁখা-শাড়ি নিয়ে বিয়ে করতে রাজি হবে তা এদেশের লোক কোনদিন কল্পনাও করতে পারেনি। বলতে বলতে একটু থেমে আবার শুরু করলেন, অথচ বড়বাবুর ভায়রাভাই যে সাত হাজার টাকা তোমায় দিতে চেয়েছিল তাও ত আমি জানি! আর দিতে চাইবে না-ই বা কেন? তোমার মত এমন পাত্র ক'টা মেয়ের ভাগ্যে জোটে! এম-এ. পাশ, একশো পঁচিশ টাকা মাইনে, দেশে বাড়ীঘরও সামান্য যাহোক কিছু আছে। অথচ এই সেদিন আমার পাশের বাড়ীর ছোঁড়াটা—বি-এ. নাকি পাশ, দশ হাজার টাকা পেল বিয়েতে!

তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে প্রশান্ত বললে, টাকার বিনিময়ে কোন দিন নিজেকে মেয়ের বাপের কাছে বিক্রি করবো না—এ আমার ছেলেবেলা থেকে প্রতিজ্ঞা! মেয়ের বিয়ে দিচ্ছে বলে কন্যার পিতাকে ঋণ করে হোক, বাড়ী বাঁধা দিয়ে হোক—তেমন ক'রে পারো—পাত্রের পিতার দাবি মেটাতে হবে, আর তিনি সেই টাকা দিয়ে ছেলের বিয়েতে ইচ্ছামত আমোদ-আহ্লাদ করবেন! বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে উঠলো প্রশান্তর কণ্ঠস্বর। অসহ্য, এত বড় অবিচার কোনদিন কোন সমাজের যেমন সহ্য করা উচিত নয়—কোন সত্যিকারের শিক্ষিত লোকেরও তেমনি সমর্থন করা উচিত নয়। তাই এর প্রতিবাদ শুধু সভা ক'রে, কিংবা খবরের কাগজে প্রবন্ধ লিখে হবে না, কাজ ক'রে হাতে হাতে দেখিয়ে দিতে হবে। দেশের এই দুর্দিনে আমরা নিজেরা যদি নিজেদের শত্রু হয়ে উঠি তা'হলে দোষ দেব কার? কাজেই আমি যে এমন কিছু অসাধারণ কাজ করছি, এ তো বিশ্বাস করতে মন চায় না। বলে প্রশান্ত গাঙ্গুলীমশায়ের মুখের দিকে একবার তাকালো।

গাঙ্গুলীমশায় একটু মুচকি হেসে বললেন, তুমি ছেলেমানুষ তাই ও কথা বলছো ভাই. আমার এই ছাপান্ন বছর বয়স হলো, এর মধ্যে ঢের দেখলুম! মুখে লম্বা লম্বা

বাত আওড়ালে কত শিক্ষিত ছেলে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজের বিয়ের সময় লম্বা লম্বা ফর্দের ঠেলায় অন্ধকার! হাত-ঘড়ি দাও, গ্রামাফোন দাও, এত ভরি সোনা দাও, রূপোর দান-সামগ্রী দাও, ইয়ং কোম্পানী থেকে তিন জোড়া জুতো দাও, খাট দাও, টেবিল দাও, চেয়ার দাও, ইত্যাদি ইত্যাদি—আরো কত বলবো! অর্থাৎ নগদ টাকাটা নাম করে না নিয়ে জিনিসে পুষিয়ে নেওয়া, তা'তে বরং মেয়ের বাপের আরো বেশী খরচ পড়ে যায়। কিন্তু তোমার মত এমন দরিদ্র-ঘর থেকে মেয়ে আনতে এখনো কাউকে দেখিনি! শাঁখা-শাড়ি, তাও দেবার অবস্থা বোধহয় তাদের নেই, আমি ত ওদের সকলকে চিনি। এই বলে একটু চুপ করে থেকে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তিনি পুনরায় বললেন, অথচ একদিন ওদের অবস্থা কি ভাল-ই না ছিল!

সামনে একখানা ট্রাম এসে পড়তেই তারা দু'জনে ছুটে গিয়ে তাতে উঠে পড়লো এবং কোন রকমে ভিড়ের মধ্যে ঝুলে রইল।

স্কুল থেকে ফিরে এসে ছেলেমেয়েগুলি আবার মায়ের কাছে আব্দার ধরলে, মা, আমরা একটা সানাই বসাবো।

মা বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে বলে উঠলেন, দেখ্ জ্বালাতন করিস নি বলছি, ওসব বাজে খরচা করার সময় নয় এখন।

ছোট ছেলেটি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, আমরা যা বলি সবই বুঝি বাজে খরচ? তাহলে অন্যলোকেরা বিয়েতে বাজনা করে কেন?

এবার মায়ের কণ্ঠস্বর আর্দ্র হয়ে আসে। তিনি বলেন, তারা যে বড়লোক বাবা, তাদের অনেক টাকা আছে, তাই তারা যা করে কোনটাই বাজে খরচ বলে মনে হয় না।

ছোট ছেলেটি তৎক্ষণাৎ উত্তর দেয়, আমাদের সঙ্গে যে রবীন পড়ে তারা ত কি রকম গরীব—তবে তার দাদার বিয়েতে সানাই এনেছিল কেন?

ছেলেমানুষ হলেও এটুকু বুঝতে তাদের দেরি হলো না যে টাকার জন্য অন্যকে পীড়ন করাটা অন্যায়। তাই মা যখন বুঝিয়ে দিলেন যে রবীনের দাদা টাকা নিয়ে বিয়ে করেছে, আর তাদের দাদা বিনা পণে বিয়ে করছে তখন তারা চুপ করে গেল এবং দাদার প্রতি মনে মনে তাদের শ্রদ্ধাও আরো বাড়লো!

মায়েরও মনে কত কল্পনা ছিল। বড় ছেলের বিয়ে, কত জাঁকজমকের সঙ্গে হবে। লোকজন, আলো, বাজনাবাদ্যি, গাড়ী-ঘোড়া, হৈ-চৈ—এমনি কত কি তিনি

স্বপ্ন দেখতেন! তবু তাঁর সেই আশা যখন বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও উপার্জনক্ষম ছেলের দ্বারা এইভাবে ব্যর্থ হলো, তখন তিনি একটুও অভিমান প্রকাশ করলেন না। ছেলে যদি এতে সুখী হয় ত তাঁর অমত করার কি কারণ থাকতে পারে! বরং তিনি মনে মনে এই ভেবে গর্ব-অনুভব করলেন যে, যে-ছেলে এমন একটা উচ্চ আদর্শ স্থাপন ক'রে দেশের ও দশের শ্রদ্ধাভাজন হতে যাচ্ছে, তিনি তারই মা।

প্রশান্তর মনেও এর জন্যে বেশ একটা গর্ব জাগে। আফিসের লোকেরা যখন তার দিকে শ্রদ্ধাপূর্ণ নয়নে তাকায় তখন মনে হয়, টাকা পয়সা নিয়ে সবাই ত বিয়ে করে কিন্তু তার মত এমন স্বার্থত্যাগ করতে কে পেরেছে? দশহাজার টাকা, কত ধনীর কন্যা, কত প্রলোভন সে জয় করেছে!

এদিকে দিন যত এগিয়ে আসে, ব্যয়-সঙ্কোচ করতে গিয়ে তত 'এটা বাজেখরচা —না হলেও চলে' 'ওটা নেহাতি বাড়াবাড়ি' ইত্যাদি মাতাপুত্রে আলোচনা করতে করতে একসময় দু'জনেই কেমন যেন গম্ভীর হয়ে ওঠে। শেষে মনের দৌর্বল্য জয় করবার জন্য প্রশান্ত বলে, সাহেবদের কেমন সুন্দর নিয়ম দেখো দিকিনি···চার্চে গেল, দু'জনে দু'টো আংটি পরলে, ব্যস্ বিয়ে হয়ে গেল। তারপর বন্ধুবান্ধব দু'চার জনকে নিয়ে কোন হোটেলে গিয়ে কিছু খাওয়া-দাওয়া! আর আমাদের দেশের লোকদের যার যত সাধ-আহ্লাদ সব এই বিয়ের সময় মেটায়! আরে তখন এক সময় ছিল আর এখন এক হয়েছে! এখন যেমন অবস্থা সেইরকম ব্যবস্থা কর! এককালে যখন অভাব বলতে কারুর কিছু ছিল না তখন যে সব নিয়ম হয়েছিল, এখন যখন প্রতিপদেই অনটন দারিদ্র্য, তখনো সেই সব মেনে চলতে হবে? অদ্ভুত জাত এই বাঙ্গালী!

মা এতে আপত্তি জানিয়ে বলেন, আগেকার মত কোনটা এখন আছে বাছা! আমাদের ছেলেবেলায় দেখেছি পাড়ায় কারও বিয়ে হলে অন্ততঃ সাতদিন যেমন তেমন করে নেমন্তন্ন চলতো! আর এখন সে-জায়গায় পাড়া ত দূরের কথা, আপনার আত্মীয়-স্বজনদেরও লোকে একবেলা নেমন্তন্ন করতে পারে না।

প্রশান্ত একটু বাঁকা হাসি হেসে বলে, এখনো যা আছে তার ঠেলায় লোকের ভিটে-মাটি উচ্ছন্নয় যাচ্ছে যে মা! কবে এটাও উঠবে বলতে পারো?

মা বললেন, তোদের মত ছেলে যখন ঘরে ঘরে জন্মাবে, তখনই উঠবে।

প্রশান্ত এইবার একটু হেসে ফেলে। বলে, আচ্ছা মা, সত্যি ক'রে বলো দেখি, তোমার ছেলে এইরকম একটা গরীবের মেয়েকে বিয়ে করছে বলে তোমার মনে দুঃখ হয়েছে কিনা?

যাঃ। কি যে বলিস্ খোকা, বলতে বলতে মা উঠে অন্যত্র কাজে চলে গেলেন।

মায়ের মনের কোণে কোথায় যেন একটা হতাশার সুর বাজে, সেটা প্রশান্তর চোখে ধরা পড়ে যায়। সে মনে মনে হাসে, আর মাকে ডেকে বলে, মাগো, তোমরা যদি একটু ত্যাগ স্বীকার করো তাহ'লেই দেশ থেকে এই কুপ্রথাটা উঠে যায়। ছেলেদের চেয়ে তাদের মায়েরাই যে আমাদের দেশে ভয়ঙ্কর!

এইবারে তিনি রেগে উঠলেন। বললেন, কেন আমি কি এমন ভয়ঙ্কর?

প্রশান্ত হেসে বললে, আহা-হা তুমি হতে যাবে কেন—অন্য যে সব ছেলের মা আছে তাদের কথা বলছি। তাঁরা একটু বাজে-খরচার হাত কমালে দেশে কন্যাদায়টা খুব সহজ হয়ে যায়।

এর চেয়ে আরো কি সহজ চাস্ খোকা? বলে তিনি মনের মধ্যে যেন কোথায় একটা ক্রোধ দমন করে নিলেন। তারপর ছেলের মুখের দিকে চোখ তুলে বললেন, আত্মীয়-স্বজন দূরের কথা, নিজের বোনটাকে পর্যন্ত আনতে পারলুম না, কুড়ি-পঁচিশ টাকা গাড়ী ভাড়া লাগবে বলে। তোর বিয়েতে কত আনন্দ করবে—তার কত দিনের সখ!

প্রশান্ত এর ওপর আর কোন কথা বলতে পারে না। সহসা যেন স্তব্ধ হয়ে যায়।

এমন সময় এলো অনিল···প্রশান্তর বন্ধু। বাড়ীর মধ্যে পা দিয়েই সে ডেকে উঠলো, 'মাসীমা মাসীমা' বলে। প্রশান্তের মার কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে সে আর একপর্দা গলা চড়িয়ে দিয়ে বললে, কি গো মাসীমা, বিয়ে বাড়ীতে হৈ-চৈ কৈ! তুমি কোথায় গেলে?

এইবার তিনি বেরিয়ে এলেন এবং ক্লান্ত ও উদাসকণ্ঠে বললেন, হৈ-চৈ ত তোরা করবি বাবা—

পরম উৎসাহে সে তখন চেঁচিয়ে উঠলো—আমি কোমর বেঁধে প্রস্তুত, হুকুম করো কি করতে হবে মাসীমা!

মুহূর্তে তাঁর মুখটা যেন ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস গোপন করলেন! এ বিয়েতে কি কাজই বা তিনি তাকে দেবেন? দীনতম আয়োজন, সংক্ষিপ্ততম উপচার—তাও পুরোহিতের সঙ্গে রফা হয়েছে সামান্য মূল্যের বিনিময়ে! এছাড়া লোকজন খাওয়ানোর হাঙ্গামা নেই—কোন ধূমধাম নেই তবে কি কাজ করতে দেবেন অনিলকে? তাই একটু চুপ করে থেকে তিনি

বললেন, আমি ত কোন আত্মীয়স্বজনকে বলতে পারবো না বাবা—তুই ত জানিস্ সবই—

—বেশ করেছো মাসীমা! কাউকে বলো না—তোমার মত মা যেদিন আমাদের দেশের ঘরে ঘরে জন্মাবে সেদিন হবে সত্যি সত্যি দেশের মুক্তি! বলতে বলতে আপন মনে যেন সে গর্জন ক'রে উঠলো, এক মুঠো ভাতের জন্যে লক্ষ লক্ষ লোক পথে-ঘাটে কুকুর বেড়ালের মত মরছে, সমস্ত জাতটা উলঙ্গ হয়ে রয়েছে কাপড়ের অভাবে, দুর্নীতি ও দুঃশাসনের ফলে সমাজের গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত পঙ্কিল হয়ে উঠেছে, তবুও আমাদের চৈতন্য হয় না! এখনো মেয়ের বাপকে পীড়ন ক'রে টাকা নিয়ে ধূমধাম হচ্ছে! ছিঃ লজ্জাও করে না মানুষের! মেয়ের বিয়ে ত নয়, যেন ভাগাড়ে শকুনি পড়ে।

এমনিভাবে অন্যের কাছ থেকে উৎসাহ পেয়ে মুহূর্তে যেন বাড়ীর আবহাওয়া বদলে যায়। শুধু প্রশান্তর মার নয়, প্রশান্তরও মুখে চোখে নতুন উৎসাহ দেখা দেয়।

যত দিন নিকটে ঘনিয়ে আসে তত যেন মা ও ছেলের মনে কেমন একটা গাম্ভীর্যের মেঘ ধীরে ধীরে জমে উঠতে থাকে। দু'জনেই যেন অন্তরের গভীরতম প্রদেশে কিসের একটা শূন্যতা বোধ করে! বিবাহের সূচনায় যে আনন্দের অভিব্যক্তি তাদের মুখে চোখে প্রকাশ পেয়েছিল তা যেন ক্রমশ ম্লান হয়ে আসে। অবশ্য প্রশান্তর মনটা অফিসে গেলে খানিকটা সতেজ হয়ে উঠতো, যখন অন্যান্য কন্যাদায়-গ্রস্ত পিতারা তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে বলতেন, কবে তোমার মত পাত্র আমাদের বাংলাদেশের ঘরে ঘরে হবে?

তবুও কিন্তু প্রশান্তর মার মনের অবস্থা বর্ণনা করা যায় না। বাস্তবিক দুঃখ হয়! তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রশান্ত···একটার পর একটা যত পাস করেছে তত তিনি স্বপ্ন দেখেছেন! পাড়া প্রতিবেশী আত্মীয়স্বজন যার ছেলের যখনই বিয়ে হয়েছে তখনই তাঁর মনে হয়েছে তাদের সকলের চেয়ে বেশী ঘটা ধুমধাম করে তিনি এমন বৌ আনবেন যে লোকে উঁচু গলায় বলবে, হ্যাঁ, একটা বিয়ের মত বিয়ে হলো বটে! তাই তাঁর এতদিনের আশায় যখন ছাই পড়লো তখন তিনি মুখে কিছু প্রকাশ না করলেও মন থেকে তার বেদনা কিছুতেই মুছে ফেলতে পারলেন না। বিশেষ ক'রে ছেলের বিয়ের সংবাদ পেয়ে যখন পাড়া-প্রতিবেশিনীরা এসে তাঁকে বলতো,

'হ্যাগা শান্তর মা, তা মোট কত হাজার টাকা দেবে থোবে তোমার ছেলেকে' তখন যেন তাঁর বেদনা দ্বিগুণ বেড়ে যেতো। তবু বুকের মধ্যে সে যন্ত্রণা চেপে রেখে তিনি মুখে হাসি টেনে এনে বলতেন, আমার ছেলেকে ত আমি বিক্রি করতে বসিনি ভাই, বরং ঘর থেকে খরচ ক'রে বৌকে নিয়ে আসছি।

তখন কেউ কথাটা সোজাসুজি অবিশ্বাস করে কেউ বা মুখে সহানুভূতি দেখিয়ে বলে, একটা কাজের মত কাজ করলে ভাই, পুণ্যি হবে। আজকালকার দিনে ক'টা মানুষ টাকার লোভ সামলাতে পারে!

সঙ্গে সঙ্গে প্রশান্তর মার মুখ চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে বিজয়-গর্বে! আবার তারা চলে গেলে তিনি যেন ম্রিয়মান হয়ে পড়েন।

ছোট ছেলেমেয়েগুলিও যেন কেমন ভগ্নোদ্যম! দাদার বিয়ে উপলক্ষে তারা ভাইবোনে মিলে যেখানে সেখানে একত্রিত হয়ে যখন তখন যা-তা জল্পনা করে বটে কিন্তু তবু যেন কোথায় তাদের একটা ব্যথা রয়ে যায়!

প্রশান্ত সমস্তই অনুভব করে কিন্তু সর্বদা সে মনকে দৃঢ় করে রাখে এই ভেবে যে সমস্ত শিক্ষিত সমাজের মুখের ওপর তাকে আজ আদর্শ স্থাপন করতে হবে! পণপ্রথা শিক্ষিত সমাজ থেকে ওঠাতেই হবে!

কিন্তু বিয়ের আগের দিন সন্ধ্যার পর এক হাতে বাজারের থলি ও আর এক হাতে একটা কাগজ-মোড়া টোপর নিয়ে যখন প্রশান্ত বাড়ীর উঠানে পা দিলে তখন সহসা তার বুকের মধ্যেটা যেন কেমন করে উঠলো! প্রতিদিনের মত সেদিনও ঘরে ঘরে 'ব্ল্যাক-আউটের' সেই ঘেরাটোপ দেওয়া মিটমিটে আলো জ্বলছে—সেই ভাই বোন মা অন্যদিন যেমন ছিল আজো তেমনি—মামামামী পিসী খুড়ী জ্যাঠা জ্যাঠাই তাঁরা কেউ আসেননি···তাঁদের কেউ কেউ হয়ত আসবেন কাল, কেউ বা আসবেন না! কোথাও কোন কোলাহল নেই—কোন নবাগত আত্মীয়-স্বজনের মুখ নেই। নতুন নতুন শাড়ী ছাদে, উঠানে, দেওয়ালে শুকোয় না, নতুন ভাষায় নতুন কণ্ঠের রসিকতা কানে আসে না—সব যেন সেই পুরাতন, সেই প্রতিদিনের একঘেয়েমি! সমস্ত বাড়ীটায় একবার নিরবে চোখ বুলিয়ে নিয়ে প্রশান্ত ভাবলে তবে কিসের বিয়ে? যদি মনে তার নতুন সুর, নতুন আমেজ না এনে দেয় তবে এ বিবাহের অর্থ কি?

সঙ্গে সঙ্গে একটা দীর্ঘঃনিশ্বাস গোপনে তার সমস্ত বুকটাকে যেন নিষ্পেষিত করে দিয়ে যায়।

মিনিটখানেক এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে সে সেই ঘরে গিয়ে ঢুকলো। প্রকাণ্ড ঘরটার এককোণে তার মা বসে বসে একটা পিঁড়িতে আলপনা দিচ্ছিলেন।

তাঁর কাছে গিয়ে প্রশান্ত একবার দাঁড়ালো কিন্তু একেবারেই ভাল লাগল না। তারপর এঘর ওঘর—সব ঘরে উদ্দেশ্যহীনভাবে খানিকটা ঘুরে এলো ; কোথাও যেন সান্ত্বনা পেলে না! বহুদিন পূর্বে যখন তার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর বিবাহ হয়েছিল, তখনকার কত কথা মনে পড়তে লাগল। বিয়ের আগের দিনে এমনি সময় ঘরে ঘরে কত কলহাস্য, কত ঠাকুমা দিদিমা, পিসতুতো মামাতো ভাইবোনদের রস-রসিকতা, খাওয়া-দাওয়ার জিনিসপত্রে ঘরদোর থৈ থৈ—কাজে অকাজে রাত শেষ হয়ে যেতো—কারও চোখে আর ঘুম আসতে চাইতো না!

প্রশান্তর মনে যেন রং লাগে না! তবু সে জোর ক'রে মনে সুর আনতে চেষ্টা করে কিন্তু বার বার কে যেন তা কেটে দেয়। পাছে মায়ের চোখে সেটা ধরা পড়ে তাই কোন কাজের অছিলায় বাড়ী থেকে বেরিয়ে গিয়ে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচে!

বিয়ের দিনও সকাল থেকে প্রশান্তর মন যেন কেমন শূন্যতা বোধ করে। যে দিকে চায় দেখে অভাব! মনটা কেমন বিষণ্ণতায় ভরে যায়! নান্দীমুখের মন্ত্র পড়াতে পড়াতে পুরোহিত হঠাৎ থেমে কাপড়ের বদলে গামছা ও থালাবাসন প্রভৃতি অপরাপর উপকরণের জন্য ভাড়া বাবদ যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চন-মূল্য ধরে নিলেন। খুড়ী-জ্যাঠাইরা এসে বললেন, বাবা, তোমায় আইবুড়ো ভাতের কাপড় দিতে পারলুম না বলে কিছু মনে করো না। সঙ্গে সঙ্গে কেউ চারটে টাকা, কেউ বা দুটো তার হাতে গুঁজে দিলেন। আবার যৌতুক দেবার ভয়ে কোন কোন খুড়তুতো জ্যেঠতুতো বোনেরা আসেনি, ছেলেমেয়ের অসুখের দোহাই দিয়ে।

পাড়াপ্রতিবেশীরা যারা সদাসর্বদা তাদের বাড়ীতে আসা যাওয়া করতো, তারাও অনুপস্থিত। কেউ কেবল বর বেরুবার সময় একবার বাড়ীতে এসেই চলে গেল, কেউ বা দোতলার ঘরের জানালার ধারে দাঁড়িয়ে দেখলে। শুধু বিয়ে দেখার নিমন্ত্রণ করাতে কেউ কেউ মনে মনে ক্ষুণ্ণ হয়েছেন। আবার খাবার নিমন্ত্রণ করা হয়নি বলেও অনেকে অভিমান করে আসেনি।

বরযাত্রীদের বেলাও তাই। বেছে বেছে প্রশান্তর বিশেষ অন্তরঙ্গ সাতজনকে মাত্র বলা হয়েছিল। বাকী আরো উনিশজনকে সে খোলাখুলিভাবে বলেই দিয়েছিল, গরীবের মেয়ে বিয়ে করছি, বরযাত্রী কাউকে বলতে পারলুম না ভাই—তোরা কিছু মনে করিস্‌নি।

বন্ধুরা সব শিক্ষিত—তার মুখ থেকে এই কথা শুনে বরং খুশীই হয়েছিল।

কিন্তু বিয়ে করতে গিয়ে বরযাত্রী-বন্ধুদের সকলকে না দেখে তার মনটা সহসা যেন দমে গেল! স্ত্রী-আচার, ছাঁদনাতলা, বন্ধুদের সমবেত উৎসাহের অভাবে যেন জম্‌লো না।

তারপর বাসরঘরে ঢুকে প্রশান্ত একেবারে নিরুৎসাহে ভেঙে পড়লো! এই কি সেই বাসরঘর—যার সম্বন্ধে চিরকাল তার মনে ছিল কত রঙিন স্বপ্ন, কত বিচিত্র কল্পনা? সেই নববধূ আছে, সেই বাসরঘরও আছে, কিন্তু কোথায় সেই নববধূর রঙ্গিনী-সঙ্গিনীর দল? যাদের হাস্যে লাস্যে, চটুলতায়, সঙ্গীতে, বিবাহের আনন্দ পূর্ণ হয়ে ওঠে কানায় কানায়! ওরাও গরীব, আত্মীয়স্বজন কাউকে নিমন্ত্রণ করে আনতে পারেনি! অগত্যা প্রশান্তকে বাসবটা ঘুমিয়ে কাটাতে হলো।

পরদিন নববধূকে নিয়ে নিজের বাড়ীতে ফিরেও প্রশান্তর মনটা ভারি খাবাপ লাগল। লোক কই? প্রতিবেশিনীরা পর্য্যন্ত সকলে আসেনি, কেউ জানলা দিয়ে, কেউ বা বারান্দায় দাঁড়িয়ে শুধু নতুন বৌকে দেখে তাদের কৌতূহল নিবারণ করলে। সেই মা, খুড়ী, জ্যাঠাই ছাড়া আর বরণ করবার নতুন কোন লোক নেই!

প্রশান্তর মনে পড়লো এই বাড়ী থেকে একদিন যখন তার জেঠতুতো ভাইয়েব বিয়ে হয়েছিল তখন নতুন বৌ নিয়ে এসে বাড়ীর উঠানে পা দেবার জায়গা ছিল না। আত্মীয়স্বজন যে যেখানে আছে তাদের ভিড়, তাব ওপর প্রতিবেশিনীর দল—বালিকা যুবতী বৃদ্ধা নির্বিশেষে সেদিন সবাই নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিল। এইবার প্রশান্ত একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে অন্যকথা চিন্তা করবার চেষ্টা করে। কিন্তু তাব মন মানে না। বিয়ের সুর যেন কোথায় কেটে যায়! তৎক্ষণাৎ সে মনকে উঁচুতে টেনে তোলবার জন্যে আবার অফিসের বাবুদের কথা স্মরণ করে, অনিলের কথা স্মরণ করে।

কিন্তু তবু তার মন যেন বুঝতে চায় না! কিছুতেই যেন বিয়ের রং লাগে না প্রাণে। তার মনে পড়ে পাটনার মাসীর কথা—পিসতুতো বোন মিলিদির কথা! কি সুরসিকা তারা—তাদের কি সুতীক্ষ্ণ রসনা। কি চোখা-চোখা বাক্যবাণে অকারণ হাসির ঝরণা বইয়ে দেয়। তাদের সে রসিকতা গ্রাম্য ও আদি-রসাত্মক হলেও হাসতে হাসতে উপস্থিত সকলের পেটে যেন খিল লেগে যেতো। বার বার কেবল প্রশান্ত তাদের অভাব অনুভব করতে থাকে। তাতে আবার এক একবার মনে হয় এর চেয়ে ধার করেও যদি তাদের টাকা পাঠিয়ে আনাতো! বিয়ে ত মানুষ জীবনে একবারই করে!

বলা বাহুল্য, বৌভাতের দিন অল্প কয়েকটি বন্ধুবান্ধব নিমন্ত্রিত হয়েছিল। কাজেই

সন্ধ্যারাত্রে খাওয়ার পাট শেষ হয়ে গেল। সে যেন কেমন বিশ্রী, প্রশান্তর ভাল লাগে না। তাদের বাড়ীর এই সব হাঙ্গামা চুকতে চুকতে ইতিপূর্বে বরাবর রাত একটা দেড়টা বেজে যেতো, অথচ এখন মাত্র সাড়ে ন'টা। ফুলশয্যার সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত ক্ষণটি কাজের চাপে পাছে কেটে যায়···পাছে রাত ভোর হয়ে যায়, সেই আশঙ্কায় দুরু দুরু বক্ষে হবে সেই প্রথম মিলন! অতি সংক্ষিপ্ত, কিন্তু অতি মূল্যবান! ফুলশয্যার রজনীর এমনি কত স্বপ্নই না একদিন দেখেছিল প্রশান্ত! থাক্ সে সব কথা।

এরপরই ফুলশয্যার আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্ম শুরু হলো।

একঘণ্টার মধ্যেই হাতেব সুতো-কাটা, নতুন কাপড় পবে বরকনের একত্রে ক্ষীর-মুড়কি খাওয়া প্রভৃতি সম্পন্ন হয়ে গেল। তখন মা, জ্যাঠাইমা, খুড়ীমার দল ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন একে একে। শুধু খুড়ীমা যাবার সময় মৃদুস্বরে প্রশান্তকে বললেন, সমস্ত দিন খাটাখাটুনি হয়েছে, আর দেরি করিসনি বাবা, দরজা বন্ধ ক'রে শুয়ে পড়!

অকস্মাৎ যেন একটা আঘাত খেয়ে চমকে ওঠে! প্রশান্তর বুকের ভিতরটা কেমন করতে থাকে। সে চেয়ে দেখলে ঘরেব মধ্যে সে আর তার নববধূ! তখন তার মনে পড়লো এই বিশেষ রাতটিব কথা! আজ মধুযামিনী, কত কানাকানি, কত আড়িপাতা, কত রঙ্গরস—তরুণী আত্মীয়াদের উল্লাস এই রাত্রিব স্মৃতিকে চির-মধুর করে রাখে। তারা যেন বসন্তের সহচর—ফুলের গন্ধ, কোকিলের কুহুতান, মলয়ের হিল্লোলের মত! কিন্তু তারা কৈ? সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায় তার অর্থনৈতিক দিকটা! এবং ভাবতে বুঝি একটু বেদনাও লাগে—এটা তার স্বেচ্ছাকৃত! সে আবার মনকে জোর করে উঁচুতে ঠেলে তোলবার চেষ্টা করতে করতে দরজাটা বন্ধ করে ফিরে এসে শুয়ে পড়ে!

বিছানায় শুয়ে আবার তার মনে এমনি আরো কত কি চিন্তার উদয় হয়। লোকে শ্বশুরবাড়ী থেকে খাট, বিছানা, গদি, বালিশ, নেটের মশারী ও সিল্কের বিছানা-ঢাকা পায়! তারপরে ফুলে ফুলে ভরে ওঠে ঘর ও বিছানা! তারই মধ্যে হয় ফুলশয্যা! নববধূ তার প্রথম দু'টি নয়ন মেলে স্বামীর মুখের দিকে চায়—যেন ফুলের বনে একটি কুসুম বিকাশোন্মুখ হয়ে যার পথ চেয়েছিল, আজ বুঝি তার দেখা পেলো—কত যুগযুগান্ত পরে! এ সবের একটা উন্মাদনা আছে বৈকি!

হঠাৎ প্রশান্তর কল্পনায় বাধা পড়ে। নিজের বিছানার দৈন্য, ফুলের দৈন্য তার মনকে ভীষণ রকম পীড়া দিতে থাকে। ওসব বাজে খরচা করবার মত ইচ্ছা তার ছিল না সত্যি, তবু মায়ের অনুরোধে সে গিয়েছিল বিছানা কিনতে কিন্তু দাম শুনে ফিরে এসেছে। মনে হয়েছে বাজে খরচ! একটা খাট বলে তিনশো টাকা, একটা গদি আশি টাকা, একটা নেটের মশারি পঞ্চাশ টাকা? আর ফুল? ওঃ কি ভীষণ দাম! একজোড়া গোড়ে-মালা কলেজ স্ট্রীট মার্কেটে বলে কিনা বারো টাকা!

বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে সে যা সামান্য উপহার পেয়েছে তা কেবল ভাল ভাল বই। ইংরিজি ও বাংলা ভাষার। অত্যধিক দামের জন্য বোধহয় কেউ ফুল দেয়নি।

প্রশান্তর মনে হলো কিন্তু ভালই হয়েছে। একরাত্রির জন্যে মিছিমিছি ফুল কিনে এত টাকা নষ্ট করার কোন মানে হয় না। আবার সঙ্গে সঙ্গে বিপরীত চিন্তাও জাগে। কিন্তু ফুলই যদি না রইল তাহলে—ফুলশয্যা যে অর্থহীন!

বিছানায় শুয়ে প্রশান্ত যখন এই সব ভাবে, তখন তার বিয়ের গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্তটাই যেন কেমন বেসুরো মনে হয়।

ফলে নববধূ যে তারই পাশে জড়সড় হয়ে শুয়েছিল প্রশান্ত তা ভুলে গিয়েছিল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত প্রশান্তর কাছ থেকে সম্ভাষণের জন্যে অপেক্ষা করে থেকে থেকে শেষে ছোট্ট একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে।

সে শব্দে প্রশান্ত সচকিত হয়ে ওঠে। তারপর নববধূর দিকে ফিরে ধীরে ধীরে তার একটি হাত নিজের মুঠোর মধ্যে টেনে নিয়ে অনেক ইতঃস্তত করে, তার কানের আরো কাছে মুখটা নিয়ে গিয়ে অস্পষ্ট ও জড়িতস্বরে বলে ফেললে, খুব খারাপ লাগছে, না? /

সত্যি বলতে কি, ঠিক খারাপ নয় তবে আশাভঙ্গের কি যেন একটা বেদনা বাজছিল তার মনে। আত্মীয়স্বজনদের মুখে সে শুনেছিল অনেক কথা। তার সব সাধ মিটবে এবার। এতবড় পরিবারে বিয়ে হচ্ছে—সেখানে সব শিক্ষিতের দল, তাদের কত আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব। কত গয়না পাবে, কত ভালমন্দ উপহারের জিনিসে ভরে যাবে তার ঘর! কিন্তু কোথায় কি! নিমন্ত্রিত লোকজনই চোখে পড়লো না নববধূর। তাই বুঝি একটু হতাশ হয়েছিল সে। তবু স্বামীর মুখ থেকে ওই কথা শুনে সে-সব চেপে গিয়ে সে আপত্তি জানালে, ছিঃ আজ ও কথা মুখে আনতে নেই। আমার জীবনে এরচেয়ে ভালদিন আর কি আছে!

তা জানি! বলে নিজেকে একটু সামলে নিলে বটে প্রশান্ত কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার যেন কৈফিয়ৎ টেনে আনলে কণ্ঠে, মানে আসল কথাটা কি জানো, লোকের

ধারণা বুঝি কাঁড়ি কাঁড়ি ফুল আর দামী খাটবিছানা না হ'লে ফুলশয্যা হয় না, সব মাটি হয়ে যায়!

লোকের মনে যে ধারণা থাকে থাক, ওসব কথা আমায় শুনিয়ে লাভ কি! আমি গরীবের মেয়ে, জীবনে কোনদিন খাটবিছানা চোখেই দেখিনি—তার ওপর আবার ফুলের শয্যা? শেষ কথাটা উচ্চারণ করবার আগেই যেন কে তার কণ্ঠকে চেপে ধরে ভেতর থেকে।

নববধূর এই কথার সঙ্গে শুধু দারিদ্র্যের অভিশাপ নয়, তার সঙ্গে কোথায় যেন নারী-হৃদয়ের একটা ব্যর্থতার বেদনাও প্রচ্ছন্ন ছিল, তা বুঝতে এতটুকু বিলম্ব হয় না প্রশান্তর। তাই তার জবাবটা সোজাসুজি নববধূকেই দিলে তবে একটু ঘুরিয়ে বল্‌লে, আমি তোমাকে বলছি না। কিন্তু যারা একরাত্তিরের বিলাসের জন্যে এত টাকা বৃথা অপব্যয় করে তাদের কথা ভেবে দেখো দেখি! এ আবুহোসেনী নবাবীর কি কোন অর্থ হয়! একজন যখন ফুলের বিছানায় শুয়ে আরাম করেন, মেয়েব বাপের তখন ঋণের দুশ্চিন্তায় চোখে ঘুম আসে না। একবারও কি তাদের মনে হয় না একথাটা? উত্তেজনায় কেঁপে ওঠে প্রশান্তর কণ্ঠস্বর।

আবার নিজেই বলে একটু পরে, থাকগে ওসব বাজে কথা এখন। তাদের মনে কি হয় না হয়, সে ভেবে কি লাভ!

প্রশান্ত চুপ করে যায় বটে কিন্তু লাভ লোকসানের এই হিসেব-নিকেশ সে যে করে নিজের বিবেকের সঙ্গেই, এ কথাটা বুঝতে পারে না নববধূ। তাই সে একটু বিস্মিত হয়। স্বামী যখন প্রণয়-সম্ভাষণের পরিবর্তে ওই সব কথা বলে, তখন এই ফুলশয্যার রাত্রে তার বান্ধবীদের বরেরা কে কি বলেছিল সব কথাই একে একে তার মনে আসে। বরের প্রথম প্রেম-সম্ভাষণের উত্তরে সে কি বলবে, সারাদিন ধরে তার অনেক রকম মহড়া দিয়ে রেখেছিল, সব যেন তার বুকের তটে সমুদ্র তরঙ্গের মত আছড়ে পড়ে নিঃশব্দে টুকরো টুকরো হয়ে বুদ্‌বুদে পরিণত হয়। এ সব কিছু বুঝতে পারে না প্রশান্ত। সে তাই নববধূর কোমল ঈষদুষ্ণ স্বেদসিক্ত করপল্লবটি বুকের ওপর চেপে ধরে বলতে থাকে, আমার কি মনে হয় জানো, যাদের হৃদয়ে সত্যিকারের আনন্দের অভাব, তারাই ওই কৃত্রিম আড়ম্বরের মধ্যে দিয়ে আত্মতৃপ্তিলাভ করতে চেষ্টা করে। সুখ, আনন্দ, তৃপ্তি—এ সব কি পয়সা দিয়ে কেনা যায়? ওর উৎস ত বাইরে নয়, অন্তরের অন্তস্তলে! তুমি কি বলো?

নববধূ প্রশান্তর বুকের মধ্যে মুখটা লুকোতে লুকোতে মৃদুস্বরে শুধু উত্তর দেয়, এর চেয়ে জীবনে আর বড় সুখ কি আছে! আমি আর কিছু চাই না।

প্রশান্ত তাকে বুকের আরো কাছে টেনে নিয়ে বলে, সত্যি বলছো? এই কি তোমার অন্তরের কথা?

আমার মত গরীব হতভাগিনীকে তুমি যে দয়া করে পায়ে ঠাঁই দিয়েছো, তাতেই আমার জীবন ধন্য হয়েছে। তুমি কি বোঝ না?

নববধূর মুখের এই কথাতেও কেন জানি না প্রশান্তর মন ভরে না, বরং একটা বিরুদ্ধ সুর যেন বাজতে থাকে। অথচ এই বে-সুরটা যে কোথায় কী কারণে বাজছে, তা স্পষ্ট বুঝতে না পেয়ে সে অন্তরে অন্তরে আরও তিক্ত, আরও বিরক্ত হয়ে ওঠে।

কল্পনা

স্বামী কি রকম হবে সে সম্বন্ধে প্রত্যেক মেয়েরই মনে কিছু না কিছু কল্পনা থাকে। তবে যার ভাগ্য ভাল তার বরাতে হয়ত সেটা সফল হয়, আর যার তা হয় না সে গোপনে চোখের জল মোছে! তবু সেই কল্পনাটাই যে সত্য তাতে আর কোন সন্দেহ নেই! সব মেয়েই আইবুড়ো বেলায় তাই ভাবী স্বামী নিয়ে মনে মনে নানা ছবি আঁকে।

স্মরণাতীত কাল থেকে এই নিয়ম চলে আসছে।

অবশ্য চলে আসতে বাধ্য। কেননা আমাদের ঘরে মেয়ের বিয়েটা ত কেবলমাত্র সিঁথিতে সিঁদুর দেওয়াতেই শেষ হয় না, তার খাওয়া-পরা, ভালমন্দ, তার সুখদুঃখ, তার ভবিষ্যৎ, সমস্তই যখন সেই স্বামী-নামক জীবটির ওপর নির্ভর করে, তখন তার গুরুত্ব আছে বৈকি!

তবে অমলার ব্যাপার স্বতন্ত্র। একে তার বাপের অবস্থা ভালো, তার ওপর তাকে দেখতে সুন্দরী না হলেও সুশ্রী বলা চলে; লেখাপড়া জানে, তিনটে পাশ করেছে, গান গাইতে পারে, সেতার বাজাতে পারে, আবার নাচতে পারে। তার মনে কত কল্পনা! কত স্বপ্ন!

মুস্কিলটা হয়েছে বোধহয় সেই জন্যেই বেশী! অমলার বাপ-মা যে পাত্রই ঠিক করেন কোনটাই মেয়ের পছন্দ হয় না। রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুয়ে অমলা আকাশ-পাতাল ভাবে, তার চোখে ঘুম আসে না। এ পর্যন্ত তার স্কুল ও কলেজের যেসব বন্ধুদের বিয়ে হয়েছে তাদের সকলের স্বামীর কথাই একে একে তখন তার মনে পড়ে। কিন্তু আশ্চর্য তাদের কাউকেই স্বামী হিসাবে তার পছন্দ হয় না। সে ভাবে, অন্তত তাদের সকলের চেয়ে সেরা হবে তার স্বামী সকল দিক দিয়ে। সেইজন্য অমলার চিন্তারও শেষ নেই। ঠিক কি রকম স্বামী হলে যে সে সকলের চেয়ে জিতবে বা সকলকে টেক্কা মারতে পারবে, কিছুতেই ভেবে স্থির করতে পারে না।

ডাক্তার, উকিল, ব্যারিস্টার, প্রফেসার, ব্যবসায়ী, ধনীর একমাত্র সন্তান এবং আরো কত নিত্য-নূতন বিয়ের সম্বন্ধ আসে, কিন্তু কোনটাই অমলার মনঃপূত হয় না।

যে-ই ডাক্তারের কথা ওঠে প্রথমেই তার মনে পড়ে যায় লিলির স্বামীর কথা। এম-বি পাশ করা ভাল ছেলে, অথচ আজো বেকার! লিলির বাপ মেয়েকে যা

হাতখরচা পাঠান তাই দিয়ে কোন রকমে তার স্যুট ও সিগারেটের খরচাটা ওঠে। এখনো পর্যন্ত পসার জমাতে পারলে না—স্যুট পরে, সিগারেটের টিন হাতে ক'রে, গলায় স্টেথোস্কোপ ঝুলিয়ে ডিস্‌পেন্সারিতে চুপচাপ বসে ঘরের কড়িকাঠ গোনে। সময় কাটে না বলে মোটা ডাক্তারী বইয়ের মধ্যে লুকিয়ে ধর্মতলার ফুটপাত থেকে কেনা সস্তার বিলেতী ডিটেকটিভ নভেল বসে বসে পড়ে।

এ ছাড়াও ডাক্তারের কথা ভাবতে গেলে আর একজনের কথা অমলার স্মৃতিপটে উদিত হয়, সে তার মাসতুতো ভাই অরুণার স্বামী। তিনিও ডাক্তার। কিন্তু তাঁর আবার এত পসার যে দিনে-রাতে এমন সময় পান না যে স্ত্রীর সঙ্গে দু'টো ভাল কথা কন। শুধু ছুটেছেন টাকার পিছনে! টাকা-টাকা টাকা! এমন অর্থপিশাচ আর দেখা যায় না। ছেলে নেই, পুলে নেই, অথচ টাকার লোভ তাঁর এত বেশী যে আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে পর্যন্ত ভিজিটের বদলে তেলের দাম বলে টাকা না নিয়ে রুগী দেখতে যান না। অত্যন্ত কটুভাষী, সদাই যেন সমস্ত পৃথিবীর ওপর চটে আছেন। নার্স ও মিড্‌ওয়াইফদের সঙ্গে বদনাম তাঁর এমনই যে, অরুণা বেচারী লজ্জায় আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করতে যায় না।

ভাল কেরানী স্বামী হিসাবে সত্যি ইন্দুবাবুর তুলনা হয় না। ওরকম পত্নীগতপ্রাণ স্বামী আর কখনও দেখেনি অমলা। নিজের স্ত্রী প্রতিমা ছাড়া আর কোন স্ত্রীলোককে যেমন জানেন না, তেমনি কারো দিকে কখনো ফিরেও তাকান না। সুপুরুষ। কিন্তু এমন মেয়েলীভাবাপন্ন যে সেকথা মনে করতেও অমলার গা ঘিন্ ঘিন্ করে। প্রতিমার রান্নার সুবিধে হবে বলে তিনি নিজে কয়লা ভেঙ্গে উনুন ধরিয়ে দেন, বাটনা বেটে দেন, মাছ কুটে দেন। বাস্তবিক, প্রতিমা যখন স্বামীসোহাগে গদগদ কণ্ঠ হয়ে বলে, জন্ম জন্ম যেন এমন স্বামী পাই ভাই, তখন অমলা তাকে ঘৃণা না করে পারে না।

এইভাবে রাতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে অমলা যত তার ভাবী স্বামীর কথা চিন্তা করে ততই যেন নার্ভাস হয়ে পড়ে। তারও বরাতে যদি ওইরকম একটা জোটে? আবার সঙ্গে সঙ্গে মনকে দৃঢ় করে নেয়—না তার চেয়ে অবিবাহিত থেকে চিরজীবন টিচারী করে কাটিয়ে দেবে, তবু ওরকম পুরুষের সঙ্গে ঘর করতে পারবে না।

সবচেয়ে সে ব্যথা পায় ভবেনবাবুর কথা মনে হলে। অমন 'কালচার্ড' লোক সবদিক থেকে বিবেচনা করলে সত্যিই দুর্লভ, কিন্তু তবু একদিন হঠাৎ মালতীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে সে লক্ষ্য করলে যে তিনি বসে বসে ছোট মেয়েটাকে ভাত খাইয়ে দিচ্ছেন। এটাও সে ক্ষমা করতে পারতো, কিন্তু যেদিন চায়ের নিমন্ত্রণ

রক্ষা করতে গিয়ে দেখলে যে শুচিবায়ুগ্রস্ত মায়ের সামনে তিনি গামছা পরে দাঁড়িয়ে আছেন, আর মা এসে মাথায় গঙ্গাজল ছিটিয়ে দিতে তবে নিজেকে শুদ্ধ মনে করে ঘরে গিয়ে ঢুকলেন, সেদিন থেকে ভবেনবাবুর সম্বন্ধে সমস্ত শ্রদ্ধা তার মন থেকে চলে গেল।

মালতীর সঙ্গে তার ছিল সবচেয়ে বেশী বন্ধুত্ব। একসঙ্গে স্কুল থেকে থার্ড ইয়ার পর্যন্ত পড়েছিল। একই বাসে তারা গল্প করতে করতে একসঙ্গে কলেজ থেকে ফিরতো। সেদিন তাই পাশের ঘরে চুপি চুপি মালতীকে ডেকে নিয়ে গিয়ে অমলা বললে, তুই এসব 'টলারেট' করিস্ কি করে ?

উত্তর দিতে গিয়ে মালতীর কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠলো। বললে, এ ত কি দেখছিস্—প্রতিদিন ওই শাশুড়ীর জন্যে আমায় তিনবার করে স্নান করতে হয়!

বিস্মিত কণ্ঠে অমলা বললে, এই দারুণ শীতে! বলিস কিরে ? এ যে রীতিমত 'টরচার'!

এবার মালতীর চোখের কোণ বেয়ে দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো। সে বললে, আমার যেন এক এক সময় 'পটাসিয়াম্ সায়ানাইড্' খেয়ে মরতে ইচ্ছা করে।

তার উত্তরে অমলা একটু চুপ করে থেকে বলে, তুই ভবেনবাবুকে বলতে পারিস না কিছু ?

চোখের জল মুছে মালতী উত্তর দিলে, বলিনি আবার ? কিন্তু এক উত্তর ওঁর মুখে, মা যতদিন বেঁচে আছেন ততদিন তিনি যা বলবেন তার ওপর একটা কথাও কওয়া চলবে না। আর তা যদি সহ্য করতে না পারো ত বাপের বাড়ী গিয়ে থাকোগে, বুড়ো মাকে আমি কোথায় ফেলবো ? আমার বাপ-মা কত টাকা খরচ করে বিয়ে দিয়েছিলেন জানিস ত ? উঃ! বিয়েটা যেন একটা 'লটারী' খেলা। তাই তোকে আগে থেকে সাবধান করে দিচ্ছি।

ভাবতে ভাবতে একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেলে অমলা। মালতীর মত ফ্যাশানেবল মেয়ের কি ভীষণ পরিণতি। বাস্তবিক সেকথা মনে পড়লে অমলা অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঘুমতে পারে না।

হ্যাঁ, লোক বলতে হয় অরুণবাবুকে, পাক্কা সাহেব যাকে বলে। স্যুট পরতে জানেন, সর্বদাই ফিটফাট। স্যুটের ক্রিজটা কোনদিন নষ্ট হতে দেন না। যেদিনই তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে, সেইদিনই মনে হয়েছে, বুঝি এইমাত্র নতুন স্যুট পরেছেন।

দীর্ঘকায় পুরুষ, ধবধব করছে ফর্সা রঙ, ঠোঁটের কোণে পাইপটা চেপে ধরে যখন ঈষৎ নাকি-নাকি সুরে ইংরেজীতে অনর্গল কথা কয়ে যান তখন অমলা সুরমার সৌভাগ্যে ঈর্ষাবোধ না-করে পারে না। সত্যি, সুরমাটার বরাত ভালো। ক্লাসে লেখাপড়ায় সে কোনদিনই ভাল ছিল না, তাছাড়া দেখতে শুনতেও একেবারেই সুন্দরী নয়। শুধু বড়লোক বাপের তদ্বিরের জোরে বিয়েটা হয়েছিল সেকেণ্ড ইয়ারে পড়তে পড়তে। অরুণবাবু বিলাত-ফেরৎ ইঞ্জিনীয়ার বলে আগে বেশ মনে মনে অমলা তাঁকে শ্রদ্ধা করতো। কিন্তু ইদানীং আর করে না। যেদিন থেকে সে শুনলে যে অরুণবাবু কি একটা কারখানার ছোটসাহেব, সেদিন থেকে তার মন বিরূপ হয়ে উঠলো তাঁর প্রতি। নেহাৎ কতকগুলো অশিক্ষিত কুলি-মজুর খাটাতে হয় ত! কুলির রাজা, তা সে যত বড় রাজাই হোক্।

তার মনের যেন সুর কেটে যায়।

অমলার বাবা সেদিন একজন ভালো প্রফেসর পাত্রের কথা তাকে বলেছিলেন, কিন্তু সে মত দেয়নি বিয়েয়! প্রফেসরগুলোকে যেন কেমন একরকমের জীব বলে তার মনে হয়। যেন বিদ্যার একটা গাধাবোট। শুধু লেখাপড়ার বোঝা বহন করেই চলেছে। গো-বেচারা। মুখে চোখে কোথাও স্মার্টনেস্‌এর চিহ্নমাত্র নেই। হয় মাথাজোড়া, না-হয় কপালজোড়া টাক। চোখে চশমা, ঢিলে পাঞ্জাবির ওপর কাঁধে একটা আধময়লা চাদর। শ্লথ মন্থরগতি। সব সময়ই, যে সাবজেক্ট পড়ায় সে সম্বন্ধে দুর্বোধ্য কতকগুলো ভারি ভারি বই বগলে। হাসতে জানে না, রসিকতার ধার দিয়েও যায় না। সর্বদাই মুখখানাকে এমন করে রাখে যেন বিশ্বের যত কিছু কল্যাণ-চিন্তা, যত কিছু গুরুদায়িত্ব সব কে তার মাথায় চাপিয়ে দিয়েছে। এই প্রসঙ্গে নীলিমাদির স্বামীর কথা মনে হলে অমলার আজো হাসি পায়। বেচারী ইংরেজীর বড় প্রফেসর শুনে একদিন সে গিয়েছিল তাঁর সঙ্গে যেচে আলাপ করতে। কিন্তু লোকটি এমন ভীরু যে তার মুখের দিকে চোখ তুলে তিনি কথা কইতে পারেননি।

অমলা বলেছিল, ভয় নেই, আমি আপনার ছাত্রী নই, মুখের দিকে চেয়ে কথা কইলে আপনার জাত যাবে না। ভদ্রলোক তখন অতিকষ্টে তার মুখের দিকে তাকিয়ে জবাব দিয়েছিলেন, কি যে বলেন!

শুনে নীলিমাদি চায়ের পেয়ালা হাতে করে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠে বলেছিলেন, ওমা বলেন কি? ও যে তোমার ছোট শালী হয়। সুন্দরী শালীকে দেখে বুঝি মাথা গোলমাল হয়ে গেল?

নীলিমাদির সে হাসিতে অমলাও সগর্বে যোগ দিয়ে বলেছিল, রায়মশায়

নীলিমাদির সঙ্গে কথা বলবার সময় আপনি কোন দিকে চেয়ে কথা বলেন ভাই?

ধীরকণ্ঠে তিনি উত্তর দিলেন, তোমার দিদি ত সামনেই রয়েছেন জিজ্ঞেস করতে পারো।

নীলিমা সঙ্গে সঙ্গে মুখটা বেঁকিয়ে নিয়ে বলেছিল, সেকথা আর ভদ্রসমাজে বলবার নয়।

কেন? অমলা জিজ্ঞেস করলে, তখনো কি উনি মনে করেন যে কোন ছাত্রীর সঙ্গে কথা কইছেন?

নীলিমা বললে, জ্বলে মলুম ভাই! সিনেমায় যাবে না পাছে কোন ছাত্র ছাত্রী দেখে ফেলে এই ভয়ে, পান-সিগারেট খাবে না, তাতে নাকি ব্যাড এক্জাম্পেল সেট্ করা হবে, পাতলা কাপড় পরবে না বিলাসিতা বলে।

অমলা জিজ্ঞেস করলে, আচ্ছা বায়মশায়, শিক্ষকতা করতে গেলে ছনিয়ার সকল রকম আনন্দ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে রাখতে হবে একথা কোথায় লেখা আছে?

তিনি এইবার মুখ তুলে বললেন, আমাদের দেশে কি আছে জানি না, তবে বিলেতের এক-একজন প্রফেসর ঠিক সন্ন্যাসীর মত কঠোর জীবনযাপন করেন।

অমলা বললে, তাই যদি জানতেন তবে আমার দিদিকে বিয়ে করতে গিয়েছিলেন কেন?

তিনি বললেন, এইটাই জীবনের সবচেয়ে বড় ব্লান্ডার হয়ে গিয়েছে। এখন যদি কোন গুণ্ডা অপহরণ করে নেয় ত বেঁচে যাই!

আবার অমলার চিন্তায় বাধা পড়ে ডলির স্বামীর কথা মনে হতে। তিনি উকিল; শুকনো একহারা চেহারা, সাদা জিনের পাত্‌লুনের ওপর কালো আলপাকার বিবর্ণ কোট গায়ে কয়েকটা ময়লা ফাইল হাতে করে ট্রামে চড়ে স্মলকজ কোর্টে যান। সেখানে হয় পাঁচ আইনের কেস করেন, নয় ত কোন মাড়োয়ারী মুদির পাওনাদারের বিরুদ্ধে নালিশ দেন! উচ্চাশা বলতে তাঁর জীবনে যেন কিছুই নেই। মক্কেলকে ঠকিয়ে, কখনো মিথ্যাকথা বলে, কখনো বা ভয় দেখিয়ে যতটা পারেন টাকা আদায় ক'রে নেন। ওদের পাশের বাড়ীতে ভাড়া থাকে কিশোরী উকিল। সেদিন এক মক্কেলের কাছ থেকে টাকা আদায়ের যে দৃশ্য অমলা দেখেছিল তা মনে হলে সমস্ত রকম শিক্ষা-দীক্ষার ওপর চিরকালের মত তার ঘেন্না ধরে যায়। মক্কেল যত বলে টাকা আর নেই, উকিলবাবু তত বলেন, খোল্, তোর কাছা দেখি, লুকিয়ে বেঁধে রেখেছিস কিনা টাকা! শেষে সত্যিসত্যি, সেই কাছা থেকে দুটো টাকা বেরুল এবং তাই নিয়ে তবে উকিলবাবু ছাড়লেন।

উকিলকে অমলা কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারবে না। তার চেয়ে সসম্মানে অনাহারে শুকিয়ে মরাও ভাল। উপজীবিকা যদি সম্মানের না হয় তবে তা অমলার পক্ষে কিছুতেই গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

এমনি আরো কত কি চিন্তা করে অমলা। তার স্বামী যে হবে, সে শুধু ভরণপোষণের একটা যন্ত্র বা উপলক্ষ্যমাত্র হবে না। তাঁর সম্মানে সে যেন গর্ববোধ করতে পারে। দশের সামনে নিজের স্বামীর পরিচয় দিতে গিয়ে যেন তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

বিয়ের ব্যাপারে পাছে সে ঠকে না যায় সেইজন্য বিবাহিত বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়ে সে তাদের মনের কথাটা জানতে চেষ্টা করে। হঠাৎ এক-একদিন দুপুরে বেঁটে ছাতাটা মাথায় দিয়ে কারও না কারও বাড়ী গিয়ে হাজির হয়। কলেজী বন্ধুত্বের সূত্র ধরে নানাভাবে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে শেষে তাদের মনের কথাটা কৌশলে জেনে নিতো। আশ্চর্য, কারুর স্বামীকেই তার ভাল লাগে না, মনে ধরে না। এদের প্রত্যেকের চেয়ে সবদিক দিয়েই যে তার স্বামী বড় তখন সেইকথাই সে চিন্তা করতে থাকে।

একদিন অমলার মা বললেন, হ্যাঁরে অমি, সেদিন গোলাপ পিসী বলছিলেন, তাঁর কে এক দেওরপো আছে, সে নাকি বই লেখে, ছেলেটি বড় ভাল। পিসী বললেন, তার নাম করলেই তুই চিনবি—তুই কি কোন বই পড়েছিস সোমনাথ রায়ের?

সোমনাথ রায়! অমলার বুকটা ধড়াস করে উঠলো। তাঁর সঙ্গে তার বিয়ে! একি সম্ভব! তাঁর উপন্যাসের কত জায়গা এখনো সে মুখস্থ বলতে পারে। পাঠ্য-পুস্তকের নীচে লুকিয়ে রেখে রাত্রি জেগে জেগে কত পড়েছে সে তার উপন্যাস, ছোট গল্প। আধুনিক লেখকদের মধ্যে সোমনাথই তার সবচেয়ে প্রিয়। যদিও ভদ্রলোকের তীব্র বিদ্বেষ স্ত্রীজাতির ওপর, কিন্তু তবু কি রচনার মাধুর্য! এক-একটা বই বারবার পড়েও যেন আশা মেটে না।

কিন্তু অমলা ভাবে, রচনার মধ্যে যে ব্যক্তি স্ত্রীলোকদের এত গালাগালি দেয় সে সহ্য করবে কি করে তাকে? আর মেয়েমানুষকে বিয়ে করার জন্যেই বা তার এত আগ্রহ কেন?

সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়, হয়ত ওটা একটা ভান—যাকে পায়নি তাকে পাবার তপস্যা—'বৈরীভাবে ভজনা' বলা যেতে পারে।

রেডিয়োর প্রোগ্রামে একদিন সে তার ছবি দেখেছিল। বিস্ফারিত দুই চোখে কি

ঔদ্ধত্য! সেই চোখ দুটি নিমেষে যেন অমলার সামনে ভেসে উঠলো।

মনে মনে অমলা বলে ওঠে, সেই ভালো, পুরুষের মধ্যে যদি তেজ বা ঔদ্ধত্য না রইল তবে কিসের পুরুষ? মেনিমুখো পুরুষগুলোকে সে দু-চোখে দেখতে পারে না।

তাছাড়া এতবড় একজন সাহিত্যিক হবে তার স্বামী, যাঁকে এক ডাকে দেশের লোক চিনবে! নিজেকে তাঁর স্ত্রী কল্পনা করতেই যেন অমলার হাত-পা থরথর ক'রে কাঁপে। সেদিন সারারাত সে ঘুমতে পারলে না উত্তেজনায়।

পরদিন ভোরে উঠেই অমলা মাকে ডেকে সে বিয়েতে সম্মতি জানালো।

বিয়ের দিন অমলা তার বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজন যে যেখানে ছিল সবাইকে নিমন্ত্রণ করলে। সে যে এতবড় একটা বিখ্যাত লোকের স্ত্রী হচ্ছে, সেটা সকলকে দেখানোই ছিল তার প্রধান উদ্দেশ্য। হাশিতে খুশিতে গর্বে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে অমলার মুখ। বাসর ঘরে ঢুকে সকলের দিকে চেয়ে চেয়ে সে দেখতে থাকে সবাই এসেছে কিনা। ওরই মধ্যে আবার কেউ কেউ যখন ছোট্ট খাতা বার ক'রে সোমনাথের কাছে একটা 'অটোগ্রাফ' চাইতে এলো, তখন অমলার বুক যেন দশ হাত হয়ে উঠলো।

বিয়ের পরই ওরা মধুযামিনী যাপন করতে গেল পুরীতে। এখান থেকে টেলিগ্রাফ ক'রে সবচেয়ে বড় হোটেলের একটা ঘর রিজার্ভ করলে অমলা। সোমনাথের সঙ্গে এই প্রথম সে বিদেশে যাচ্ছে। নতুন স্বামীর সঙ্গে যাওয়ার আনন্দ ত আছেই, তাছাড়া অত বড় একজন সাহিত্যিকের স্ত্রী বলে সবাই যখন সসম্মানে তার দিকে চাইবে, তাকে নিয়ে সভাসমিতি ও পার্টিতে যাবার ধুম পড়ে যাবে, তখন অমলার মনের অবস্থা কি হবে কল্পনা করতেও যেন অমলার সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠে।

কিন্তু পুরীতে গিয়ে অমলা রীতিমত হতাশ হলো। তখন পুরীর 'সিজ্‌ন্‌', চারিদিকে লোকজন ভরা, তবু কৈ, কেউই ত তাদের চিনতে পারছে না বা খাতির করছে না! তবে কি ওরা কেউ সোমনাথের বই পড়েনি, তার নাম শোনেনি?

সমুদ্রের ধারে বেড়াতে বেরিয়ে যখন-ই কাউকে তাদের দিকে চাইতে দেখতো তখনই অমলার বুকের ভেতরটা ছাঁৎ ক'রে উঠতো। ওই বুঝি ওরা এইবার চিনতে পারলো, ওই বুঝি নমস্কার করে ছোকরার দল এসে তাদের ঘিরে দাঁড়াল। আবার

যেতে যেতে কাউকে ফিস্‌ফিস্ ক'রে কথা কইতে শুনলে অমলা ভাবে বুঝি তাদের সম্বন্ধেই কানাকানি করছে, কেউ হয়ত তাদের চেনে, তাই গোপনে অপরকে বলছে, ওই বিখ্যাত লেখক সোমনাথ রায় আর তাঁর স্ত্রী যাচ্ছেন।

কিন্তু এ সবই ত অমলার কল্পনা। সত্যি সত্যি কেউ-ই ত এখনো পর্যন্ত এলো না, তাদের সঙ্গে আলাপ করতে কিংবা তাদের নিয়ে মাতামাতি করতে? সাত-আটদিন ত কেটে গেল। তবু হোটেলে কিংবা মন্দিরে গিয়ে যেচে যেচে অনেকের সঙ্গেই সে প্রথমে আলাপ করেছিল এবং স্বামীর আসল পরিচয়টা দিয়ে বলেছিল,—পড়েননি ওঁর সেই 'ধর্ষিতা ধরিত্রী' বইটা? ওমা, এক বছরে যে তিনটে সংস্করণ হয়েছে? যাদের কাছে সে-কথা বলে, তারা একটু সলজ্জ হাসি হেসে উত্তর দেয়,—তাই নাকি? আচ্ছা, তাহ'লে এখন আসি ভাই—আর ক'দিন আপনারা এখানে থাকবেন? ভুবনেশ্বর যাবেন নাকি?

অমলা খানিকটা চুপ ক'রে থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলে, না।

এত অশিক্ষিত যে দেশের লোক, সে দেশে এর চেয়ে বেশি আর কি আশা করা যায়। অমলার নিজের ওপরই যেন অভিমান হয়। সোমনাথকে সে বলে, চলো কালই এখান থেকে চলে যাই।

সোমনাথ অমলার মনের কথা বুঝতে পারে না, তাই বলে, এমন সুন্দর জায়গা ছেড়ে তোমার যেতে ইচ্ছা করে? আমার ত করে না। মনে হয় আহার নিদ্রা ভুলে শুধু দিনরাত ওই অনন্ত নীল সমুদ্রের দিকে চেয়ে বসে থাকি।

এবার অমলা একটু থেমে উত্তর দেয়, আমারও ভালো লাগে, তবে অন্য জায়গাগুলোও ত দেখতে হবে।

সেইদিনই রাত্রে হোটেলে ফিরে তারা দেখলে, জনচারেক ছোকরা তাদের জন্য অপেক্ষা করছে। তারা বললে, পরের দিন সন্ধ্যায় লাইব্রেরী হল্-এ একটা সাহিত্যসভার তারা আয়োজন করেছে তাতে সোমনাথবাবুকে সভাপতিত্ব করতে হবে। আনন্দে অমলার চোখ দুটো জ্বলে উঠলো। তারা যাবার সময় তাকেও নেমন্তন্ন করে গেল।

পরদিন সন্ধ্যা সাতটায় সভা। অমলা বেলা পাঁচটা থেকে সাজতে আরম্ভ করলে। কত লোক আসবে। সকলেই ত তার পরিচয় জেনে তার দিকে তাকাবে! কাজেই ভালভাবেই তাকে সেজে যেতে হবে। এতবড় সাহিত্যিকের স্ত্রী সে, তার ত একটা 'পোজিশন' আছে।

যথাসময়ে মোটর এলো তাদের নিতে।

কিন্তু সেখানে পৌঁছে অমলা বিস্মিত হয়ে গেল। লোকে লোকারণ্য! ঘরে বারান্দায়, জানালায়, দরজায় এত ভিড় যে কার সাধ্য ভিতরে ঢোকে। কোনরকমে পিছনের একটা ছোট দরজা দিয়ে তারা স্টেজের ওপর গিয়ে বসলো। এত লোক তবে সাহিত্যিককে সম্মান দেখাবার জন্যে এসেছে! অহঙ্কারে অমলার বুক যেন দশ হাত হয়ে ওঠে।

সাতটা বেজে যাবার পর আরো প্রায় একঘণ্টা চুপচাপ বসে থেকে শেষে সোমনাথ উদ্যোক্তাদের একজনকে অনুরোধ করলে সভার কাজ আরম্ভ করার জন্যে। বললে, আর দেরি করছেন কেন?

সে সবিনয়ে জানালে, আজ্ঞে উদ্বোধন সঙ্গীত গাইবার কথা ফিল্ম-অভিনেতা নবীন মজুমদারের—তাঁকে আনতে লোক গেছে—এলেই শুরু করা হবে।

আরো পনেরো মিনিট কেটে যাবার পর বাইরে একটা মোটরের শব্দ শোনা যেতেই ভিড়ের মধ্যে থেকে একটা গুঞ্জন উঠলো। তারপর নবীন মজুমদার ও তাঁর স্ত্রী যেমন ঘরের ভিতর এসে ঢুকলেন অমনি করতালিধ্বনিতে যেন হলটা ভেঙে পড়বার উপক্রম হলো।

বলা বাহুল্য, অমলা এতে একটু অস্বস্তি বোধ করলে। তারা যখন সেখানে ঢুকেছিল তখনো অবশ্য লোকে হাততালি দিয়েছিল, কিন্তু এইরকম জোরে এবং এতক্ষণ ধরে সকলে একসঙ্গে দেয়নি। যাই হোক, করতালি থামতেই অমলা আড়চোখে একবার তার পার্শ্বে উপবিষ্টা নবীন মজুমদারের স্ত্রীর মূল্যবান জর্জেটের শাড়ীটার ওপর চোখ বুলিয়ে নিলে।

সভা আরম্ভ হবার আগে উদ্বোধন সংগীত শুরু করলেন নবীন মজুমদার। তিনি সিনেমায় গাওয়া একখানা বহুপ্রচলিত প্রেম-সংগীত গেয়ে যেমন থামলেন অমনি করতালিধ্বনিতে আবার সেই হলটি মুখরিত হয়ে উঠলো এবং বহুকণ্ঠে একসঙ্গে অনুরোধ এলো তাঁকে আরো একটি বিখ্যাত ফিল্মসঙ্গীত গাইবার জন্যে।

তৎক্ষণাৎ তিনি সেই গানটি ধরলেন এবং শেষ হতেই একেবারে উঠে দাঁড়িয়ে হাতজোড় ক'রে বললেন, এখানকার সিনেমা হল্-এ এখনি আমার আর একটা 'এনগেজমেণ্ট' আছে, তাই উঠতে হচ্ছে বলে সকলের কাছে মার্জনা চাইছি।

শুধু তাঁদেরই যাওয়ার কথা কিন্তু তাঁরা সস্ত্রীক বিদায় নিতেই হুড়মুড়, দুড়দাড় শব্দে সমস্ত হলটায় যেন একটা তাণ্ডবের সৃষ্টি হলো।

'আপনারা দয়া করে একটু চুপ করুন,' হাতজোড় করে উদ্যোক্তারা চেঁচাতে লাগলেন। কিন্তু কে কার কথা শোনে! মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই সমস্ত হলটা প্রায়

খালি হয়ে গেল। যে যেদিক থেকে পারলে নবীন মজুমদারের গাড়ির পিছনে পিছনে ছুটলো।

শেষে অল্প যে-ক'জন শ্রোতা রইল তাদের নিয়েই সোমনাথ সভার কাজ আরম্ভ করলে।

কয়েকটা কবিতা- ও প্রবন্ধ-পাঠের পর সভাপতির অভিভাষণ দিতে উঠে সোমনাথ দেখলে যে তার সামনের কয়েকটা বেঞ্চে গোটাকতক ছোট ছেলে এবং আট দশটি বৃদ্ধ মাত্র অবশিষ্ট আছে।

সভা শেষ হলে উদ্যোক্তারা যখন সভাপতি ও তাঁর স্ত্রীকে জলযোগ করাতে নিয়ে গেল তখন অমলা বসে রইল গম্ভীর হয়ে। কোন কিছুই সে মুখে দিলে না। বললে, শরীরটা খারাপ।

একটু অন্ততঃ চা খান, বলে একজন চায়ের একটা পেয়ালা তার মুখের কাছে এগিয়ে দিলে।

অমলার মুখে চা-টা বিস্বাদ হয়ে উঠল। সে দু'-এক চুমুক দিয়ে পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে রুমালে মুখ মুছতে লাগল।

গাড়িতে করে যখন তারা হোটেলে ফিরছে তখন বেশ রাত হয়েছে। পথটা নির্জন। দু'দিকের বড় বড় ঝাউ-গাছগুলো যেন অন্ধকারে দৈত্যদানবের মত মাথা নাড়ছে, আর তারই সঙ্গে দূর থেকে ভেসে আসছে সমুদ্রের গর্জন। একটা ভয়াবহ আব্‌হাওয়ার মধ্যে দিয়ে যেন গাড়িটা ছুটে চলছে।

গুম্ হয়ে বসে আছে অমলা। তার সমস্ত মুখটা কঠিন।

সোমনাথ দু'একটা কথা বলার চেষ্টা করলে অমলার সঙ্গে, কিন্তু বৃথা।

অমলা নীরব ও নিশ্চল—যেন কিসের ধ্যানে মগ্ন।

গাড়ি থেকে নেমে হোটেলের ফটকের মধ্যে ঢুকতে ঢুকতে একবার সোমনাথ বললে, তুমি কিছু খেলে না কেন?

অমলা কিন্তু তেমনি নিরুত্তর রইল, কোনো সাড়া না দিয়ে।

আবার একটু থেমে সোমনাথ বললে, কি ফার্স্টক্লাশ খাবার, জানো এখানকার চম্‌চম্ হলো বিখ্যাত!

অমলাকে এবারও তেমনি চুপ ক'রে থাকতে দেখে সোমনাথ বললে, কি হলো তোমার?

অমলা শুধু বললে, জানি না।

সোমনাথ বললে, না, না, সত্যি কি হলো বল না, হঠাৎ এত গম্ভীর হয়ে গেলে কেন? সভাটা মোটে জমলো না তাই!

অমলার চোখের সামনে তখন নবীন মজুমদারের স্ত্রীব হাস্যোজ্জ্বল মূর্তিটা ভেসে উঠলো। গর্বে অহঙ্কারে সে যেন ফেটে পড়ছে। বাস্তবিক তার চেয়ে সৌভাগ্য-বতী আজ কে!

সোমনাথ আবার জিজ্ঞেস করলে, কি হয়েছে বলো, লক্ষ্মীটি?

অমলা এবার ঝাঁজালো কণ্ঠে বললে, জানি না। চুপ করো!

সোমনাথ চুপ করতেই অমলাব বুক থেকে একটা গভীব দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে গেল। তখনো বুঝি সে নবীন মজুমদাবের স্ত্রীব সৌভাগ্যেব কথাটাই কল্পনা করছিল।

অপ্রত্যাশিত

অপ্রত্যাশিত বৈকি, দশ বছর পরে হঠাৎ এইভাবে দেখা হওয়া! কেবল যে দীর্ঘ দিনের ব্যবধান তা নয়, পত্র-বিনিময় পর্যন্ত ছিল না—এমন কি কে যে কোথায় আছে সে খবরও কেউ রাখতো না। তবুও প্রথম সাক্ষাতেই তারা দু'জন দু'জনকে চিনতে পারলে।

অবশ্য প্রথমটা অশোকের একটু ধাঁধা লেগেছিল! হাফ্‌প্যান্ট পরা, মাথায় টুপি-আঁটা একটা লোক যখন সাইকেলে চেপে ছুটতে ছুটতে তার কাছে এসে হঠাৎ গাড়ির গতিরোধ ক'রে বললে 'হ্যালো অশোক', তখন সে রীতিমত ঘাব্‌ড়ে গেল। কিন্তু তার মুখে চোখে বিস্ময়ের ভাব দেখেই শঙ্কর বুঝতে পেরেছিল, তাই একটু পরে মাথার টুপিটা খুলে ফেলে জিজ্ঞাসা করলে, রাস্কেল, আমায় চিনতে পারছিস না?

সহসা এই রকম মধুর সম্ভাষণ শুনে অশোকের মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। সে একটু থেমে বললে, আরে, শঙ্কর নাকি?

আজ্ঞে হাঁ। তবে এতক্ষণ ধরে না-চেনার ভান করা হচ্ছিল কেন? আমার কি দুটো হাত বেশী বেরিয়েছে যে এত সময় লাগল ঠাওর করতে?

অশোক বললে, হাত বেরুলে বরং স্থবিধে ছিল, মানুষটাকে চেনা যেতো। এ যে দু'য়ের বার—না বাঙ্গালী, না সাহেব; আমার ত ফিরিঙ্গী বলেই মনে হচ্ছিল তোকে।

শঙ্কর বলে, ত্যাখ, ওসব 'ভাঁওতা' আমার কাছে মারিস নি—স্রেফ ভুলে গিয়েছিলি তাই বল না? আমি ত দূর থেকে তোকে দেখেই চিনেছি?

অশোক কি একটা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু পারলে না। শঙ্কর ওর মুখের কথাকে চেপে দিয়ে বললে, তারপর, এখানে কি মনে করে?

অশোক বললে, চেঞ্জে এসেছি।—তুই এখানে?

আমি ত এখানে চাকরি করছি, আজ ন' বছর হলো। এই বলে একটু থেমে আবার সে শুরু করলে, ওই যে পাহাড়ের নীচে লাল বাংলো দেখা যাচ্ছে, ওইটেই আমার বাসা। চল তোকে নিয়ে যাই আমার ওখানে।

অশোক ভোরবেলা বেড়াতে বেরিয়েছিল। নষ্ট-স্বাস্থ্য উদ্ধার করার জন্যে তার খিদের প্রয়োজন, তাই সে প্রত্যহ সাত-আট মাইল করে হাঁটতো। সেদিন কিন্তু

বেশী দূরে এসে পড়েছিল এবং ক্লান্ত যে হয় নি তা নয়, তবুও মুখে বললে, আজ থাক ভাই, তোর বাসাটা ত দেখে নিলুম, আর একদিন আসবো।

শঙ্কর বললে, যা দেখি এখান থেকে এক পা, কেমন 'তোর ক্ষমতা আছে! জানিস্, আমি এখানকার ফরেস্ট অফিসার—এটা আমার রাজত্ব। শুধু একটা মুখের কথা বললেই হলো—ব্যস্, তোকে এখনি বেঁধে আমার বাসায় নিয়ে গিয়ে হাজির করবে এখানকার লোকেরা। বলতে বলতে হো হো ক'রে হেসে উঠলো।

অশোক বললে, মাইরি বল্‌ছি, কাল আমি ঠিক আসবো।

কেন আজ বুঝি প্রেয়সীর অনুমতি নেওয়া হয়নি, ভাব্‌বে? তা ভাবুক, দিন-রাত যে তার মুখের দিকে চেয়ে বসে থাকতে হবে তার কি মানে? চল্‌-চল্‌ ওঠ্, আমার সাইকেলের পিছনে। এই বলে অশোকের গায়ে সে একটা ঠেলা মারলে।

অশোক অবিবাহিত। তাই একথার কি জবাব দেবে ভাবছিল। শঙ্কর তাকে ইতস্তত করতে দেখে আবার বলে উঠলো, হয়েছে বাবা হয়েছে, ভাবনায় যেন একেবারে মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়লো—আমি এখনি লোক দিয়ে তোর বাসায় খবর পাঠিয়ে দেবো 'খন, আমার কি এতটুকু কাণ্ডজ্ঞান নেই ভাবিস্? চল্ চল্—

অশোক একটু হেসে বললে, আমার স্ত্রী কোথায় যে তার সম্বন্ধে—

আরো কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু শঙ্কর সে কথায় কান না দিয়েই বলে উঠলো, তোর কোন কথা আমি এখন শুনতে চাইনে, তার সম্বন্ধে যা বলবার আমার বাসায় গিয়ে বলবি। তারপর কণ্ঠস্বর একটু নরম করে বললে, এই ছাতুর দেশে ন'বছর পড়ে আছি, একটা আপনার লোকের মুখ পর্যন্ত দেখি নি, তুই কি বুঝবি আমার মনের অবস্থা!

অশোক বললে, তোর ছেলেমানষী দেখছি এখনো যায় নি। কলেজে যেমন ছিলি এখনো ঠিক তেমনি আছিস!

বরং তখনকার চেয়ে এখন গুণ্ডামি কিছুটা বেড়েছে। বলে শঙ্কর একরকম জোর করেই তাকে সাইকেলের পিছনে তুলে নিলে।

অগত্যা অশোককে আত্মসমর্পণ করতে হ'লো।

পাহাড়ের উঁচু-নিচু পথে সাইকেল ছুটে চলে।

চারিদিকে তাকাতে তাকাতে উচ্ছ্বাসে ভরে ওঠে অশোকের কণ্ঠ! চুপ করে থাকবার পর সে বলে, বাঃ, ভারি সুন্দর দৃশ্য ত এ জায়গার!

থাম, আর ন্যাকামি করতে হবে না। দু'দিনের জন্যে বেড়াতে এসে ওকথা সবাই বলতে পারে। যেন মারমুখী হয়ে ওঠে শঙ্কর। দু'টো সাঁওতাল মাথায় কাঠের

বোঝা নিয়ে একেবারে সামনে এসে পড়েছিল। কিড়িং-কিড়িং ক'রে বেল্ বাজিয়ে তাদের পাশ কাটিয়ে খানিকটা এসে আবার শঙ্কর মুখ খোলে। তার গায়ের রাগ যেন তখনো মরেনি!

কবিত্ব ক'রে বললে, বেশ শোনায়, না! চারিদিকে ঢেউ খেলানো পাহাড়, এখানে ওখানে শাল-সেগুনের গুচ্ছ, বনের ভিতর দিয়ে এঁকে বেঁকে চলে গিয়েছে গেরুয়া রঙের পথ, নিরালা—লোকজন একেবারে নেই বললেই হয়—প্রকৃতি যেন দিবারাত্র ধ্যানমগ্ন ইত্যাদি ইত্যাদি। বল্ না, ছোটবেলায় তুই তো কবিতা লিখতিস্, আমার আবার মাথায় ওসব আসে না। জানিস্ ত আমি চিরকাল একটু কাটখোট্টা!

তারপর একটু থেমে আবার বলে, দেশ ছেড়ে, আত্মীয় বন্ধুবান্ধব ছেড়ে, কতকগুলো অশিক্ষিত জঙ্গলীদের মধ্যে পড়ে থাকা যে কি সুখ তা তোরা কি জানবি? সহসা যেন একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস চেপে নেয় শঙ্কর।

অশোক এতক্ষণ চুপ করে ভাবছিল এই শঙ্করের কথা। কলেজে তিনটে বছর তারা কি আনন্দে কাটিয়েছে। তার সঙ্গে শঙ্করের ছিল অচ্ছেদ্য বন্ধুত্ব। তারপর হঠাৎ বিধাতার অভিশাপের মত এলো তার বাপের মৃত্যু-সংবাদ। থার্ড ইয়ারে পড়লো তার পড়াশুনায় পূর্ণচ্ছেদ। অশোক চলে গেল দেশে। শঙ্করের বি. এ. পাশের খবরটা সে শুনেছিল সেখান থেকেই কিন্তু তার পরের ইতিহাস অজ্ঞাত। কালের নিষ্ঠুর নিয়মে কে কোথায় ছড়িয়ে পড়লো! তারপর হঠাৎ আজ এই সাক্ষাৎ! অশোক আজ চল্লিশ টাকা মাইনের কেরানি—অম্ল, অজীর্ণ, জর ও স্বাস্থ্যহীনতা তার একমাত্র পরিচয়!

আর শঙ্কর? হাসিতে-খুশিতে স্বাস্থ্যে-সম্পদে একেবারে ঝলমল করছে! তাই পুরানো বন্ধুকে দেখে যত আনন্দই হোক, তবু তার সঙ্গে নিজের অবস্থার তুলনা করে যেন সে একটু কুণ্ঠিতই হয়ে পড়ছিল। অথচ লেখাপড়ায় বরাবর অশোক ছিল শঙ্করের চেয়ে অনেক ভালো।...

খানিকটা পরে সেই বাংলোর সামনে এসে সাইকেলটা থামাতেই শঙ্কর ছোট ছেলের মত বাইরে থেকেই চীৎকার করে উঠলো, নীলিমা নীলিমা দেখবে এসো, অশোক এসেছে।

অশোকের বুঝতে বাকী রইল না যে নীলিমা তার স্ত্রীর নাম এবং তার কাছে শঙ্কর ইতিপূর্বেই তার সম্বন্ধে গল্প করেছিল।

নীলিমা শঙ্করের গলা পেয়েই ছুটে আসছিল কিন্তু অশোকের নাম যেই কানে যাওয়া, অমনি সে থমকে দাঁড়ালো। কি ভাব্‌লে খানিকটা, তারপর স্থির করলে

পর-পুরুষের সামনে এই রকম বেশভূষায় বেরুনো উচিত নয়। তাই চট্ ক'রে আয়নার সামনে গিয়ে একবার পাউডারের তুলিটা মুখে বুলিয়ে নিলে, এবং তাড়াতাড়ি আলমারিটা খুলে সামনে থেকে একখানা রঙিন শাড়ী বার ক'রে পরতে লাগল।

শঙ্কর অশোককে নিয়ে গিয়ে তার বৈঠকখানায় বসালে। ঘরখানি যেমন সুসজ্জিত তেমনি রুচি-সম্পন্ন। মেঝেয় কার্পেট পাতা, গদি-মোড়া সোফা-কাউচ চারিপাশে, জানালায় দরজায় রঙিন পর্দা, দেওয়ালে বড় বড় বিলিতী ছবি, ঘরের মধ্যে কাঁচের টবে বিলিতী ফুল ফুটে রয়েছে।

বন্ধুর এই বিলাসিতা দেখে অশোক আরো ঘাবড়ে গেল। ঠিক এই রকম স্টাইলে যে শঙ্কর বাস করে সেটা সে আগে বুঝতে পারে নি—তাহ'লে হয়ত একেবারেই আসতো না। অশোকের মনের অবস্থা যখন এই রকম, তখন বড় বড় লোমে ঢাকা একটা ছোট্ট কুকুর ঘরের ভেতর থেকে ছুটে এসে তার পা-টা শুঁকতে লাগল।

শঙ্কর বললে, ভয় নেই, কামড়াবে না। এই বলে ছবার শিশ্ দিয়ে কুকুরটাকে ডাকলে, জিমি-জিমি—

কুকুরটা এক লাফে একেবারে মনিবের কোলের ওপর গিয়ে চড়ল, তারপর তার লম্বা জিবটা বার করে বারকয়েক মনিবের হাতটা চেটে দিলে।

শঙ্কর কুকুরটাকে কোল থেকে নামিয়ে দিতে দিতে বললে, ওগো তুমি কোথায়? দেখে যাও কে এসেছে!

নীলিমা তখন শাড়ীটা খুলে ফেলে আবার পরছিল। তাড়াতাড়িতে সেটা পায়ের এত ওপরে উঠে পড়েছিল যে চলবার সময় আয়নার ভেতর দিয়ে তার দিকে লক্ষ্য পড়তেই সে নিজের মনেই বলে উঠলো, মাগো কি বিচ্ছিরি দেখাচ্ছে!

এদিকে শঙ্করের এই ব্যস্ততা দেখে অশোক মনে মনে লজ্জিত হয়ে পড়ছিল! সে বললে, তুই এত ব্যস্ত হচ্ছিস্ কেন? আসছে রে বাবা, না হয় একটু দেরিই হয়েছে—আমি ত আর পালাচ্ছি না!

না না, দেরিই বা হবে কেন? বলতে বলতে আরো ব্যস্ত হয়ে শঙ্কর একেবারে ঘরের ভিতরে ছুটে গেল এবং নীলিমার কাছে গিয়ে তার একখানা হাত ধরে টানতে টানতে বৈঠকখানার দিকে আসতে লাগল।

আঃ, কি যে তুমি জ্বালাতন করো—ছাড়ো লক্ষ্মীটি—আমি একাই যাচ্ছি—মাইরি, তোমার বন্ধু কি মনে করবে—এই বলে নীলিমা তার স্বামীকে মিনতি জানাতে লাগল।

কিন্তু কে কার কথা শোনে! শঙ্করের কৌতুক যেন তাতে আরো বেড়ে যায়। সে নীলিমাকে একেবারে অশোকের সামনে এইভাবে নিয়ে গিয়ে হাজির করলে এবং হাসতে হাসতে পরিচয় করিয়ে দিলে—দিস্ ইজ মাই ফ্রেণ্ড, অশোক রায়। তারপর বন্ধুকে দেখিয়ে স্ত্রীকে বললে, দিস্ ইজ মাই সুইট-হার্ট, নীলিমা দেবী।

সামনে যেন একটা বজ্রপাত হলো! নীলিমার হাস্যোজ্জ্বল মুখ নিমেষে সাদা হয়ে গেল। আর অশোকও তার মুখের দিকে বিস্ময়াভিভূতের মত চেয়ে রইল! তারপরে তারা দু'জনেই শেকহ্যাণ্ড করবার জন্য দু'জনের দিকে হাত বাড়ালে কিন্তু কেউ কাউকে শেষ অবধি স্পর্শ করতে পারলে না।

এই দেখে শঙ্কর হো হো ক'রে হেসে উঠে নীলিমাকে বললে, আরে লজ্জা কি, ও আমার বাল্য-বন্ধু। আর অশোক—তুইও দেখছি লজ্জায় মেয়েদের ওপরে যাস্।

এই কথা শুনে যেন তাদের দুজনেরই চমক ভাঙ্গল। সঙ্গে সঙ্গে নীলিমা জোর করে মুখে হাসি টেনে এনে বললে, কই লজ্জা করেছি? তোমার সব তাতেই ইয়ে—।

শঙ্কর বললে, ও তোমার গেস্ট—অতিথি,—ওর সঙ্গে কোথায় তুমি যেচে আলাপ করবে—না যেন কত দিনের অচেনা—

এবার নীলিমা খিল খিল করে হেসে উঠলো। তারপর অশোকের মুখের ওপর খুশি-ভরা দু'টি চোখ রেখে বললে, দেখুন ত আপনার বন্ধু কি রকম অবুঝ। অচেনা মানুষের সঙ্গে প্রথম দর্শনেই কি একেবারে চেনা মানুষের মত ব্যবহার করা যায়!

অশোকের বুকে যেন এতক্ষণে বল ফিরে এলো। সে একটু থেমে মুখে হাসি টেনে জবাব দিলে, ঠিক বলেছেন, শঙ্করটার আর দেরি সইছে না। সব তাইতেই যেন বাড়াবাড়ি।

শঙ্কর খপ্ ক'রে অশোকের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে ফেললে, যা-যা তুই আর কথা বলিসনি—মেয়েমানুষ দেখেছিস কি অমনি লজ্জায় লাল হয়ে উঠলি—যেন এই প্রথম প্রেয়সীর সঙ্গে শুভদৃষ্টি হচ্ছে! তোর ছেলেবেলার রোগ এখনো যায়নি দেখছি।

অশোক ও নীলিমার মধ্যে মুহূর্তে একটা দৃষ্টি বিনিময় হয়ে গেল। তাদের উভয়েরই ঠোঁটের কোণে যেন একটু হাসি দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল বিদ্যুতের মত।

অশোক বললে, তা মনে ভাবতে পারলেও ত বাঁচতুম। কল্পনায় অর্ধেক সুখ, কি বলেন নীলিমা দেবী!

নিশ্চয়। বলে নীলিমাও একটু মুচকি হাসলো।

আমারও তাই মত। এই বলে সেই প্রসঙ্গটাকে শঙ্কর তৎক্ষণাৎ থামিয়ে দিয়ে বললে, আচ্ছা, এইবার তোর স্ত্রীকে চিঠিটা লিখে দে দেখি, আমি লোক দিয়ে এখনি পাঠিয়ে দিচ্ছি তোর বাসায়। লেখ্, তুই বিকেলে একেবারে এখান থেকে খেয়ে-দেয়ে যাবি—যেন সে কোন চিন্তা না করে। এই বলে শঙ্কর কাগজ ও কলম এনে অশোকের সামনে ধরলে।

অশোক বিস্মিতকণ্ঠে প্রশ্ন করে, কাকে চিঠি লিখব রে! কে ভাববে?

আহা ন্যাকা! যে তোর পথ চেয়ে বসে আছে—হয়ত বা এতক্ষণ না দেখতে পেয়ে মূর্ছাই গেল! জানো নীলিমা, তাঁর নাকি আবার এতটুকু বিরহ সহ্য হয় না! সেইজন্যে প্রথমে কিছুতেই আসতে চাইছিল না। বলে, আর একদিন যাবো। আমি জোর করে ওকে ধরে এনেছি।

নীলিমা হাস্যোজ্জ্বল মুখে বলে, ওমা তাই নাকি অশোকবাবু? তাহ'লে আমি যা বলি লিখে দিন। লিখুন বন্ধুর বউ আমাকে বন্দী ক'রে রেখেছে এখানে, তুমি নিজে না এলে কিছুতেই ছাড়বে না বলছে।

শঙ্কর স্ত্রীর এই রসিকতা শুনে উচ্চকণ্ঠে হেসে ওঠে।

অশোক হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল এবং বললে, চিঠি লিখবো কাকে, আমি ত বিয়ে করিনি। একা একটা ঘর ভাড়া নিয়ে আছি। নিজেই রেঁধে-বেড়ে খাই।

এই কথা শুনে মুহূর্তে দু'জনেই স্তব্ধ হয়ে গেল।

এর পর প্রথম কথা বললে নীলিমা। অশোকের মুখের দিকে চেয়ে বিস্মিত দৃষ্টিতে জিজ্ঞাসা করলে, ওমা তাহ'লে আপনি এখনো বিয়ে করেননি, আর কবে করবেন—বুড়ো হলে?

শঙ্কর কণ্ঠে বিদ্রূপ এনে বললে, এখনো কি 'লভ' চলছে নাকি রে? কলেজে পড়ার সময় কোন্ একটা মেয়েকে না তুই কবিতায় চিঠি লিখতিস—তার মাকে মা ব'লে খুব যাতায়াত করতিস তাদের বাড়ী, কি হলো তার?

তুমি চুপ করো। ব'লে শঙ্করকে থামিয়ে দিয়ে নীলিমা আবার আগের কথায় ফিরে আসে। বলে, কোনও মেয়েকে বুঝি আপনি ভালবাসেন! বলুন না অশোক-বাবু লক্ষীটি—আমার কাছে গোপন করবেন না!

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস চেপে নিয়ে অশোক বলে, সে কথা শুনে অন্ততঃ আপনার কোন লাভ হবে না।

ছেলেমানুষের মত হাসিতে গড়িয়ে পড়ে নীলিমা বলে, আমার লোকসান হলেও ক্ষতি নেই, তবে আপনার হয়ত কিছু লাভ হতে পারে!

তার মানে?

তার মানে ঘটকালিতে আমার কিছু হাতযশ আছে। চেষ্টা করলে, চাই কি তার সঙ্গে যাতে আপনার বিয়ে হয় তার ব্যবস্থাও করে দিতে পারি।

ধন্যবাদ! তার জন্যে অত কষ্ট আর আপনার করবার প্রয়োজন হবে না। বলে অশোক সহসা চুপ করে যায়।

কিছুক্ষণের জন্যে একটা মৌন যবনিকা এসে পড়ে। তারা তিনজনেই যেন পাথরের মত নিশ্চল হয়ে বসে থাকে!

হঠাৎ কথা বলে নীলিমা। কেন, তার বুঝি বিয়ে হয়ে গেছে? আহা বেচারা! বলে কণ্ঠে একপ্রকার সহানুভূতির সুর টেনে এনে বলে, তার বাপ-মার বুঝি আপনাকে পছন্দ হলো না? আপনার চেয়ে ভালো পাত্র বুঝি পেয়ে গেল? তা মেয়েটির ওপর আপনি রাগ করছেন কেন, তার কি দোষ বলুন ত?

অশোক বলে, আপনি আমায় ভুল বুঝছেন। এর জন্যে আমি কাউকে দোষও দিই না, কারুর ওপর রাগও করি না।

তার মানে রাগটা দেখছি আপনার তারই ওপর! সে কি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, না স্বেচ্ছায় অন্য কাউকে ভালবেসেছে, বলুন না, লক্ষ্মীটি?

বল্ না? শঙ্কর খোঁচা মারে বন্ধুকে, এখনো তোর ন্যাকামি গেল না?

অশোকের মুখে-চোখে দারুণ বিরক্তির চিহ্ন ফুটে ওঠে।

শঙ্কর এতক্ষণ নীলিমার রসিকতাটা খুব উপভোগ করছিল। এইবার একেবারে লাফিয়ে উঠে বললে, Grapes are sour! আঙুর টক্! সেই দ্রাক্ষাফল আর শৃগালের গল্পটা জানো না নীলিমা? আমাদের দেশের ছেলেদের অবস্থা সেই রকম—যাকে পায় না তার সঙ্গে হয় তাদের পবিত্র প্রেম, অর্থাৎ যে মেয়ে তাকে কাঁচকলা দেখালে তার নাম জপ করতে করতে সে ব্রহ্মচারী হয়ে বসে রইল সারাজীবন।

নীলিমা আবার অশোককে বললে, সে দিব্যি স্বামীর ঘর করছে, হয়ত ছেলেমেয়েও হয়েছে একগাদা, আর আপনি তার কথা চিন্তা করে সংসারধর্ম না ক'রে সন্ন্যাসীর মত জীবনযাপন করছেন, এটা কি ভালো? এদিকে বয়সেরও যে গাছপাথর রইল না, কবে আর বিয়ে করবেন?

শঙ্কর একটুতেই উত্তেজিত হয়ে ওঠে। তাই বক্তৃতা দেবার ভঙ্গীতে বললে, আরে মূর্খ এইটুকু বুঝিস না যে মেয়েরা চায় বলিষ্ঠ পুরুষকে, তাই যুগ যুগ ধরে তারা কেবল পৌরুষের গলায় মালা দিয়ে এসেছে।

হিয়ার! হিয়ার! ব'লে হাততালি দিয়ে উঠলো অশোক। তারপর গলাটা

একটু খাটো করে বললে, বন্ধু, বক্তৃতা দেবার সময় কথাগুলো বেশ শোনায় কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে তার কি পরিণাম হয়, একবার ভেবে দেখেছ কি ?

হ্যা-হ্যা দেখেছি, হবে আবার কি ? সবাই ত আর তোর মত কাপুরুষ নয় ! বলে শঙ্কর বুকটাকে একটু চিতিয়ে দিলে।

হাসতে হাসতে অশোক বললে, ধরো, আমি যদি এই মুহূর্তে বলি নীলিমাদেবীকে আমার চাই। আর তার জন্যে পৃথিবী দূরে থাক, কেবল তোর বিরুদ্ধে দাঁড়াই, তাহ'লে সংসারটা কেমন হয়ে ওঠে বল্ দেখি ?

নীলিমা সকলের অজ্ঞাতে যেন একটু শিউরে ওঠে। তারপর মুখ টিপে ঈষৎ হেসে বলে, কেমন জব্দ হয়েছো অশোকবাবুর কাছে—দাও এবার জবাব !

শঙ্কর তেমনিভাবে বলে, আমি তাতে বিন্দুমাত্র দুঃখিত হবো না। যেখানে সত্যিকারের চাওয়া, সেখানে যে পৃথিবীর কোন শক্তি বাধা দিতে পারে না, একথা আমি জানি ভাল করেই।

নীলিমার মুখ নিমেষে যেন রক্তশূন্য হয়ে ওঠে, কিন্তু তখনি আবার সেটা গোপন করে নেয় তবে সে বুঝি অশোকের চোখকে ফাঁকি দিতে পাবে না—সেটুকুও ধরা পড়ে যায় সেখানে। দ্রুত আড়চোখে একবার তার মুখের দিকে চোখ তুলেই সঙ্গে সঙ্গে নামিয়ে নিয়ে প্রশ্ন করে, তাহ'লে প্রেম বলে কি কিছু নেই পৃথিবীতে ? আপনি কি বলেন নীলিমা দেবী ?

রহস্যময় হাসি হেসে ওঠে নীলিমা। বলে, বাবা, নেই বলবার উপায় আছে ? যখন তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ আপনি নিজে !

অশোক আর একবার গম্ভীর হয়ে যায়। তারপর একটু ভেবে বলে, হ্যাঁ, আমি বিশ্বাস করি প্রেম অমর, সত্যিকারের ভালোবাসা কখনো মরে না—হোক না তার বিয়ে, হোক না সে অন্যের স্ত্রী, তবুও আমার কাছে সে প্রথম দিন যেমন ছিল, আজো তেমনি আছে।

শঙ্কর বললে, দেখলে নীলিমা, আমি ঠিক বলেছি। কলেজে পড়বার সময় ও একটা মেয়েকে খুব ভালবাসতো, তাকে আজও ভুলতে পারেনি !

নীলিমা আবার হাসি চাপতে চাপতে বলে, হ্যাঁ অশোকবাবু, ওঁর কথাটি কি তাহ'লে সত্যি—বলি পাত্রীটি সে-ই আছে, না ইতিমধ্যে আবার নতুন কেউ সেস্থান অধিকার করেছে।

অশোক এর প্রতিবাদ জানায় দৃঢ়তার সঙ্গে, সে-ই প্রথম ও সে-ই শেষ। জীবনে মানুষ একজনকেই ভালবাসতে পারে বলে আমার বিশ্বাস। এই বলে গলাটা আর

একটু নামিয়ে সে আবার প্রশ্ন করে, আচ্ছা নীলিমাদেবী, মেয়েরা কি সত্যি বিয়ের পর সব ভুলে যায়?

সঙ্গে সঙ্গে নীলিমার চোখমুখের চেহারা কেমন এক অদ্ভুত ভাব ধারণ করে। যার দৃষ্টি আছে সে বুঝতে পারে যেন তার মন বলতে চায়—'কক্ষনো নয়।' আবার কিসের সঙ্কোচ এসে জিবকে টেনে ধরতে চায়! সে তাড়াতাড়ি মুখে একটা কৃত্রিম হাসি এনে তাকে চাপা দিয়ে অন্য কথা পাড়ে,—কেন, এখনো সে আপনাকে ভালবাসে কিনা তাই মিলিয়ে দেখবেন? বলতে বলতে অকস্মাৎ সে উঠে দাঁড়ালো।

অশোক বললে, পালালে হবে না, আমার কথাটার উত্তর দিয়ে যান।

নীলিমা বললে, মহারাজ এখনো আপনার খাবার দিয়ে গেল না কেন আগে দেখে আসি—সেই কোন্ সকালে আপনি বেরিয়েছেন! আপনার নিশ্চয়ই এখন খুব ক্ষিদে পেয়েছে।

শঙ্কর এতক্ষণ অশোকের এই কথা শুনে হো হো করে হাসছিল। এবার বললে, আচ্ছা, ওর হয়ে আমি উত্তর দিচ্ছি, শোন। হ্যাঁ, মেয়েরা সব ভুলে যায়, তারা তোমার মত আহাম্মক নয়—হয়েছে?

নীলিমা এইবার একটা উচ্চ হাসির তরঙ্গ তুলে ভিতরে চলে গেল। সে হাসি কিন্তু দু'জনের মনে দু'রকমের ভাব জাগালে। শঙ্কর ভাবলে, নীলিমা তাকেই সমর্থন করলে, আবার অশোকের মনে হলো বুঝি শঙ্করের এই যুক্তিটা এমনি মিথ্যা যে সে হেসে উড়িয়ে দিলে।

খাওয়া দাওয়ার পর শঙ্কর ও নীলিমা অশোককে তাদের ওখানেই এসে উঠতে অনুরোধ জানালে কিন্তু সে কিছুতেই রাজী হলো না। নীলিমা বললে, একা মানুষ হাত পুড়িয়ে এমনি ক'রে নিজে রেঁধে খাবার কি দরকার, যখন আমি রয়েছি এখানে!

অশোক জবাব দেয়, একটা ঘর যখন ভাড়া করে ফেলেছি তখন এবারকার মত থাক—এর পরে যখন আসবো তখন একেবারে আপনার এখানেই এসে ওঠা যাবে! তা ছাড়া, আর ক'টা দিনই বা এখানে আছি, ছুটি তো ফুরিয়ে এলো।

আরো কিছুদিন ছুটির জন্যে সে যে অফিসে দরখাস্ত পাঠিয়েছিল সে কথাটা তখন অশোক একেবারে চেপে গেল। কেন, তা সে-ই জানে!

শঙ্কর অভিমান ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলে, থাক্ থাক্, ওকে আর সেধো না। আমরা বড়-

লোক—এখানে থাকলে ওর মান যাবে!

নীলিমা তখন কথাটাকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিলে, কিন্তু রবিবার দিনটার কথা যেন ভুলবেন না। শুধু খাওয়া-দাওয়া নয়, রাত্তিরটাও এখানে থাকতে হবে। কেন না এ অঞ্চলে বড় বাঘের ভয়—সন্ধ্যের পর কেউ রাস্তায় বেরোয় না—অথচ রাত্তিরের খাওয়াটা বিকেলেও ত খাওয়া যায় না! কাজেই সব বন্দোবস্ত করে রেখে একেবারে ভোরে উঠেই এখানে চলে আসবেন কিন্তু!

অশোক সম্মতি জানিয়ে বিদায় নিলে।

রবিবার দিন নীলিমা ভোর থেকেই নানারকম খাদ্যের আয়োজন করতে লাগল। জঙ্গলে থাকে তারা! সেখানে বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় না। তাই আগের দিন থেকে দুধ আনিয়ে ছানা কাটিয়ে, ক্ষীর ক'রে—পানতুয়া, সন্দেশ, পেঁড়া, রাবড়ি আরো কত কি তৈরী করে রেখেছিল। মিষ্টি খেতে অশোক নাকি খুব ভালবাসে! তাছাড়া তিন চার রকমের মাংসই রাঁধলে। আবার অশোক 'ফাউল' খায় না বলে নীলিমা পাঠালে পাখী শিকার করতে।

শঙ্কর বলে, হ্যা তুমিও যেমন, এমন ক'রে ফাউল রেঁধে দেবো যে অশোকের সাধ্য নেই ধরতে পাবে।

নীলিমা বলে, ও আমার দ্বারা হবে না। মানুষ যা খায় না, তাকে গোপন ক'রে সেটা খাওয়াতে আমি পারব না। আর দরকার কি এত জোর করে খাওয়াবার বাপু, যখন তার প্রবৃত্তি হয় না?

শঙ্কর চটে উঠে বলে, তুমিই কি আগে খেতে? কত কাণ্ড ক'রে তোমায় ধরিয়েছি ভেবে দেখো দেখি!

খুব কীর্তি করেছ—সকলে ত আর আমি নয়! বলে মুখে রাগ দেখাতে গিয়ে নীলিমা হেসে ফেললে।

সকালেই অশোকের আসবার কথা, কিন্তু দশটা বেজে যাবার পরও সে এলো না দেখে নীলিমা আর চুপ ক'রে থাকতে পারলে না। শঙ্করকে পাঠালে তার খোঁজে।

সাইকেল নিয়ে শঙ্কর তখনই ছুটলো।

নীলিমা মধ্যে মধ্যে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তার দিকটা দেখে যাচ্ছিল। ঘণ্টা দুই পরে শঙ্কর একা ফিরে এলো! নীলিমা ব্যাকুলকণ্ঠে প্রশ্ন করলে,

তোমার বন্ধু কই?

কাল থেকে তার জ্বর হয়েছে—এখনো রীতিমত জ্বর রয়েছে—তাই আসতে পারলে না।

এই খবরে নীলিমার মুখ গেল শুকিয়ে। সে বললে, কিন্তু তাকে তুমি সেখানে একলাই বা ফেলে রেখে এলে কার ভরসায়?

শঙ্কর বললে, কিন্তু কিছুতেই যে সে আসতে চাইলে না। ভারি একগুঁয়ে। আমি কি এখানে আনবার জন্যে কম চেষ্টা করেছি!

নীলিমা আরো কি বলতে যাচ্ছিল কিন্তু পারলে না। প্রাণপণে ওষ্ঠকে সংযত করে দূরে একটা পাহাড়ের মাথার দিকে তাকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। শঙ্করও স্ত্রীর পাশে তেমনিভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবার পর বল্লে, আচ্ছা এখানে সে কিছুতেই থাকতে চায় না কেন বলতে পারো? সেদিন অত সাধাসাধি করলুম, আজও কত করলুম। একা নিজে রেঁধে খায় 'কুকারে', তবু আমাদের এখানে থাকতে কিসের যে আপত্তি ভেবেই পাই না। কি যেন একটা মনের মধ্যে সে চেপে রেখেছে—আমি অনেক জেরা করেও ধরতে পারলুম না, তুমি যদি চেষ্টা কর তাহ'লে হয়ত একটু ভুলিয়ে-ভালিয়ে তার কাছ থেকে আসল কথাটা বার করে নিতে পারো এই আমার বিশ্বাস।

নীলিমা বললে, তোমার বাল্যবন্ধু, তুমিই যখন পারলে না, তখন আমাকেই বা সে বলতে যাবে কেন?

না-না বলতে যাবে কেন, তবে কি জানো, কোন কৌশল করে যদি তুমি কথাটা বার ক'রে নিতে পারো, বলছিলুম।

নীলিমা তখন বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে উত্তর দেয়, তোমার বন্ধুটি বাপু মানুষ ভালো নয়! তা নাহ'লে একা এই অসুখ নিয়ে বিদেশে মানুষ আপনার লোকের কাছে না এসে সেখানে থাকে কোন্ সুখে? একটু দুধ-সাগু করে দিতে হলেও ত একটা লোকের দরকার! বোধহয় কাল রাত থেকেই উপবাস চলছে—যা ইচ্ছে করগে, আমার বয়ে গেছে! শেষের কথাগুলো কতকটা যেন আপন মনেই বলতে বলতে নীলিমা রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলো।

মুহূর্তে যেন সব লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। এত কষ্টের তৈরী খাবার-দাবার নীলিমার আর মুখে তুলতে ইচ্ছা করে না। না খেলে নয়, তাই কোন রকমে দু'-একটা গালে দিয়ে সে উঠে পড়লো। বাকী খাবারগুলো চাকরবাকরদের ডেকে সব বিলিয়ে দিলে।

দুপুর বেলা ভুরিভোজনের পর শঙ্কর নাক ডাকাচ্ছিল।

নীলিমা একটা পান গালে দিয়ে তার পাশে এসে শুলো। আঙুলের ডগা দিয়ে শঙ্করের পিঠের মাঝে দু'-একটা ঘামাচি খুঁটে দিতে দিতে বললে, তুমি ঘুমলে নাকি!

শঙ্কর তৎক্ষণাৎ নাক ডাকানো থামিয়ে উত্তর দিলে, হাঁ।

নীলিমা তখন একটু ইতস্তত করে বললে, দেখো এক কাজ করলে কি হয়, একটা টাঙ্গা করে যদি আমি তোমার সঙ্গে গিয়ে আর একবার অশোকবাবুকে এখানে আনবার জন্যে চেষ্টা করি?

শঙ্কর সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসলো। খুব ভালো হয়, আমি ঠিক সেই কথাই তোমাকে বলবো ভেবেছিলুম। কিন্তু পাছে তুমি যেতে আপত্তি করো তাই—

নীলিমা হেসে উঠে বললে, ওঃ তাই বুঝি এতক্ষণ নাক ডাকাচ্ছিলে।

এবারও অশোক আপত্তি তুললে কিন্তু নীলিমার জবরদস্ত অনুরোধের কাছে সব ভেসে গেল। অগত্যা স্যুটকেস, কুকার ও বিছানা সমেত অশোককে ভাল ছেলের মত একেবারে সুড় সুড় ক'রে গাড়ীতে এসে উঠতে হলো।

নীলিমার এই কৃতিত্ব দেখে সব চেয়ে খুশী হলো শঙ্কর।

যাবার আগে নীলিমা ভালো ক'রে একটা বিছানা পাশের ঘরে পেতে রেখে গিয়েছিল। বাড়ীতে পা দিয়েই সে প্রথমে অশোককে সেখানে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিলে, তারপর তাড়াতাড়ি খানিকটা দুধ গরম করে এনে খাইয়ে নিজের ট্রাঙ্ক খুলে একখানা ভাল শাল বার করে তার গায়ে বেশ করে ঢাকা দিয়ে দিলে।

অশোক এতক্ষণ কিছু বলেনি, এইবার প্রথম কথা বললে—আমার আলোয়ান ত রয়েছে, আবার একটা চাপাচ্ছেন কেন?

নীলিমা মুচকি হেসে বললে, কেন আমার আলোয়ানটা বুঝি আপনার গায়ে ফুটছে?

অশোকের ঠোঁটের কোণে ঈষৎ ম্লান হাসি দেখা দিয়েই আবার মিলিয়ে গেল।

নীলিমা বললে, কি, ফেলে দিলেন না ওটা গা থেকে?

অশোক বললে, আপনি যখন দিয়েছেন তখন কি আর ফেলে দিতে পারি?

খিল খিল করে হেসে উঠে নীলিমা বললে, তবু ভালো! এ কথাটা কি অসুখ সেরে গেলেও মনে থাকবে আপনার?

শঙ্কর সেইখানেই দাঁড়িয়ে ছিল এবং তাদের আলাপ-আলোচনার মধ্যে মধ্যে যোগ দিচ্ছিল। সে বললে, জানিস অশোক, নীলিমা বলে, তোমার বন্ধুটি একে-বারেই ভাল নয়। এই বলে হো হো ক'রে হেসে উঠলো—প্রাণখোলা সাদা হাসি।

এই কথা শুনে নীলিমা একটুও অপ্রস্তুত না হয়ে বললে, হ্যাঁ বলেছি ত, ভয় নাকি?···বলি এত সাধ্যসাধনা করলে এতদিন ভগবান বোধ হয় নিজে এসে বাড়ীতে দেখা দিয়ে যেতো।

এমনি করে নীলিমার সেবায় ও শঙ্করের যত্নে অশোক অল্পদিনের মধ্যেই ভালো হয়ে উঠলো। নীলিমা তখন বললে, এখান থেকে কিন্তু আপনাকে আর কোথাও যেতে দেবো না।

অশোক হেসে উঠলো, কথাটা যদি লিখে-পড়ে দেন ত বেঁচে যাই। এমন সেবা যত্ন ছেড়ে, কার আর যেতে ইচ্ছা করে, বলুন?

শঙ্কর বললে, বাস্তবিক অশোক, ঠাট্টা নয়—বেশ সুস্থ না হলে আমি তোকে এখান থেকে এক পা কোথাও নড়তে দেবো না। মনে থাকে যেন।

অশোক বললে, তার চেয়ে বল না কেন, চাকরিবাকরি ছেড়ে দিয়ে এখানেই বসে থাকি!

নীলিমা আড়চোখে একবার তাকিয়ে বললে,তাহ'লে ত বেশ ভাল হয়—আমার কেরাম খেলার একটা সঙ্গী পাই।

তখনো অশোকের এক মাস ছুটি ছিল। তার দরখাস্ত সাহেব মঞ্জুর ক'রে সেখানে পাঠিয়ে দিয়েছিল।

পশ্চিমের এই জায়গাটা একে জল-হাওয়ার জন্য বিখ্যাত, তার ওপর আবার বন্ধুর বাড়ীর আদর-যত্ন পেয়ে অশোকের স্বাস্থ্য অসম্ভব রকম দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হতে লাগল।

এই সময় একদিন স্বাস্থ্য প্রসঙ্গে কথা উঠতে শঙ্কর নীলিমাকে বললে, জানো, কলেজে পড়ার সময় অশোকের ঠিক এখনকার মত চেহারা ছিল।

নীলিমা অমনি খপ ক'রে বলে উঠলো, আহা, তখন বুঝি ইনি এত মোটা ছিলেন!

ঈষৎ হেসে শঙ্কর বললে, ছিল কিনা তা তুমি কি করে জানলে?

একটুও ইতস্তত না করে সে জবাব দিলে বা-রে, বারো-তেরোবছর আগে!!

অশোকবাবু ত ছিলেন ছেলেমানুষ, তখন তাঁর পক্ষে কি করে এত মোটা হওয়া সম্ভব ?

শঙ্কর বললে, কি রকম 'বারবেল' ভাঁজতো জিজ্ঞেস করো না ? রীতিমত পালোয়ান ছিল ও তখন।

নীলিমা এবার রসিকতায় উছলে উঠলো, বাব্‌বা, তাহ'লে পালোয়ানি বিদ্যেটাও শেখা হ'য়েছিল···তবুও জোর করে কেড়ে আনতে পারলেন না আপনার প্রিয়তমাকে ? হায়, ধিক আপনার পালোয়ানিতে !

অশোক বললে, এ বিষয়ে আমি একেবারে মহাত্মা গান্ধীর শিষ্য—অহিংস আমার সংগ্রাম !

এইবার নীলিমা সশব্দে হেসে উঠে বললে, তাহ'লেই হয়েছে। গান্ধীর মত শুধু সংগ্রামই ক'রে যাবেন, স্বাধীনতা আর কোনদিন চোখে দেখতে হবে না !

শঙ্কর বলে, ভেরি গুড্‌ ! দেখ্‌ অশোক, নীলিমা রাজনীতি যা বোঝে আমাদের দেশের পাকা মাথাওয়ালা কংগ্রেস নেতাদের মগজেও তা ঢোকে না, কেন বলতে পারিস ?

অশোক হেঁসে জবাব দেয়, তাদের মাথা ঠিক নীলিমা দেবীর মত নয় বলে।

তারপর রাজনৈতিক আলোচনা শুরু হয় !

বেড়াতে গিয়েও এক-একদিন এই রকম এক-একটা বিষয় নিয়ে দুই বন্ধুতে মেতে উঠতো। নীলিমা যে একেবারে চুপ করে থাকতো তা নয়, মধ্যে মধ্যে সেও যোগ দিত তাদের সঙ্গে। তবে এই কচকচি যেদিন একেবারে তার অসহ্য হয়ে উঠতো, সে বলতো তোমরা থামবে না আমি বাড়ী চলে যাবো ? বাবা, একটু বেড়াতে এসেও যদি শান্তি আছে !

তারা তিনজনে প্রায়ই বিকেলের দিকে বেলা থাকতেই একত্রে বেড়াতে বেরুত। পাহাড়ের মধ্যে একটা জায়গা ছিল নীলিমার খুব প্রিয়—বেড়াতে বেড়াতে পরিশ্রান্ত হলে সেইখানে গিয়ে তারা একটু বিশ্রাম করতো। ছোট্ট একটা পাহাড়ে নদীর একেবারে কোল ঘেঁষে একটা মোটা গাছের ডাল ভেঙে পড়েছিল বেঞ্চির মতন। তার ওপরে গিয়ে তারা তিনজনে বসে থাকতো। নদীর মৃদু কলধ্বনি অবিরাম সেই গাছপালা ও পাহাড়ের বুকে গুঞ্জরিত হতে হতে দূর থেকে দূরান্তরে মিলিয়ে যেত—তারা চুপ করে তাই শুনতো।

সহসা একদিন নীলিমা অশোককে অনুরোধ ক'রে বসলো একটা গান গাইবার জন্যে।

শঙ্কর একেবারে লাফিয়ে উঠলো—হ্যাঁরে, তুই আবার গান গাইতে জানিস নাকি? তারপর নীলিমার মুখের দিকে চেয়ে বললে, হ্যাঁগো, তুমি কি করে জানলে ও গান জানে?

তোমার মত সবাই কাঠখোট্টা গোঁয়ারগোবিন্দ নয়—যারা গান জানে তাদের মুখ দেখলেই বোঝা যায়। বলে জোর করে নীলিমা আবার একটু হাসি টেনে আনলে তার ঠোঁটের কোণে।

প্রকৃতির প্রভাবে তখন সকলের মন এমন ভাবপ্রবণ হয়ে উঠেছিল যে কথায় নয়, সুরের ভিতরেই যেন তারা সবাই ভাষা খুঁজছিল। তাই অশোককে আর বেশী অনুরোধ করতে হলো না, সে সঙ্গে সঙ্গে সম্মতি জ্ঞাপন করলে।

অশোক গায়ক নয়। তবে তার গলাটা মিষ্টি বলে আত্মীয়স্বজন ও মেয়েমহলে একদিন তার খুব খ্যাতি ছিল। অকস্মাৎ সেই কথাটা শঙ্করের মনে পড়ে যেতে সে নিজের কাছেই যেন লজ্জিত হয়ে পড়লো—অশোক তার বন্ধু, এ প্রস্তাবটা আগে তারই কাছ থেকে আসা উচিত ছিল। শঙ্কর তাই অত্যন্ত আগ্রহ দেখিয়ে বললে, তুই যে গান গাইতে জানিস সত্যি আমি সেকথাটা ভুলেই গিয়েছিলুম। আচ্ছা, এখন একটা খুব ভাল দেখে গান ধর দেখি।

অশোক গান ধরলো—

একদা তুমি প্রিয়ে, আমারি এ তরুমূলে
সেজেছো ফুলসাজে—সে কথা কি গেছ ভুলে।
সেথা যে বহে নদী নিরবধি, সে ভোলেনি—
তারি সে স্রোতে-আঁকা আঁকা-বাঁকা তব বেণী
তোমারি পদরেখা আছে লেখা তারি কূলে
আজি কি সবই ফাঁকি? সে কথা কি গেছ ভুলে?…

গান শেষ হলো যখন, কারো মুখে কোন কথা নেই। সুরের সঙ্গে বাণীর এবং তার সঙ্গে প্রকৃতির এমন অদ্ভুত সমন্বয় হয়েছিল যে তিনজনেই বুঝি তখন তার প্রভাবে মুহ্যমান হয়ে পড়েছিল।

তবু প্রথম কথা বললে শঙ্কর—কি যে মেয়েলী সুরে গান গাস্, ভাল লাগে না। পুরুষের কণ্ঠ হবে উদাত্ত, সাতটি সুর সেখানে খেলবে সিংহনাদের মত—তা নয়, এই প্যানপেনে সুরের গান শুনলে আমার গা জ্বলে যায়।

অশোক বলে, জানিস এটা রবি ঠাকুরের একটা বিখ্যাত গান?

আরে রেখে দে তোর রবি ঠাকুর। এই রবি ঠাকুরই ত উচ্ছন্ন দিলে দেশটাকে।

সমস্ত জাতটা 'এফিমিনেট' হয়ে গেল। তাই বাঙ্গালীর দ্বারা আর কিছুই হয় না—তারা শুধু কাঁদতে জানে।

হ্যাঁ, তোমার মত হো হো করে হাসতে পারে না। তুমি থামো দেখি একটু—দু'দণ্ড যে শান্তিতে গান শুনবো তারও উপায় নেই—গায়ের জোর চাই ওর সর্বত্র! ব'লে একরকম ধমক দিয়ে শঙ্করকে নীলিমা তৎক্ষণাৎ চুপ করিয়ে দিলো।

অশোকের ছুটির তখনো সাত দিন বাকী। নীলিমা শঙ্করকে বললে, হ্যাঁগো, তোমার অফিসে একটা লোক নেবে বলেছিলে, তা অশোকবাবু কি সে-চাকরিটা করতে পারবে না? এখানে ত মাইনে আশি টাকা দেবে বলছো, আর উনি পান কলকাতায় মাত্র পঁয়তাল্লিশ টাকা! তাও নাকি আট বছরে বেড়ে ওই হয়েছে।

শঙ্কর বলে, আমিও ঠিক ওই কথাটাই তোমায় বলবো ভাবছিলুম।

অশোক প্রথমটা এ প্রস্তাবে রাজি হয়নি। শেষে নীলিমা জোর ক'রে তাকে রাজি করালে। বললে, সংসারে আপনার আপন বলতে যখন কেউ নেই তখন এখানেই থাকুন না কেন—তবু ত আমরা রয়েছি। বন্ধু কি আপনার পর! আপনি আমাদের আপন না ভাবতে পারেন কিন্তু আমরা ত তা পারি না। শঙ্করও আর এবার চুপ করে থাকতে পারলে না। নীলিমার সঙ্গে বেশ দু' কথা শুনিয়ে দিলে তাকে।

অগত্যা অশোক সেইখানেই চাকরি নিলে।

অশোকের আবার নতুন জীবনযাত্রা শুরু হলো।

শঙ্কর আর সে প্রত্যহই একসঙ্গে চাকরি করতে যায়। নীলিমা তাদের উভয়ের স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে সমান নজর রাখে, কোথাও কোন ত্রুটি হতে দেয় না।

এমনি করে কিছুদিন কাটবার পর শঙ্কর বন্ধুর বিয়ের জন্য হঠাৎ ক্ষেপে উঠলো। ওর মাথায় যখন যে কথাটা যায় তখনি তা নিয়ে এইভাবে মেতে ওঠা যে ওর স্বভাব, তা অশোক জানতো না। শহরে যে বাঙ্গালী ডাক্তার ছিল একদিন চা খেতে গিয়ে তাঁর সুন্দরী শ্যালিকাকে দেখে সে একেবারে পাকা কথা দিয়ে এলো।

কিন্তু অশোক বেঁকে বসলো বিয়ে করবো না বলে। শঙ্কর তাকে অনেক অনুরোধ উপরোধ করলে তবু সে কিছুতেই সম্মত হলো না। তখন শঙ্কর নীলিমার ওপর ভার দিলে।

নীলিমাও তাকে অনেক বোঝালে কিন্তু অশোক সেই এক গোঁ ধরে বসে রইল।

অবশেষে অনেক বাদানুবাদের পর এই সিদ্ধান্তে তারা উপনীত হলো যে নীলিমা যদি নিজে মেয়ে দেখে পছন্দ করে তাহ'লে হবে।

শঙ্কর মনে মনে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। সে জানতো আগের মত এবারেও নীলিমার হাতেই তার পরাজয় ঘটবে।

কিন্তু মেয়ে দেখে এসে নীলিমা যখন বললে তার পছন্দ হয়নি, তখন শঙ্কর রীতিমত বিস্মিত হলো বৈকি। সে বললে, এমন মেয়ে তোমার পছন্দ হলো না? যেমন ধবধবে রঙ্, তেমনি নাক-মুখ-চোখ। তাছাড়া ভালো গান গাইতে পারে, লেখাপড়াও ভালো জানে—ম্যাট্রিক ক্লাস পর্যন্ত পড়েছে! আর শুধু তাই নয়, রান্নাবান্নায় গৃহস্থালির কাজেও নাকি পাকা গিন্নীকে হার মানিয়ে দেয়—তার ওপর আবার ভাল টাকা দেবে বলছে, তবুও তোমার পছন্দ হলো না কেন বুঝতে পারছি না!

নীলিমা বললে, টাকাকড়ি আর রূপ-গুণই ত মেয়েছেলের সব নয়!

তবে এছাড়া আর কি তোমার চাই? এই বলে উত্তরের অপেক্ষায় সাগ্রহে শঙ্কর নীলিমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

যাই বলো বড় বেহায়া বাপু মেয়েটি—ওকে নিয়ে তোমার বন্ধু যে সুখে ঘর করতে পারবে ব'লে মনে হয় না। এই বলে এক কথায় রায় দিয়ে নীলিমা নিজের কাজে চলে গেল।

শঙ্কর হতভম্বের মত শুধু তার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

সেদিন অশোক একা বেড়াতে গিয়েছিল। তখনো বেশ বেলা রয়েছে। বাড়ী ফিরে একেবারে নীলিমার ঘরে এসে শঙ্করের চেয়ারটা তার কাছে টেনে নিয়ে বসলো। নীলিমা তখন পান সাজছিল, আর শঙ্কর একটা বই মুখে করে বিছানায় শুয়েছিল। একটা পানের খিলিতে লবঙ্গ গুঁজতে গুঁজতে নীলিমা বললে, আপনার বরাতে নেই তা আমি কি করবো বলুন? আপনাকে ত আমি ভাল করেই চিনি, শেষে কিছু একটা হলে আমার ঘাড়ে সব দোষ চাপাবেন। এইজন্যে কখনো কারও বিয়ের ব্যাপারে থাকতে নেই।

এই কথা শুনে অশোকের মন থেকে যেন একটা দুশ্চিন্তার পাষাণভার নেমে গেল। তার মনে ভয় ছিল যদি নীলিমার পছন্দ হয়ে যায়! তাই এই মুক্তির আনন্দ চাপতে না পেরে সে বলে উঠলো, এই জন্যেই ত আপনার ওপর ভার দিয়েছিলুম—শঙ্করের মতামতের ওপর আমার একটুও আস্থা নেই, কুমারী মেয়ে দেখলেই ওর পছন্দ হয়ে যায়।

এই বলে তারা দু'জনেই এক সঙ্গে উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলো। শঙ্কর কিন্তু এই হাসিতে যোগ দিতে পারলে না, শুধু মুখ তুলে একবার 'হুঁ' বলেই আবার পাঠে মনোনিবেশ করলে।

এর পরে এক দিন হঠাৎ অশোক আবার জ্বরে বেহুঁশ হয়ে পড়লো। নীলিমা চুপি চুপি শঙ্করকে ডেকে বললে, ওঃ, গা পুড়ে যাচ্ছে, বোধহয় চার কি পাঁচ হবে জ্বর। তুমি ডাক্তারের কাছে খবর পাঠাও।

শঙ্কর বললে, আমি ওর থার্মোমিটারটা ঘর থেকে নিয়ে এসে জ্বরটা দেখছি; তুমি ততক্ষণ কপালে জলপটি দিয়ে হাওয়া করো।

অশোক থার্মোমিটার ও কয়েকটা হোমিওপ্যাথী ওষুধ সদাসর্বদা নিজের কাছে রাখতো। শঙ্কর তার সুটকেসটা খুলে থার্মোমিটার খুঁজতে লাগল। ইতিপূর্বে কোন দিন সে অশোকের জিনিসপত্রে হাত দেয়নি, কোথায় কি আছে তাও সে জানতো না। তাছাড়া সুটকেস তনয় যেন একটা মনিহারির দোকান, তাতে কি নেই? তালা চাবি, ছুঁচ সুতো, টর্চলাইট, বাতি, দেশলাই, ছুরি, দাড়ি কামানোর সেট, খানকতক বই, পুরানো চিঠিপত্র, একটা কাঁচের গেলাস, আর তার সঙ্গে কতকগুলো জামা কাপড় তাল গোল পাকিয়ে একাকার হয়ে আছে। শঙ্কর হাতড়াতে লাগলো তার মধ্যে। কোথায় থার্মোমিটার? এটা দেখে সেটা দেখে। হঠাৎ একটা জামার নীচে খুঁজতে গিয়ে সে দেখলে সুটকেসের একেবারে তলায় যে খবরের কাগজ পাতা ছিল তার একটা কোণ ছেঁড়া এবং তার ভেতর থেকে দেখা যাচ্ছে একটা ফটোর মত কি বস্তু।

শঙ্কর সেটাকে খুব সাবধানে বার করলে।

একি! এ যে নীলিমার ফটো! তার বুকের মধ্যেটা ধড়াস্ ধড়াস্ করে উঠলো। তখন তাড়াতাড়ি ফটোটা ওলটাতেই দেখলে ফটোর পিছনে এক জায়গায় ছোট্ট ক'রে লেখা রয়েছে, অশোকদাকে দিলুম। তারিখ বছর এগারো আগের। লেখাটাও প্রায় বিবর্ণ হয়ে এসেছে।

তবে কি এই নীলিমাকেই সে একদিন ভালবেসেছিল!···তারই জন্যে বিয়ে করেনি!···এই চিন্তা মাথায় যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম দিনের সাক্ষাৎ থেকে সেদিন পর্যন্ত তাদের উভয়ের কার্যকলাপ ও আলাপ-আলোচনা সমস্ত তার চোখের সামনে যেন সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো।

শঙ্কর আর ভাবতে পারলে না, তার মাথাটা কেমন গুলিয়ে যেতে লাগল। নিঃশব্দে সেই ফটোখানাকে হাতে ক'রে সে তখন নিজের ঘরে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরে নীলিমা ঝড়ের মত ঘরে ঢুকে বললে, তুমি ত খুব বন্ধু দেখছি—আমি বলি বুঝি থার্মোমিটার আনতে গেছ—তা নয় চুপচাপ এখানে বসে রয়েছো?

তার উত্তরে শঙ্কর শুধু গম্ভীর কণ্ঠে বললে, থার্মোমিটার পেলুম না তা কি করবো—

পেলে না যে, সে কথাটা আমায় গিয়ে বলে আসতে কি হয়েছিল? মানুষটা রোগের জ্বালায় কি রকম ছট্‌ফট্‌ করছে—কোথায় তার কাছে একটু বসবে, না—আচ্ছা থাক।

নীলিমা কতকটা যেন রাগ করেই চলে গেল।

নীলিমার এই অতি-ব্যস্ততা দেখে রাগে শঙ্করের সমস্ত দেহ জ্বালা করতে লাগল। একবার তার ইচ্ছা হলো যে বলে, বিনা রোগে অশোকের চেয়েও তার মনটা সহস্র গুণ বেশী জ্বলছে তার খবর কে রাখে? কিন্তু সে কথা সে কিছুতেই মুখে উচ্চারণ করতে পারলে না! নীলিমাকে শুধু সে যে ভালবাসতো তা নয়—তার ইচ্ছাতেই নিজেকে একান্তভাবে সমর্পণ ক'রে সর্বদা সে সুখ পেতো। তাই নীলিমার কথা ভাবতে গিয়ে শঙ্করের মাথা গরম হয়ে উঠলো।

পুরনো ম্যালেরিয়ার জ্বর হঠাৎ চাগিয়ে উঠেছিল! দু' তিন দিনের মধ্যেই অশোক বেশ সুস্থ হয়ে উঠলো।

কিন্তু অশোকের এই অতি দ্রুত আরোগ্য লাভে নীলিমা যেমন খুশী হলো, শঙ্কর তেমনি চিন্তান্বিত হয়ে পড়লো। কোন কাজে যেন তার মন যায় না, কেবল ভাবে কি করা উচিত। অথচ নীলিমা ও অশোক কাউকেই সে মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে না! তারা চোখের সামনে যেসব হাসি-ঠাট্টা করে তার আসল অর্থের দিকে শঙ্করের মন পড়ে থাকে। কাজেই শঙ্কর না পারে ভাল করে তাদের আলোচনায় যোগ দিতে, না পারে সুস্থচিত্তে সেখানে বসতে! মনের মধ্যে সংশয়ের আগুন চেপে জ্বলতে থাকে।

তাই লক্ষ্য করে একদিন নীলিমা বললে, আচ্ছা আজকাল তুমি দিন-রাত কি ভাবো বল ত?

শঙ্কর বললে, তোমাকে!

নীলিমা খিল খিল করে হেসে উঠে বললে, তা অমন পেঁচার মত গম্ভীরমুখে কেন?

আমিও তাই ভেবে পাই না।

দিন দিন তোমার হেঁয়ালি যেন বাড়ছে। এই বলে নীলিমা নিজের কাজে চলে গেল।

তখন শঙ্করের একবার মনে হলো, জোর করে নীলিমাকে ঘরে টেনে এনে সেই ফটোটা দেখায়, তাহ'লে সে বুঝতে পারবে এই হেঁয়ালির কি অর্থ! কিন্তু সাহসে কুলোল না।

অশোকও যে বন্ধুর এই ভাববৈলক্ষণ্য লক্ষ্য করেনি তা নয়, তবে আসল কারণটা অনুমান করতে না পেরে উল্টো ভাবে। হয়ত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোথাও কোন গোলমাল হয়েছে, তাই সেও চুপ করে থাকত।

বাড়ীর মধ্যে কেমন যেন একটা থমথমে ভাব বিরাজ করে।

ইদানীং অশোক বেশীর ভাগ সময়ই বাইরে বাইরে কাটায়। যদি কোনদিন নীলিমা তার সঙ্গে বেড়াতে যেতে চায় ত বাজে একটা কাজের ওজর দেখিয়ে সে একাই বেরিয়ে যায়।

এমনি ভাবে যখন দিন কাটে তখন একদিন শঙ্করের কাছে সংবাদ এলো একটা দুর্দান্ত বাঘ এসেছে তাদের সেই জঙ্গলে। সে নাকি রোজ দু'টো তিনটে ক'রে মানুষ মেরে ফেলছে!

শঙ্কর শিকারী! তার দেহের রক্ত নিমেষে নেচে উঠলো। সেইদিনই রাত্রে বন্দুক ও গুলি নিয়ে সে প্রস্তুত হলো। কিন্তু যাবার আগে কি ভেবে একবার সে অশোককে ডাকলে।

অশোক ঘরে আসতেই সে বললে, যাবি আমার সঙ্গে বাঘ শিকার করতে?

নিশ্চয়ই যাবো, বহুদিন থেকে আমার ভাই শখ শিকার দেখার, এ সুযোগ কখনো ছাড়তে পারি! বলেই অশোক সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহে ফেটে পড়লো।

কিন্তু শিকার দেখতে গেলেও যে শিকারী হওয়া দরকার এ কথাটা বোধহয় আপনার জানা নেই অশোকবাবু? বলতে বলতে নীলিমা এসে দাঁড়ালো তাদের মাঝখানে।

অশোক বললে, কিন্তু কতলোক ত এমনি শিকারীদের সঙ্গে যায়।

যে যায় যাক্, আমি আপনাকে কিছুতেই যেতে দেবো না। রোজ নাকি একটা দু'টো ক'রে লোক মেরে ফেলছে শুনছি!

বরাতে থাকলে কেউ খণ্ডাতে পারবে না—ঘরের ভেতর থেকে যে বাঘে লোক ধরে নিয়ে যায়! কি বলিস্ শঙ্কর? কথায় বলে যে বাঘের দেখা আর সাপের লেখা।

শঙ্কর এতক্ষণ কোন কথা বলেনি, চুপ করে শুনছিল। এইবার সে জবাব দিলে, নিশ্চয়ই।

নীলিমা তাড়াতাড়ি শঙ্করের কাছে এগিয়ে গিয়ে বললে, দেখ, তোমারো কি এতটুকু কাণ্ডজ্ঞান নেই? তুমি কি বলে ওঁকে নিয়ে যাচ্ছে? ওঁর যদি কোন বিপদ ঘটে, তখন—

নিমেষে শঙ্করের রসনা তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো। সে বললে, হ্যাঁ, সে বিপদ আমারও ত ঘটতে পারে, কই তুমি ত একবারও আমাকে নিষেধ করলে না তার জন্যে। জানি, এখন অশোকের জীবনের মূল্য আমার চেয়েও তোমার কাছে বেশী? কথাটা এমন ভাবে শঙ্কর বললে যে অশোক ও নীলিমা দু'জনেই একসঙ্গে শিউরে উঠলো!

ওদিকে শেষের কথাটা বলে ফেলেই শঙ্করের মনে হলো, কি করলুম, না বললেই হয়ত ভালো হতো! এরপর আর সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে তার সাহস হলো না, দ্রুতপদে চলে গেল।

শুধু নীলিমা ও অশোক বজ্রাহতের মত দাঁড়িয়ে রইল।

কিছুক্ষণ পরে অশোক ধীরে ধীরে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকে চুপচাপ খাটের ওপর বসে রইল। সহসা কি যেন তার মনে পড়ে গেল। সে তখন তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে তার স্যুটকেসটা খাটের নীচ থেকে টেনে বার করে খুলে সমস্ত জিনিসগুলোকে ঘরের মেঝেয় ঢেলে ফেললে। তারপর তন্ন তন্ন করে খুঁজতে লাগল সেই ফটো-টাকে। অনেক খুঁজেও যখন পেলে না তখন নীলিমার কাছে গিয়ে সে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলে, আমার স্যুটকেসটা কে খুলেছিল বলতে পারেন?

নীলিমা তখনো সেইখানে দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবছিল। একটু চমকে উঠে সে বললে, কেউ ত হাত দেয়নি—শুধু সেদিন আপনার বন্ধু থার্মোমিটারটা দেখবার জন্যে খুলেছিল, কিন্তু খুঁজে পায়নি।

আর কিছু বলতে হলো না। অশোকের সন্দেহই এবারে ঠিক হলো। শঙ্করের এই ভাববৈলক্ষণ্যের কারণ বুঝতে আর বাকী রইল না। আর কেন যে এই মাত্র শঙ্করের মুখ দিয়ে ও-কথা উচ্চারিত হয়েছে তার অর্থও তখন দিবালোকের মত সুস্পষ্ট হয়ে গেল তার কাছে।

অশোক আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা না ক'রে তখনি শঙ্করের ঘরের দিকে ছুটলো। সে মনে মনে স্থির করলে, আজ আর কোন কথা তার কাছে গোপন করবে না, সমস্তই তাকে খুলে বলবে।

কিন্তু ঘরের ভিতর ঢুকেই অশোকের বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠলো। দেখে শঙ্কর

নেই। কখন সে গুলি বন্দুক নিয়ে একাই বেরিয়ে গেছে।

তৎক্ষণাৎ সেও ঘর থেকে ছুটে বাইরে বেরিয়ে এলো এবং শঙ্কর কোন্‌পথে কোন্‌দিকে গেছে খুঁজতে লাগল। কিন্তু কোথায় শঙ্কর? কিছুই চোখে পড়ে না। অমাবস্যার গাঢ় অন্ধকার তখন যেন পাহাড়ের বুকে আরো জমাট হয়ে উঠেছে। অশোক খানিকটা এগিয়ে গিয়ে আর একবার চারিদিকে বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকালে কিন্তু কোথাও শঙ্করকে দেখতে পেলে না। কি হবে? অশোকের মন যেন উদ্বেল হয়ে উঠে! যেমন করে হোক বন্ধুর কাছে আজই রাত্রে সব স্বীকার করতে না পারলে যেন সে পাগল হয়ে যাবে! তার বাল্যবন্ধু, তার উপকারী বন্ধু শঙ্কর! কি করবে, কোন্‌দিকে যাবে, অশোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছে এমন সময় নীচে একটা টর্চের আলো জ্বলে উঠলো। পাহাড়ের যে রাস্তাটা ঘুরে ঘুরে বনের দিকে নেমে গেছে, অশোক স্পষ্ট দেখতে পেলে শঙ্কর একাই এগিয়ে চলেছে বন্দুক হাতে উঁচিয়ে ধরে।

তাকে দেখতে পেয়েই অশোক চীৎকার করে উঠলো, শঙ্কর দাঁড়া, আমি যাচ্ছি।

নিস্তব্ধ রাত। পাহাড়ের বুকে সেই ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হতে হতে দূর থেকে দূরান্তরে মিলিয়ে গেল। অশোক যাকে ডাকলে সে শুনতে পেলে কিনা জানি না, তবে নীলিমার কানে সেই কণ্ঠস্বর পৌঁছুতেই সে একেবারে ছুটতে ছুটতে ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এলো।

অশোক তখন অন্ধকারের মধ্যে হাতড়াতে হাতড়াতে ছুটে চলেছে। নীলিমা তাকে দেখতে না পেয়ে শুধু ভয়ার্তকণ্ঠে ডাক দিলে, 'অশোকবাবু, ফিরে আসুন', 'অশোকবাবু ফিরে আসুন' বলে।

কিন্তু কোথায় অশোক? আর কে তার ডাক শোনে!

অথচ নীলিমাও তার কোন সাড়া না পেয়ে এমনি অস্থির হয়ে উঠলো যে, কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে তখনি সেই অন্ধকারের মধ্যে সেও ছুটে গেল অশোককে ফিরিয়ে আনবার জন্যে। রাস্তাটা তার পরিচিত, তাই খুব দ্রুত সে এগিয়ে চললো। আর মুখে সেই এক কথা 'অশোকবাবু ফিরে আসুন'!

পাহাড়ী চাকরটা ছিল বাইরের ঘরে। নীলিমার কণ্ঠস্বর কানে যেতেই সে ছুটে বাইরে বেরিয়ে এলো এবং মনিবপত্নীকে ফিরিয়ে আনবার জন্যে তার পশ্চাদনুসরণ করলে। অন্ধকারের মধ্যে কিছুই দেখা যায় না। তাই ছুটতে ছুটতে সে কেবল এই বলে চীৎকার করছিল, মাইজি, মাত যাইয়ে আঁধিয়ারমে—শেরকা ডর হ্যায়!

অন্ধকারে পথই দেখা যায় না ত মানুষ! কে কোন্ দিকে গেছে তার ঠিক

কি! তবুও পাহাড়ীটা অভ্যস্ত পথে নামতে লাগল। তার কণ্ঠের সেই ডাক 'মাইজি মাত যাইয়ে আঁধিয়ারমে' অন্ধকারের বুকে আছাড় খেতে খেতে যেন ছুটে যাচ্ছিল আর একটা কণ্ঠস্বরের পিছনে,—'অশোকবাবু ফিরে আসুন', তাকে ধরতে।

কিছুক্ষণ পরে একটা গুলির আওয়াজ হতেই সে কণ্ঠস্বর থেমে গেল। চাকরটা আর তা শুনতে পেলে না।

কিন্তু একটু পরে একসঙ্গে আবার তিনটে গুলির আওয়াজ এলো তার কানে। ব্যস্, তারপর সব চুপ-চাপ।

পাহাড়ী চাকরটা এবার ছুটলো সেই শব্দটাকে লক্ষ্য করে। কিন্তু কিছু দূর গিয়েই সে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো। যেমন একটা পাহাড়ের বাঁক ছেড়েছে, দেখলে সামনে তীব্র টর্চের আলোয়, একটা বিরাট বাঘ মরে পড়ে আছে,ছিন্নভিন্ন ও রক্তাক্ত। আর তার থেকে কয়েক গজ দূরে নীলিমার মৃতদেহ! তার দেহের কোথাও বাঘের আক্রমণের কোন চিহ্ন নেই। শুধু একটা গুলি বুকের মধ্যস্থলে বিঁধেছে। সেইখানটা রক্তে ভিজে রয়েছে। চাকরটা নীলিমার কাছে এগিয়ে গিয়েই শিউরে উঠলো।—বাবুজী এ আপ্ কেয়া কিয়া?—বলেই পিছন ফিরতে দেখে তারা দুই বন্ধু শঙ্কর আর অশোক যেন দুটি পাথরের মূর্তির মত নীলিমার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে!

নিস্তব্ধ রাত্রে চাকরের কণ্ঠের সেই প্রশ্ন প্রতিধ্বনিত হলো—গাছপালা, পাহাড়, নদী, আকাশ সব যেন একসঙ্গে তার কাছে কৈফিয়ৎ চাইলে—বাবুজী এ আপ্ কেয়া কিয়া? কিন্তু এর জবাব কে দেবে—কাকে?

বিবাহবার্ষিকী

বাঙালীর জীবনে বারো মাসে যে তেরো পার্বণ লেগে আছে তার খরচা জোগাতেই লোকের প্রাণান্ত, তার ওপর আবার ইদানীং এক নতুন উপসর্গ জুটেছে, 'ম্যারেজ অ্যানিভারসারী ডে' বা বিবাহবার্ষিকী দিবস। এটা আমাদের দেশের উৎসবের লিস্টে কখনই ছিল না। পশ্চিম দেশের অনুকরণে একেবারে হাল আমদানি। বিবাহ-ব্যাপারটা যে দেশে অত্যন্ত ঠুনকো, কাঁচের বাসনের মত সামান্য আঘাতেই ভেঙে পড়ে, সেখানে এর মূল্য থাকাই স্বাভাবিক। তাই এক বৎসরের দীর্ঘ তিনশো পঁয়ষট্টিটি দিন নির্বিঘ্নে কেটে যাবার পর তারা এটা নিয়ে উৎসব করে লোককে দেখায় বা প্রচার করে। কিন্তু যে দেশে বিবাহ মানে বিশেষ ভাবে বহন করা এবং পাছে সে বোঝা ঘাড় থেকে কোন কারণেই পড়ে যেতে না পারে তার জন্যে আবার এক পাকে নয়—একেবারে সাত সাত পাকের ব্যবস্থা, সে দেশে তাই এর বাৎসরিক উৎসব করার যেমন কোন প্রয়োজন নেই, তেমনি অর্থও হয় না। যা কিছু উল্লাস আনন্দ সব ওই গোড়ার দিনের জন্যে সঞ্চিত থাকে। বিবাহের দিনটাই এখানে সবচেয়ে বড়!

কিন্তু মীনাক্ষী এদেশের মেয়ে হয়েও এটা মানে না। সব জিনিসের বিলিতী সংস্করণ যখন দেশীর চেয়ে ভাল, তখন বিবাহবার্ষিকী উৎসবের এই নিয়মটাই বা খারাপ হবে কেন? বরং বছরে বছরে নব নব প্রেরণা লাভ করে বিবাহের স্মৃতি মধুর থেকে মধুরতর হয়ে ওঠে, এই তার মনের বিশ্বাস।

তাই গাড়ীটা গলির মোড়ে রেখে বান্ধবীদের বাড়ীর ঠিকানা খুঁজে বার করতে গলদ্‌ঘর্ম হলেও সে ক্ষান্ত হয় না। ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে সুগন্ধযুক্ত রুমাল বার করে নাকে চেপে ধরে সঙ্কীর্ণতম গলির পথে পথে ঘুরে বেড়ায়! বিশেষ করে কলেজে যে ক'জন তার অন্তরঙ্গ বান্ধবী ছিল, তাদের নেমন্তন্ন করার জন্য সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ! মীনাক্ষীর বিশ্বাস, বিয়ের ব্যাপারে সে সবচেয়ে জিতেছে, তাদের সকলকে টেক্কা দিয়েছে, সেইজন্যে তার এই সৌভাগ্যটা যতক্ষণ না তাদের সকলকে দেখাতে পারছে, ততক্ষণ যেন শান্তি নেই তার মনে। তাই বোধ হয় এটা তাদের বিবাহের তৃতীয় বার্ষিক উৎসব হলেও জাঁকজমকটা এবার প্রথমবারের চেয়েও অনেক বেশি। কারণ মীনাক্ষীর বিয়েটা হয়েছিল দিল্লীতে মামার বাড়ি থেকে এবং এতদিন তারা সেই-এখানেই ছিল। বছর কলকাতায় বদলি হয়েছে মীনাক্ষীর স্বামী, তাই এখানবার

আত্মীয়স্বজন সকলের কাছে বরকে দেখাতে না পারা পর্যন্ত যেন ঘুম হচ্ছিল না মীনাক্ষীর কিছুতেই। অবশ্য সকলকে ডেকে দেখাবার মত বর যে সে পেয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নাই। যেমন রূপ, তেমনই গুণ। তাছাড়া শ্যামলের মত এতটুকু বয়সে ক'জন বাঙালীর ছেলে প্রায় হাজার টাকা মাইনের সরকারী চাকরি পায়?

ফুলের তোড়াটা মীনাক্ষীর হাতে গুঁজে দিতে গিয়ে অরুণা বললে, তুই একলা যে, মিঃ দত্ত কই? তাঁকে ডাক্, আলাপ করিয়ে দে!

ও আসছে ভাই এখুনি, নীচে গিয়েছে অফিসের বন্ধুদের বিদায় দিতে।—বলে অরুণার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল মীনাক্ষী, আমি তো ভাবলুম তুই আর এলি না। গীতা, বাসন্তী, রেবা, অশ্রু, রমলা—সবাই এসেছিল! একেবারে আমাদের কলেজের কম্প্লিট্ ব্যাচ, শুধু তুই ছাড়া।

অরুণা জবাব দেয়, ছোট ছেলেটার হঠাৎ গা গরম হয়ে উঠল বিকেলের দিকে, তাই তাকে খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখে আসতে একটু দেরি হয়ে গেল ভাই। তারা সকলে চলে গেছে নাকি?

হ্যাঁ। আর মিনিট পনেরো আগে এলেও দেখা হত অশ্রুর সঙ্গে।—বলে হঠাৎ একেবারে থেমে গেল মীনাক্ষী। যেন তাদের থাকাটার আর প্রয়োজন নেই তার কাছে, এখন সবচেয়ে বেশী দরকার অরুণাকে। বলা বাহুল্য, মীনাক্ষীর মনের গোপন ইচ্ছাটাও তাই।

অরুণাকে দেখে কলেজ-জীবনের প্রত্যেকটি ছোটখাটো ঘটনা যেন তার সব মনে পড়ে যায়। অরুণা ছিল তাদের ব্যাচের মধ্যে সবচেয়ে ভাল মেয়ে এবং দেখতেও সকলের চেয়ে সুন্দরী। কত ভাল ভাল ছেলে তাকে প্রেম নিবেদন করে চিঠি দিত। টিফিনের সময় বাগানের একটা কোণে তারা সকলে ঘিরে বসে সেই চিঠিগুলো পড়তো। অরুণার সৌভাগ্যের কথা ভেবে কত মেয়ে ফেলত দীর্ঘনিশ্বাস। আর সবচেয়ে বেশি ব্যথা পেত মীনাক্ষী নিজে। কারণ লেখাপড়ায় সে যেমন ছিল সাধারণ পর্যায়ভুক্ত, রূপের ক্ষেত্রেও ছিল তেমনি। তাই অরুণা না আসা পর্যন্ত মীনাক্ষীর যেন মনে হচ্ছিল, তার সব আয়োজন ব্যর্থ। অন্তত অরুণা নিজের চোখে দেখুক যে, সে জিতেছে বিয়ের ব্যাপারে তার চেয়ে।

অরুণাকে নিয়ে মীনাক্ষী তখনি ড্রইং রুমের ভেতর দিয়ে এঘর ওঘর ঘুরিয়ে

দেখিয়ে শেষে নিজের শয়নকক্ষে এনে বসিয়ে বললে, তুই এখানে একটু অপেক্ষা কর, আমি এখনি ওকে ডেকে আনছি ভাই।

মীনাক্ষীর ঐশ্বর্য দেখে অরুণার মাথা তখন ঝিমঝিম করতে শুরু করেছে। প্রতিটি ঘর যেন ছবির মত সাজানো। মূল্যবান আসবাব পত্র যেখানে যেটি মানায়, যথাস্থানে তা পরিচ্ছন্নভাবে গুছিয়ে রেখেছে মীনাক্ষী। কি সুন্দর রুচিবোধ তার! একটা দীর্ঘনিশ্বাস বুকের মধ্যে চেপে নিলে অরুণা। এর তুলনায় কি পেয়েছে সে বিয়ে ক'রে! শুধু স্বামী প্রফেসর—এইমাত্র তার কোয়ালিফিকেশন। যা রোজগার তার অর্ধেক বই কিনেই শেষ করে, আলমারি কেনবার পয়সা জোটে না—জীবনের ভোগবিলাস বলতে তার বই ছাড়া আর কিছুই নেই।

অথচ এই মীনাক্ষীর চেয়ে রূপে গুণে বিদ্যায় সবদিক থেকে সে ছিল ভাল। আর যেন ভাবতে পারে না অরুণা। কি অর্থের প্রাচুর্যের মধ্যে থাকে মীনাক্ষী, তার তুলনায় কি দারিদ্র্য তার! বাড়ি ভাড়া দিয়ে, দুটো ছেলের অসুখবিসুখ হলে ভাল ডাক্তার দেখাতে পারে না, তাদের ওষুধ-পথ্য কিনে দিতে সামর্থ্যে কুলোয় না। এবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস অরুণার বুক শূন্য করে বেরিয়ে এলো। অথচ একদিন কি উচ্চাশাই না তার মনে ছিল, ঠিক মীনাক্ষীর মতই ঘর সাজিয়ে তার মধ্যে বাসা বাঁধবে। কিন্তু কি হ'ল? কি পেলে সে জীবনে? অনুতাপে যেন জ্বলতে থাকে তার বুকের মধ্যেটা।

মীনাক্ষীর সৌভাগ্যের কথা যত ভাবে, তত যেন অরুণা ঈর্ষিত হয়ে ওঠে তার উপর।

মীনাক্ষী এই সময় হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে আসে। বলে, তোকে অনেকক্ষণ একলা বসিয়ে রেখে গেছি, কিছু মনে করিস না ভাই। ওকে ডেকে এসেছি, আসছে এখুনি। আর আমায় এখন যেতে হবে না।—বলে গল্প জুড়ে দেয় অরুণার সঙ্গে। তার স্বামীকেও নিমন্ত্রণ করেছিল মীনাক্ষী, কিন্তু তিনি আসেন নি—তাঁর কলেজে নাকি কিসের একটা মিটিং আছে আজ।

হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে মীনাক্ষী, বলে, তুই যাই বল্ ভাই, প্রফেসররা সর্বদাই সিরিয়াস্, জীবনটাকে উপভোগ করবার জন্যে যেন ভগবান ওদের পৃথিবীতে পাঠান নি!

কথাটা সত্যি হলেও অরুণা মুখে কিন্তু তাতে সম্পূর্ণ সায় দিতে পারল না। মীনাক্ষী তাই লক্ষ্য করে আবার বললে, রাগ করছিস তোর বরকে বে-রসিক বলেছি বলে? আচ্ছা, থাক ওসব কথা। বলেই চট্ করে আলমারির মধ্যে থেকে

একটা ফটোর অ্যালবাম টেনে নিয়ে মীনাক্ষী তার সামনে খুলে ধরে বললে, এই দেখ, আমরা গেল বছরে কাশ্মীরে গিয়েছিলুম, কত তার ফটো। অ্যালবামের পাতা যত ওলটায় তত যেন চোখ মুখ জ্বালা করতে থাকে অরুণার। মিঃ দত্তর সঙ্গে মীনাক্ষী সেখানে কি সব নির্লজ্জ-ভঙ্গীতে ফটো তুলেছে। ছি, স্বামী হলেও কি এমন ভাবে ফটো তোলা উচিত! মনে মনে ভাবে অরুণা।

ঠিক এই সময় মীনাক্ষীর স্বামী এসে ঢুকল ঘরে।

এই রুণু এই নে, তুই যাঁকে দেখবার জন্যে হাঁপাচ্ছিলি ইনি সেই মিঃ দত্ত, আর এ আমার বন্ধু মিসেস অরুণা মল্লিক। এর স্বামী খুব নাম-করা একজন ইংরিজীর প্রফেসর।—বলে মীনাক্ষী অরুণার সঙ্গে তার স্বামীর প্রাথমিক পরিচয় করিয়ে দিলে।

ও!—ব'লে হাত জোড় করে মিঃ দত্ত হাস্যোজ্জ্বল মুখে নমস্কার করলে অরুণাকে।

অরুণা মীনাক্ষীর স্বামীর মুখের দিকে বিস্ফারিতচোখে তাকিয়ে তখনও ভাবছিল, সত্যি কি সুপুরুষ আর কি ছেলেমানুষ মিঃ দত্ত! বোধহয় মীনাক্ষীর সমবয়সী হবে। ভগবান সব দিক দিয়ে যেন তার সাধ মিটিয়ে দিয়েছেন একেবারে। কি লাকি ও!

কি রে! অমন হাঁ করে চেয়ে আছিস যে!—বলে ছোট্ট একটা চিমটি কেটে মীনাক্ষী খিলখিল করে হেসে উঠল।

সে হাসি যেন অরুণার কানে বিদ্রূপ বর্ষণ করে। মীনাক্ষী যে সকল দিক দিয়ে তাকে টেক্কা মেরেছে এ যেন তারই জয়োল্লাস। নিমেষে তাই অরুণার চোখে ঈর্ষার আগুন ছিটকে পড়লো। মিঃ দত্তকে তার নমস্কার ফিরিয়ে দিতে দিতে সে বললে, আপনি বোধহয় আমায় চিনতে পারলেন না?

ওমা, তুই ওকে চিনিস নাকি? কই, একদিনও তো তোমার মুখে ওর কথা শুনি নি? হ্যাঁ গো তুমি চুপ করে আছো কেন? বল? মীনাক্ষী ঠেলা মারে তার স্বামীর গায়ে।

ঘাবড়ে যায় মিঃ দত্ত। বলে, কিন্তু আমি তো কিছুতেই মনে করতে পারছি না যে, আপনাকে কোনদিন কোথাও দেখেছি!

মুখ টিপে একটু হেসে অরুণা বলে, না পারাই ভাল। কি বল্ মিনু?

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মীনাক্ষী বলে উঠলো, না না, সত্যি বল্ না ভাই, কোথায় ওঁর সঙ্গে তোর আলাপ হয়েছিল?

যদি ওঁর সে কথা মনেই না থাকে তো দরকার কি আবার তা উত্থাপন করে?

—বলে একটু থেমে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে অরুণা একবার মিঃ দত্তর মুখের দিকে আর একবার মীনাক্ষীর দিকে তাকাল।

মীনাক্ষীর মুখটা নিমেষে যেন ফ্যাকাশে হয়ে গেল, কিন্তু আবার জোর করে মনের সন্দেহটা দূরে সরিয়ে দেবার জন্যে হাসি টেনে এনে বললে, আচ্ছা, থাক্। ওর যখন মনে পড়ছে না তখন হয়তো অন্য কারও চেহারার সঙ্গে তুই গোলমাল করছিস। আচ্ছা চল্, খাবি এবার, দেরি হয়ে যাচ্ছে তোর।

অরুণার মুখে বিচিত্র ধরণের হাসি ফুটে ওঠে। বলে, সেই ভাল।

তারা চলে গেলে শ্যামল চুপ করে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল কোথায় দেখেছে অরুণাকে! কিন্তু যত ভাবে, কিছুতেই মনে করতে পারে না ও মুখ! তবে কি রসিকতা করলে অরুণা তার সঙ্গে?

রাত্রে বিছানায় শুয়ে প্রথমেই স্বামীকে সে কথা প্রশ্ন করলে মীনাক্ষী, হ্যাঁ গো, সত্যি সত্যি ওকে তুমি আগে চিনতে, তোমার সঙ্গে ওর পরিচয় ছিল?

আমি তো এখনও পর্যন্ত ভেবে কিছুতে সে কথা স্মরণ করতে পারছি না। —শ্যামল বললে।

আহা, চেপে যাওয়া হচ্ছে আমার কাছে!

মীনাক্ষী আর প্রশ্ন না করে চুপ করে যায়। কিন্তু তার চোখে ঘুম আসে না কিছুতেই। সে ভাবে, এতটা ভুল করবে কি অরুণা? কোন্‌টা তবে সত্যি?

এই নিয়ে মনে মনে যত তোলাপাড়া করে, তত যেন মীনাক্ষীর মাথা গরম হয়ে ওঠে। আবার এক-একবার সে ভাবে, নিশ্চয়ই এর ভেতরে কিছু সত্য আছে, তা না হ'লে এমন করে চেপে যাবে কেন তার স্বামী? আর অরুণাই বা সেটা স্পষ্ট করে ব্যক্ত করলে না কেন? খাবার সময় অনেক রকম করে কথাটা সে অরুণাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, কিন্তু সব সময়ই সে এড়িয়ে গেছে। সন্দেহ তাই কিছুতেই ঘুচতে চায় না তার মন থেকে, আরও যেন চেপে ধরে। অবশেষে ভাবতে ভাবতে মীনাক্ষী এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, পুরুষজাতের পক্ষে সবই সম্ভব, ওদের বিশ্বাস নেই।

গোলাপের মালা, তোড়া ও ফুলের স্তূপ জমেছিল ঘরে। তারই সুগন্ধে ঘর ভরপুর, কিন্তু মীনাক্ষীর নাকে সে গন্ধ যায় না। তার বদলে গোলাপের কাঁটা যেন তার সর্বাঙ্গে ফুটতে থাকে, আর তারই জ্বালায় ছটফট করে মরে সে!

ওদিকে অরুণার চোখেও ঘুম নেই। সেও জলে মরে ঈর্ষায়। মীনাক্ষীর যে সৌভাগ্য নিজ চোখে দেখে এসেছে তা যেন কিছুতেই ভুলতে পারে না। তবু এই অন্তর্দাহের মধ্যেও এক-একবার আপন মনেই সে হেসে উঠে, কেমন ওষুধ দিয়েছি মিথ্যে বলে, মর্ এখন ভেবে—কোথায় আমায় দেখেছে! তবু তো আজকের মধুর রাতটা বিষাক্ত করে দিয়েছি মীনাক্ষীর! এইটুকুর মূল্যই যথেষ্ট।

এই মনে ক'রে যত অরুণা নিজের মনে সান্ত্বনা লাভ করতে চেষ্টা করে, তত আরও যেন বক্ষের প্রদাহ বেড়ে যায়। কেন, তা সে বুঝতে পারে না। সারারাত সেও যেন কণ্টক-শয্যায় ছটফট করে।

—সমাপ্ত—